মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য

পরিবেশক

চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড

১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী
বিভূতি সেনগুপ্ত

প্রকাশক
সুবর্ণা ভট্টাচার্য
রম্যাণি
৭/১-এ গোপাল ব্যানার্জী লেন
পোঃ কালীঘাট
কলকাতা ৭০০০২৬

মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাশ মুখার্জী লেন
কলকাতা ৬

নিবেদন

প্রাচীনকালে পল্লীবাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠাই ছিল আনন্দের উৎস। আমাদের স্বদেশবাসী এই আনন্দ-উৎসবের সূত্রে আবহমানকাল ধরে লাভ করে এসেছে সাহিত্যরস ও ধর্ম-শিক্ষা। পল্লীর আপামর জনসাধারণ তাই এই মেলা ও উৎসবকে ঘিরে একে অপরের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে যেমন ধন্য হয়েছে তেমনি সেইসব উৎসবানুষ্ঠানকে মাধ্যম করে দীর্ঘকাল থেকে মেলা ও উৎসব-নির্ভর একশ্রেণীর লোকসাহিত্য অসংখ্য মানুষকে আনন্দ দান করেছে। কত সংখ্যাতীত লোককবি তাঁদের সৃষ্ট লোকসাহিত্যের প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে পল্লীবাংলার এইসব মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানকে।

অতীতে মেলা ও উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্যের প্রচার হত মৌখিক উপায়ে। গান, কথকতা, ছড়া প্রভৃতি মেলা ও উৎসবের গেয় সম্পদগুলি উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে লোককবি ও শিল্পীদের দ্বারা গীত ও প্রচারিত হত। এই মৌখিক প্রচারের এক অমোঘ প্রাণশক্তি (Effectual vitality) আছে। গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বৌদ্ধযুগে এই মৌখিক প্রচারের প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি।

লোকসাহিত্যের প্রধান উপাদান ও উপকরণ হল পল্লীজীবন। পল্লী-নর-নারীর গার্হস্থ্য জীবন ও যন্ত্রণা, দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ ও কান্না-হাসির মুক্তা-মালাকে নিয়ে লোককবি কত অজস্র গান ও কাহিনী রচনা করেছে। নীল গাজন ও গম্ভীরার গানে, টুসু-ভাদু বিদায়ের লোকসঙ্গীতে অথবা শিব-পার্বতীর ঘরকন্না ও উমা বিদায়ের কাহিনীর অন্তরালে পল্লীবাংলার পারিবারিক ছবিগুলি মর্মরিত হয়ে ওঠে। ভাদু ও টুসুর মৃৎপ্রতিমার বক্ষ ভেদ করে পল্লী-বালার হৃদয় স্পন্দন শোনা যায়। লোককবির ছড়া ও গানে এই বেদনা স্পন্দিত ও মুখরিত হয়ে ওঠে। স্বর্গের দেব-দেবীগণ মানবীয় রসে জারিত হয়ে সংসারের আঙিনায় নেমে আসে। সাধারণ মানুষের মত পল্লীর ঘর-গৃহস্থালীর মধ্যে দেব-দেবীরা বিচরণ করেন।

লোকসাহিত্য ব্যষ্টিমনের রচনা। এর উৎস অজানিত। কবে কোথায় কোন অবসরে এর সৃষ্টি হয়েছে তা বলা দুরূহ। মেলা ও উৎসব নির্ভর লোকসাহিত্য রচিত হবার পর সমষ্টি মনের কাছে তাকে বহন করে নিয়ে আসে শিল্পী, গায়ক ও কথক। উৎসবানুষ্ঠানের সমমনোভাবাপন্ন-জনতা (common interest crowd) শৃংখলাবদ্ধ হয়ে একাগ্রচিত্তে লোকসাহিত্যের আনন্দ গ্রহণ করে। উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে ও মৌখিক প্রচারের গুণে যুগ-

পরম্পরায় ব্যষ্টিমনের রচিত লোকসাহিত্য ভাব-শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে এক নান্দনিক ক্রিয়া-শৈলীতে সমষ্টি মনের সম্পদ (Group Product) হয়ে যায়।

আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুলি হল যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যম (Traditional folk-media)। অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্যের সঙ্গে মেলা ও উৎসবের পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশেষতঃ শিল্পী ও জনতার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কারণ মেলা ও উৎসবের আসরে লোককবি ও জনতা সাক্ষাৎ-মুখোমুখি অবস্থান করে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয়ের এই মুখোমুখি অবস্থান ও একে অপরের নৈকট্য লাভটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পী গান গায়। লোককবি ছড়া কাটে। কথকঠাকুর আসরে বসে পাঠ করে। এইভাবে লোক-সাহিত্যের নানা শিল্পসম্পদ শিল্পী ও জনতার আদান-প্রদানের অলিখিত প্রক্রিয়ায় দুই মনের মধ্যে এক শিল্পসম্মত যোগসাধন (feed back in art form) গঠিত হয়। যা সম্পূর্ণ অলিখিত (unrecorded)। তথ্য ও পরিসংখ্যানের দ্বারা এই ক্রিয়া-শৈলীর প্রমাণ দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যুগপরম্পরায় এই ক্রিয়াস্রোতটি বহমান। লোকসাহিত্যের প্রচারকারী শিল্পী ও কবি এবং রসাস্বাদনকারী জনতা উৎসব ও মেলার একই মঞ্চে মুখোমুখি অবস্থান ক'রে যৌথভাবে শিল্প-কর্মের এই প্রক্রিয়াটিকে নীরবে পালন করে। Charles S. Steinberg বলছেন ঃ "……There is constant interaction between communicators for communication is a two way street……"

Mass Media and communication
Page-4 দ্রষ্টব্য।

অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্যের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয় এইসব মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রাচীন হয়েও তাই এইসকল লোকসাহিত্য আজও সতেজ ও চিরনবীন। প্রাচীনকালের লোকসঙ্গীতগুলি অতীতের সৌরভ নিয়েও বর্তমানের প্রাঙ্গণে আজও বিকশিত ও প্রফুল্ল হয়ে আছে।

Ralf V. Williams বলছেন ঃ "……A folk song is neither new nor old, It is like a forest tree with its root deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits……"

যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যমের পাশে আজ আধুনিক যুগে এসেছে বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্রমাধ্যম (Electronic media)। বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি সম্পদগুলি আধুনিক জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অসংখ্য জনমণ্ডলীর কাছে ব্যাপক প্রচার সৃষ্টিতে আধুনিক যন্ত্রমাধ্যমগুলি জনসংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেন এক ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্র-মাধ্যমের প্রচার তরঙ্গে, দর্শক ও শ্রোতা এবং শিল্পী ও বক্তার মধ্যে থাকে এক দুস্তর ব্যবধান। এখানে মুখোমুখি সাক্ষাতের কোন সুযোগই থাকে না। যার ফলে প্রচারের বাহ্যক্রিয়ার ফলাফলটি প্রচারক জানতে পারে না—যে তার প্রচার কতখানি ফলপ্রসূ হল দর্শক ও শ্রোতার চিত্তপটে। কিন্তু মেলা ও উৎসবের মত যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যমের ক্ষেত্রে শিল্পী ও জনতা প্রচার তরঙ্গের একই সীমারেখায় অবস্থান করে। বাউলেরা গান গায়। নৃত্য করে। সেই গান ও নৃত্যের রসসমৃদ্ধ প্রতিফলন জনতার মুখে লক্ষ্য ক'রে বাউল-শিল্পী-বিমোহিত হয়। কথকঠাকুরের মুখে মেলা বা উৎসবের আসরে রামায়ণ গানে হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের কথা শ্রবণ করে আসরের জনতা হয়ত কল্পনায় লম্ফ প্রদান করে। ঝাঁপান উৎসবে সাপুড়ের মন্ত্র, বা ধর্মের গাজনে শিব-বিষয়ক গান শুনে কখনও ঝোঁকের মাথায় জনতার হৃদয়ে তা নীরবে উচ্চারিত হয়। তারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই ঝোঁক বা মুহূর্তকে বলা যেতে পারে 'on the spur of the moment'—অর্থাৎ তাৎক্ষণিক এক ভাব-দ্যুতির সহসা বিচ্ছুরণ। শিল্পী ও জনতার মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে লোক-সাহিত্যের দেওয়া-নেওয়ায় জনতার মনে এক চকিত রসক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যাকে আমরা 'momentary Impulse'—বলেও মনে করতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান শিল্প মাধ্যমের দ্বারা এই প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রতিফলন কতখানি সফল ও কার্যকরী হয় তা আলোচনার বিষয়। কিন্তু মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমে শিল্পী ও জনতার মধ্যে একটি মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়। উভয়ের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে দুই হৃদয়ের মধ্যে শিল্পমণ্ডিত যোগ-সাধনের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটি ভাবে ও রসে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাঙালী সমাজ গঠনের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রাগার্য সংস্কৃতির যখন আর্যীকরণ শুরু হল তখন বর্ণ, উপবর্ণ, অন্ত্যজ প্রভৃতি ভেদে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ঈশ্বরকে মন্দিরের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে গোত্রহীন আর্যেতর সংস্কৃতির কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। তাদের ধর্মবোধ ও সংস্কার তাই উপেক্ষিত হয়েই রইল। কিন্তু কালক্রমে পল্লীর অর্বাচীন ও অন্ত্যজ সমাজ প্রচলিত দেব-দেবীকে সাধারণ ও নিরক্ষর লোকসমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে তুলল। আঞ্চলিক লোক-উৎসবে ও বাঙালীর ব্রতানুষ্ঠানে সেই দেব-দেবীরাই আবার ফিরে এল এক নতুন রূপে। শুধু তাই নয় অন্ত্যজ ও উপবর্গীয় সমাজের ধ্যান-ধারণা, তাদের নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াচার ও রীতি-নীতি, আর্যেতর মানুষের জাদুবিশ্বাস এবং কামনা বাসনা প্রভৃতি

নানা রূপে প্রতিফলিত হল মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের পালনীয় ও আচরণীয় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানে।

আদিম নরনারীর নৃত্য-গীতোৎসব ছিল মূলতঃ সমষ্টির প্রয়াস। ব্যক্তির কামনা-বাসনা সেখানে বড়ো নয়। সমষ্টির ইচ্ছাশক্তিকে একসূত্রে গ্রথিত করার জন্যই আদিম মানুষেরা সমষ্টিগতভাবে আনন্দোৎসবে মত্ত হত। সেইসব ধর্মানুভূতি ও বিশ্বাসবোধের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্মৃতিচিহ্নগুলির অস্পষ্ট ও মৃদু কলরব আজও যেন শোনা যায় বার-ব্রত ও ভিন্ন ভিন্ন মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানে। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ বোস বলছেন : **"...In festivals there is a scope to observe the primitive behaviour and collective ritual. The tendency of primitive behaviour to rely upon magic involves the participation of the social group, tribe or family in activities which are held to arouse the interest of the whole group..."**

Process of communication
Page-54 দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালের মানুষদের নৃত্য-গীতোৎসবের মাধ্যম ছিল কৃষি-কর্ম। চাষ-আবাদই ছিল মানুষের জীবিকার উপায়। এই জীবিকাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন মানুষেরা জীবনধারণের নব নব ব্যাখ্যা ও অর্থের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হল। শুরু হল প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তির আরাধনা। তাদের আরাধ্য ছিল মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, জলরাশি, অরণ্য, আকাশ, নদী-সাগর-পুষ্করিণী এবং পাহাড় ও পর্বত। এইসব প্রাকৃতিক আরাধ্যশক্তির পূজা-নুষ্ঠানের পরিচয় বাংলার বার-ব্রত এবং মেলা ও উৎসবে বিবর্ণ ও অস্পষ্ট ধারায় আজও বেঁচে আছে। তাই মেলা ও উৎসব একদিকে যেমন একশ্রেণীর লোকসাহিত্যের প্রচারভূমি তেমনি অপরদিকে আবার এইসব উৎসবানুষ্ঠান প্রাগার্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় নিরক্ষর নর-নারী পল্লীসমাজে নানা বৃত্তি ও পেশায় নিযুক্ত ছিল। যেমন চাষ-বাস, কামার-কুমোরের কাজ, মাছ ধরা, তাঁত বোনা, দোকানদারি, সাপ খেলানো, পশুপালন, গোচারণ, বৃক্ষচ্ছেদন প্রভৃতি নানা বৃত্তি। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের মধ্যে এই বৃত্তিগত জীবনচর্যার পরিচয় আমরা পাই। বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানের গানে ও ব্রত উৎসবের ছড়ায় এই জীবন-চর্যার পরিচয় স্বতঃউদ্ভাসিত। সেই পরিচয়ের সূত্রগুলি মেলা ও উৎসবের আচার-আচরণে সংস্কারগত ক্রিয়াকর্মে এবং গানে ও গাথায়, ছড়া ও কাহিনীতে যেন আজও মুখরিত হয়ে আছে। **Edson Riomond** বলছেন :

"...Those materials in culture that circulate traditionally

among members of any group, in different versions, whether in the oral form or by means of customary example…"

'An Introduction to the study of Indian Fork Lore'
P. R. Subramanian-এর
গ্রন্থ থেকে উধৃত।
Page-5 দ্রষ্টব্য।

আবহমানকাল ধরে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানে স্বদেশের শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ যেমন ঘটেছে তেমনই এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবভিত্তিক লোক-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারও ঘটেছে। যুগাদিক্রমে এই জাতীয় লোকসাহিত্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে গীত ও শ্রুত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী ও লোককবিদের দ্বারা। সমাজের পরিবর্তন হয়েছে, যুগ পাল্টেছে সাথে সাথে জনতার চরিত্রও বদলে গেছে। মনে করা যাক পল্লীর কোন নিরক্ষর পরিবারের এক প্রপিতামহ অতীতে মেলায় এসে যে গান শুনেছিল দীর্ঘকাল পরে তারই কোন বংশধর আলোকিত শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে হয়ত সেই একই বাউল গান বা কোন লোকসঙ্গীত অত্যাধুনিক মন নিয়ে শুনছে। রুচি বদলেছে, সভ্যতা বদলেছে কিন্তু লোকসাহিত্যের কোন হেরফের হয়নি। বরং যুগে যুগে সেই লোকসাহিত্য মেলা ও উৎসবে পল্লী জনতার দ্বারা আস্বাদিত হতে হতে আবার পুনর্গঠিত হয়ে (Reconstructed) বৃহত্তর লোক সমাজের মধ্যে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যষ্টির রচনা সম্পদ যুগে যুগে অবিরত পুনরাবৃত্তির ফলে সমষ্টির দ্বারা নব নব উদ্ভাবনী শক্তিতে তা আবার বিরচিত হয়েছে এবং এক মন থেকে অন্য মনে উপ্ত পুষ্পিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। পল্লীজীবনের কত অসংখ্য কথা ও কাহিনী যুগ পরম্পরায় মেলা ও উৎসবের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন ও আদিম সমাজের সংস্কার ও ধ্যান ধারণা এবং তাদের কামনা-বাসনা বার ব্রত ও মেলা ও উৎসবের দর্পণে আমাদের কাছে এসে ধরা দেয়। অনুষ্ঠান-নির্ভর লোক-সাহিত্যের আলোচনার অবসরে দর্পণের কথাও তাই এসে পড়ে। সেই কারণে লোকসাহিত্য এবং মেলা ও উৎসবের প্রসঙ্গ দুটিকে পৃথক করে না দেখে মেলা ও উৎসবের দর্পণে লোকসাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের আশীর্বাদ ও ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়েছি তাঁরা হলেন ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ড. সরোজকুমার বসু, ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, ড. উপেন্দ্রকুমার দাস, নৃত্যবিদ্

মণি বর্ধন ও আমার অগ্রজ ড. কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় এবং পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভালবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় আর যাঁরা আমাকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন : জিতেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ বাগ, দেবদাস সরকার, প্রবীর মজুমদার, ভারতীবিকাশ হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ জোয়ারদার, সতীপ্রসন্ন সেন ও রথীন্দ্র পালিত।

প্রচ্ছদ শিল্পী বিভূতি সেনগুপ্ত মহাশয়ের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদের ভাবনা-চিন্তা প্রসঙ্গে মানিক সরকারের (চট্টোপাধ্যায়) নাম এই মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরণ করি।

যারা আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও কাছের মানুষ আজ তাদের কথাও মনে করি। তাদের প্রীতি ও ভালবাসা নিয়ে এই গ্রন্থটি ভূমিষ্ঠ হল। তারা হলেন : দিলীপকুমার হালদার, মণিপ্রকাশ সিং, অরুনেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ভট্টাচার্য, সুবর্ণা ভট্টাচার্য, অভিরাজ ভট্টাচার্য (বাবুলাল) এবং শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

উপন্যাস

কদমখণ্ডীর ঘাট (২য় সংস্করণ)
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে
গেরুয়া কন্যা
ডাণ্ডীরবন কাঁদছে

কাব্যগ্রন্থ

চেরী

নাটক

পঞ্চমিত্র
শবরী
উলুস্টেশন

সংকলনভুক্ত নাটক

সূর্যের অপর পিঠ
বিষণ্ণ সকাল
স্ফুলিঙ্গ
বৃদ্ধ চিনার
মুখোস (আন্তন চেকভ অনুসরণে)
ঈশ্বর ডলার বিজ্ঞাপন (শেবতোস্লাভ মিনিকভ অনুসরণে

প্রথম অধ্যায়

মেলা এবং উৎসব : তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গেলে মানুষের যেমন ভাববিনিময়ের প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন হয় মেলা-মেশার। ভাববিনিময়ের মাধ্যম হল ভাষা আর মেলা-মেশার উপলক্ষ হল কোন অনুষ্ঠান অথবা মেলা এবং উৎসব। ভাববিনিময়ের প্রয়োজন মানুষ যেদিন উপলব্ধি করল সেদিন থেকে সৃষ্টি হল ভাষার। আদিম যুগে মানুষ ছবি এঁকে, শিল্প সৃষ্টি করে তার মনের ভাবকে প্রকাশ করত। জীবিকা নির্বাহের জন্যে আদিম আরণ্যক মানুষ পশু শিকার করে সেই শিকার লব্ধ নিহত পশুকে ঘিরে আগুন জেবলে নৃত্য-গীত করত। ক্ষুধার তাড়নায়, অন্নের প্রয়োজনে আদিম মানুষ গান গেয়েছিল—"ওম্ অদাম, ওম্ পিবাম···" অর্থাৎ 'আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি···।'[১] এইসব নাচ ও গানের ভেতরে মানুষের কামনা-বাসনার ছবি ফুটে উঠেছে। শুধু অবসর-বিনোদনের জন্যে নয় নানাবিধ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ ক'রে তোলবার জন্যেও মানুষ সমাজ বিকাশের গোড়ার দিকে নাচ-গান করত। আদিম সমাজে ছিল দস্যুবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতা। তার মধ্যেই শুরু হয়েছিল জীবনযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২] বলছেন :

"এই দুর্লঙ্ঘ্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবন যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্র শক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তারপর কখনো দৈবক্রমে কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এইদিকে তার প্রথম সহায়—আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজও নানা দিকে তার ক্রিয়া চলছে। আজও আগুন নানা মূর্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।···

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল। তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফল লাভের কামনায়। ধনসম্পদ ও শত্রু জয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শক্তি কল্পনা ক'রে তারই সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠান তখন গৌরব পেত।···"

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের[৩] আলোচনা থেকেও এ-কথা স্বীকৃত যে যাগযজ্ঞের সময় বেদগান, সামগান করা হত। যজ্ঞাগ্নির সামনে যেমন গান গাওয়া হত তেমনি আবার যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার নিয়ম ছিল। আসলে এই যজ্ঞ জিনিসটি কি ছিল? দেবতাদের উদ্দেশ্য করে যখন কোন দ্রব্য দান করা হত তখন সেই দ্রব্য ত্যাগের নামকে বলা হত যজ্ঞ। যজ্ঞে তিনটি বস্তু ছিল অপরিহার্য। দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ। দ্রব্য বলতে বোঝাত পশুমাংস,

সোমলতার রস, ঘৃত, চরু অথবা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি ইত্যাদি। এই ত্যাগের নাম ছিল আহুতি। এখানেও সেই কামনা। সেই কামনা ব্যক্তির জন্যে অথবা সমাজের জন্যে অথবা পরিবারের জন্যে করা হত।

এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের[৪] অভিমত হল—পশু শিকার, রথের দৌড়, পাশা খেলা ও নাচগান ছিল আর্যদের প্রধান আনন্দানুষ্ঠান। আর্যগণ এইসব আমোদ প্রমোদে রত থাকতেন। সাধারণ লোক চাষবাস ও পশু পালন করেই জীবন ধারণ করত। মূর্তি পূজার রীতি আর্যদের মধ্যে ছিল না। আর্যদের বিশেষ উপাসনা রীতি ছিল হোম। আর্যরা বিশ্বাস করতেন যে দেবতারা এই প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করেন। অগ্নি হলেন তাঁদের দূত। ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, ঊষা, মরুৎ প্রভৃতিরা হলেন আর্যদের উপাস্য দেবতা। এইসব দেবতাদের উদ্দেশ্যেই আহুতি দেওয়া হত। আহুতি দানের জন্যে কাষ্ঠাগ্নি জেলে হোম করা হত। প্রস্তুত করা হত পবিত্র বেদী। দেবগণ যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে আর্যদের আহুতি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হতেন এবং হোমকারীকে ধন সম্পদ, শস্য, স্বর্ণ, অশ্ব, পুত্রসন্তান দান করতেন। এ ছাড়াও বড় বড় রাজারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে যজ্ঞ করতেন। যেমন রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ। মহাভারতের সভাপর্বে আছে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। এইসব যজ্ঞানুষ্ঠানই ছিল প্রাচীনকালের এক জাতীয় উৎসব।

ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের আরণ্যক সমাজের মানুষেরা জীবিকা নির্বাহের জন্যে যেমন পশু হত্যায় রত হত—তেমনি সে তার মনের ইচ্ছাশক্তিকে অথবা কোন ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যে নাচ ও গান করত। কিন্তু এই নাচ ও গানের পিছনেও ছিল একটা কামনা। তারা গানের মাধ্যমে অসুখ সারাতো, ভূতপ্রেত তাড়াতো, অশুভ শক্তিকে অপসারণ করার চেষ্টা করত। আবার কখনও বা বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তারা গানও গাইত। গান গেয়ে তারা মনে করত বৃষ্টির দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেত। সে লাভ করত এক মানসিক তৃপ্তি। এই তৃপ্তি তাদের সকল আকাঙ্ক্ষা দূর করত। বৃষ্টি হবে কি হবে না, অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটবে কি ঘটবে না তা তারা আগে থেকে বুঝতে পারত না, কিন্তু ঘনীভূত মনের আবেগে রূপায়িত গান ও নাচের মাধ্যমে তারা তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে কল্পনায় প্রতিফলিত হতে দেখে আশাবাদী হয়ে উঠত। আমাদের মনে হয় এই ইচ্ছাশক্তি এবং নাচ ও গানের মাধ্যমে মনের ঘনীভূত আবেগকে বাস্তবায়িত করণের চেষ্টা থেকেই জাদু বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে। বাস্তবের অভাব বোধকে জাদু অথবা মায়ার সাহায্যে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তারা তা পূরণ করে নিত। প্রকৃতির দুজ্ঞেয় রহস্যকে জানবার জন্যে অথবা প্রকৃতির দুর্বার বাধাকে জয় করবার জন্যে আদিম যুগের মানুষেরা প্রাণের আবেগে সচেতনভাবে গান করত ও নাচ করত। আবার কখনও কখনও অসভ্য বন্য মানুষেরা শিকারে বেরোবার আগে নৃত্য করত। মনের কল্পনায় বাস্তব শিকারের দৃশ্যগুলিকে পর পর সাজিয়ে নিয়ে তারা শিকার ও শিকারীর অভিনয় করত। এই অভিনয়ে তারা হরিণের

শিং, তার চামড়া, বাইসনের মাথা প্রভৃতি ব্যবহার করত। এই মত পোষণ করে অবন্তীকুমার সান্যাল[৫] বলেছেন যে পরে এ থেকেই মুখোশের সৃষ্টি হয়েছে। বড়ো কথা হল এই ভাবে তারা তাদের অভিপ্রেত বিষয়কে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বশীভূত করতে চেয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের নৃত্য ও গীতের আসল উদ্দেশ্য ছিল শত্রু এবং ভয়কে জয় করা। এটাও ছিল তাদের এক জাতীয় উৎসব। আকাঙ্ক্ষিত এবং অভিপ্রেতকে পাবার জন্যে তারা নৃত্য-গীত নির্ভর আনন্দানুষ্ঠানকেই বেছে নিয়েছিল। কারণ এই নৃত্য-গীতই ছিল তাদের এই মানসিকতাকে প্রকাশ করার একটা বড় মাধ্যম। তাই এইসব নাচ ও গানের মধ্যে তাদের মানসিকতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মনের ঘনীভূত আবেগ, কল্পনায় অভিপ্রেতকে প্রাপ্তি, শত্রুকে পরাজিত হতে দেখা, অথবা অমঙ্গল-অশুভ শক্তির অবসানকে সে তার বল্গাহীন নাচ ও গানের মধ্যে প্রকাশ করেছে। সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে এইসব বন্য, বর্বর নাচ ও গানগুলির কোন আবেদন আমাদের কাছে হয়ত ধরা পড়বে না। কিন্তু আদিম যুগের মানুষদের উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ এইসব নাচ ও গানকে উপেক্ষা করা চলে না। এইসব অনুন্নত ও আদিম শিল্প বিকাশের ধারা থেকে উন্নত শিল্প বিকাশের উৎসকে অনেক সময় আমরা খুঁজে পাই—"...উন্নত শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যে এগুলি মূল-উৎস একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাশ্চাত্য সঙ্গীততত্ত্ববিদ মরিয়স সিনাইডার এই মতের সমর্থন করে বলছেন ঃ

Nevertheless even in the oldest cultures we find the pre conditions of art : the mastery and more or less conscious shaping of the medium of expression. Where the singer, who is at the same time dancing, tries to achieve a certain regularity of his movements, his singing takes on regular musical forms."[৬]

উৎসব, ধর্মানুষ্ঠান এবং নৃত্য-গীতিমূলক আনন্দানুষ্ঠানের ভেতর থেকে মানুষের সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার একটা পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। শিকারজীবন থেকে যদি মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক পরিণতির কথা ধরি, তাহলে মানুষ কৃষিজীবি ও পশুপালকের স্তর অতিক্রম করে এসে তার উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। এই ক্রমপরিণতির স্তরেই তাদের নাচ ও গানের অগ্রগতির ধারাও ছিল অব্যাহত। ভিয়েনার প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক O. Menghin[৭]-এর আলোচনা থেকে আমরা একথা জানতে পারি।

সেইসব আদিম মানুষদের নৃত্য-গীতের প্রকৃতি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—শিকার, পশুপালন এবং কৃষিজীবন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ[৮] নৃত্য ও গীতের বিষয়বস্তুগুলিকে ভাগ করে দেখিয়েছেন যে সেইসব আদিম মানুষেরা কতখানি সমাজ-সচেতক ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠান, আচার, বিচার, সংস্কার প্রভৃতি বিষয়কে তারা তাদের নাচ ও গানের উপজীব্য করে তুলত। যেমন—জন্মসম্বন্ধীয় সংস্কার-(স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই) বিবাহ, যুদ্ধসম্বন্ধীয়

এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নৃত্য এবং গীত তারা একক অথবা সমবেতভাবে পরিবেশন করত। ধর্মমূলক নৃত্য-গীতের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় ছিল পূজা। এই পূজা সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, সর্প, বৃক্ষ, পিতৃপুরুষ ভূতপ্রেত ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করে নিবেদিত হত। এছাড়া, রোগ, মৃত্যু এবং মৃতদেহ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়েও নাচ ও গান করা হত।

কৃষি ব্যবস্থার যুগে কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে আত্মীয় করে তুলেছিল। মাটির প্রজনন শক্তিকে সে বিকশিত করে তুলল। প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে মানুষ তার শক্তি দিয়ে মাটির গর্ভ থেকে খাদ্যান্বেষণ করতে শিখল। চাষ-আবাদের ক্রিয়া-কৌশল ধর্ম-কর্ম মানুষ ক্রমে ক্রমে শিখে নিল। এরই সাথে সাথে জমি চাষ, ফসল বোনা বা রোওয়া, ফসল তোলা ও ফসল কাটা প্রভৃতি কৃষিকার্যের নানা কর্মোপলক্ষে মানুষ নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানও পালন করত। নাচ ও গান করে পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাকে মানুষ জাগিয়ে তুলল। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিকে মানুষ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টায় মেতে উঠল। নীরব, নিঃশব্দ পৃথিবীর গর্ভে মানুষের লাঙলের কোলাহল সেদিন জেগে উঠেছিল। জেগে উঠেছিল চাষ-আবাদের সময়ে মানুষের নাচ-গান করার প্রবণতা। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্যের ভাব ও ভাষা মানুষ সেদিন শস্য উৎপাদনের মধ্য থেকে খুঁজে পেয়েছিল। এই তথ্য দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[৯]-এর আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পারি। কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাসকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে আসলে এটা হল সন্তান উৎপাদনের রহস্য আর পৃথিবীর শস্য উৎপাদনের রহস্য। মূলে সেই একই রহস্য। শুধু ভিন্ন দুটি দিক। প্রকৃতির গর্ভে যে জনন শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল মানবীয় প্রজননের সাহায্যে তাকে জানা এবং আয়ত্তে আনা। রবীন্দ্রনাথ[১০] বলছেন ঃ

"...কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জনন শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে।"

এইভাবে মানুষ সমবেত হয়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে বহু লোক এক হয়েছে। জীবিকার পথ সুগম হয়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম-কর্ম এবং উৎসবানুষ্ঠান। সমবেত মানুষকে ঐক্য সূত্রে বেঁধে রাখতে পারে উৎসব এবং ধর্ম। আমাদের দেশের অনেক উৎসব হল কৃষি নির্ভর। মাটির এই কল্যাণী শক্তির বিকাশকে মানুষ তার জীবনেও দেখতে চেয়েছে। এই কল্যাণী শক্তির উদ্ভব রহস্যকে সে তার জীবন দিয়ে বুঝতে ও জানতে চেয়েছে। সেই কৃষি কর্ম, ফলন-ফালনকে নিয়ে সমবেত মানুষ উৎসব করেছে, করেছে বার ব্রত এবং নানা অনুষ্ঠান। মেলা এবং উৎসবের তাৎপর্য খুঁজতে গেলে আমাদের তাই সভ্যতার গোড়ার দিকে এই কৃষিবিদ্যাকে মূল্য দিতেই হবে। "...বস্তুত মানব সভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপন সখ্যে. সেই ছিল তার এক বড়ো যুগ। সেই

দিন সখ্য ধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।...

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্য সমাজ কত বড়ো মূল্যবান্ ব'লে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণ রেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা-ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল[১১]...।"

প্রাচীন কালের মানুষ বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকত। যেমন শিকার, পশু-পালন, কৃষি, সুতো কাটা, কাপড়বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প রচনা, নৌ চালনা, বাণিজ্য ও শিল্প এবং চারুকলা ও বিজ্ঞান। এই কর্ম বা শ্রমকে কেন্দ্র করে মানুষ একত্রিত হত। হাতের কাজকে লাঘব করার জন্যে কণ্ঠের ভাষাকে ও সুরকে ডাক দিত। এইভাবে রচিত হত নানান ধরণের শ্রম সঙ্গীত (work song) বা কাজের গান। এই গান অবসর বিনোদনের জন্যে নয়। এ গান তার কাজের অঙ্গ। তাই গান তার শ্রমকে লাঘব করত। সকলকে একসঙ্গে একতালে সংহত ভাবে একটি কাজ করবার অবস্থায় এনে দিত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন'-গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে কাজের সঙ্গে নাচ ও গানের যোগাযোগ ছিল। আদিম মানুষদের মধ্যে গান, নাচ ও কাজ একসঙ্গে একাকার হয়েছিল। উৎপাদন ক্রিয়াকর্মের পক্ষে নাচ ও গান ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। "...পুরো দলকে ডাক দিয়ে তারা একসঙ্গে মিলে নাচবে আর গান করবে—নাচটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ, গানটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ। এইভাবে কামনা সফল হবার ছবিটি দেখতে দেখতে পুরো দল মেতে উঠবে, মেতে উঠে কাজে বেরুবে।...আজো পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে সব মানুষের দল পিছিয়ে পড়া অবস্থায় টিকে রয়েছে তাদের চেতনায় কাজের সঙ্গে নাচ গানের সম্পর্কটা কী রকম দেখা যাক। শ্রীমতী জেন হ্যারিসন বলছেন ঃ

When a savage wants Sun or wind or rain, he does not go to Church and prostrate himself before a false god; he summons his tribe and dances a Sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt and catch a bear he does not pray to his god for strength to out wit and out match the bear, he rehearses his hunt in a bear dance."[১২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন কর্মে মানুষ যখন নিজেকে নিয়োগ করল তখন সেই উৎপাদন কর্ম মানুষের পক্ষে একা একা করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। সরাই মিলে হাতে হাত লাগিয়ে একসঙ্গে কাজ করত। ব্যষ্টি নয়—সমষ্টি। শ্রম এবং উৎপাদন ক্রিয়াকর্মের মধ্যে এই সমষ্টিগত সাম্য (Collective Unity) প্রতিষ্ঠিত হল। এতে ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এলো ভাষা, সুর, গান ও নাচ। আমাদের মনে হয় এইভাবেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানুষ তার সুপ্ত মনের কামনা-বাসনাকে ঘনীভূত আবেগের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছে কোন উৎসবানুষ্ঠানে অথবা বার-ব্রততে। এখানেও সেই সমবেত

হওয়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কাজ করেছে। উৎসবে ও অনুষ্ঠানে মানুষ একে অপরকে ডাক দিয়েছে মিলিত হবার জন্যে। মনের সুপ্ত বাসনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে নাচ, গান ও কথার মাধ্যমে। এখানেও উৎসবের গান ও নাচ অবসর বিনোদনের জন্যে নয়—এই নাচ ও গান হল সেই উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। এই উৎসব অনষ্ঠানের বড়ো মাধ্যম হল মানুষের নাচ গান ও কথা। এই নাচ ও গানের মধ্যে মানুষ তার কামনাকে মনের অনন্ত আবেগ দিয়ে প্রত্যয়ীভূত করে তুলতে চায়। সেই আবেগ-নিঃসৃত সুপ্ত কামনা বাসনার ছবিকে নিয়েই সৃষ্টি হয় শিল্প ও সাহিত্য। বিশেষ করে লোক-সাহিত্য।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে—প্রাচীন কৃষি-নির্ভর সমাজ জীবনকে অবলম্বন করেই বাংলার লোক-সাহিত্য রচিত হয়। লোকসাহিত্য গড়ে ওঠার পিছনে কৃষিভিত্তিক সমাজের গোষ্ঠী চেতনা যে কাজ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন মানুষের মধ্যে এই গোষ্ঠী চেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে কৃষিভিত্তিক সমাজের ভূমিকাটি ছিল অপরিহার্য। যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো না হয়ে সমাজবোধ বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রাচীন মানুষের উৎসব-চিন্তাতেও এই সমাজবোধ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত করেই তারা উৎসবের আনন্দকে ভাগ করে নিতে চেয়েছে। এটাই ছিল প্রাচীন মানুষদের কাছে উৎসবের সবথেকে বড় তাৎপর্য। কৃষিভিত্তিক সমাজের সেই প্রাচীন সভ্যতা ও গোষ্ঠী চেতনা মানুষের শিল্প ও সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে উন্নত করে তুলেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজের ধর্ম-কর্ম ও কল্যাণ বোধ বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে নানা ভাবে। শস্যের কামনাকে কেন্দ্র করে মানুষ প্রাচীন কাল থেকে তাই পালন করে আসছে নানা প্রকার কৃষি-মূলক অনুষ্ঠান ও শস্যোৎসব। এইসব উৎসবানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে রচিত হয়েছে নানা প্রকারের গান, ছড়া, কথা ও কাহিনী। অনুষ্ঠান-নির্ভর এইসব লোক-সাহিত্যের মধ্যে একদিকে মানুষের কামনা-বাসনা অন্যদিকে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। উৎসবানুষ্ঠান যেমন মানুষের সমবেত প্রয়াসে সার্থক হয়ে ওঠে তেমনি মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং সাহচর্যে লোক-সাহিত্য রচিত হয় সামগ্রিক সমাজবোধ এবং সংহতির ওপর ভিত্তি করে। আশুতোষ ভট্টাচার্য[১৩] বলছেন ঃ

"…লোক-সাহিত্য প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট রস সম্পদ মাত্র ; সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ইহারও ক্রমবিকাশের সূত্র গ্রথিত হইয়া থাকে ; সুতরাং সমাজের মর্মকোষের সন্ধান জানিতে না পারিলে, ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না…।" লোক-সাহিত্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে উৎসব এবং আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের একটা যোগ রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে মেলা ও উৎসবের মাধ্যমেই লোক-সাহিত্য প্রচারলাভে সমর্থ হয়। এই প্রচার লাভের উদ্দেশ্য হল আনন্দোৎসবের সূত্রে সাধারণ মানুষকে ধর্মশিক্ষা এবং সাহিত্যরস

বিতরণ করা। এই রীতি আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে উৎসবানুষ্ঠানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি[১৪] বলছেন ঃ

"…একা একা কিংবা পরিজন লইয়া হর্ষ প্রকাশে উৎসব হয় না। বহুজনের ক্রিয়াযোগ না হইলে উৎসব হয় না…।" অর্থাৎ মেলা ও উৎসবে ব্যষ্টির কামনায় সমষ্টির কামনা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মানুষের সামাজিক কল্যাণবোধ, জাতিগত ঐতিহ্য এবং সংস্কার উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। তাই বহুজনকে একত্রিত করে কোন কিছুর উপলক্ষে হর্ষ প্রকাশ করাই উৎসবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। স্বদেশ ও সমাজের মর্মকোষে ঐতিহ্যগত যে ধর্ম, সংস্কার ও সাহিত্য রয়েছে উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সজীব করে তোলাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' গ্রন্থে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী[১৫] বলছেন ঃ

"যে কোনও জাতির ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার ধ্যান ধারণা, তাহার চারিত্রিক আদর্শ, তাহার সামাজিক রীতিনীতি সমস্তই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।"

আমাদের এই আলোচনার ধারা থেকে বিশেষ কয়েকটি বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত প্রাচীন যুগে মানুষ তার ভাব প্রকাশের জন্যে ভাষার আশ্রয় নিয়েছিল। আনন্দ প্রকাশের জন্যে বেছে নিয়েছিল নৃত্য এবং গীত। জীবিকা নির্বাহের প্রাথমিক স্তরেও সে আনন্দোৎসব থেকে বিরত হয়নি। প্রাচীন আর্যরাও যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করে তাদের আদর্শ ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখত। আরণ্যক সমাজ বিকাশের ধারার মধ্যেও নৃত্য-গীত এবং উৎসবানুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষেরা সমবেত হয়ে উৎসবে রত হত। এইভাবে উৎসবের মধ্য থেকে সামাজিক কল্যাণবোধ, সমষ্টির উন্নয়ন, পারিবারিক সুখ বৃদ্ধির কামনা জেগে উঠল এবং সেই কামনা ও বোধকে প্রতিফলিত করার জন্যে মানুষের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠল। মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উৎসবানুষ্ঠানের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল। সাহিত্যে এবং শিল্পে সমাজ ও মানুষের মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ, যন্ত্রণা প্রতিফলিত হল। উৎসব মানুষের মধ্যে সামাজিক সংহতির সৃষ্টি করে। সকলকে নিয়ে মানুষ তাই উৎসব করে। শিল্পসাহিত্য ব্যষ্টি মন থেকে সৃষ্টি হলেও সমষ্টির ভাবনা-চিন্তা তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। উৎসবানুষ্ঠান তাই কোন বিচ্ছিন্ন সমাজ বোধের ফল নয়, তা হল জীবনবিকাশের ঐতিহ্যগত ধারার প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন। যুগবাহিত এই সুপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানেই ধরা পড়ে। মানুষের প্রাচীন ধ্যান-ধারণামূলক স্মৃতি-সম্পদকে সজীব করে রাখে লোক-সাহিত্য। কারণ এইসব ধ্যান-ধারণার বিকাশের মূলে রয়েছে মানুষের সমাজ-জীবনের প্রবাহ।

শব্দগত তাৎপর্য : উৎসব এবং মেলা

উৎসব ও মেলার শব্দগত তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা শোনা যায়। ঋক্‌বেদে 'উৎসব' অর্থে 'আরম্ভ' অথবা 'আনন্দজনক ব্যাপার'—, কিংবা 'আনন্দ', 'উৎসেক বা ইচ্ছা প্রসব'। আবার উৎসব অর্থে 'কোপ', 'উন্নতি ও অভ্যুদয়'। 'উৎসবো মহউৎসেকে ইচ্ছা প্রসবকো পয়োঃ। মেদিনী'।[১৬] অন্য আর একটি ব্যাখ্যায় শোনা যায় যে উৎসব অর্থাৎ 'যাহা সুখ প্রসব করে'। অথবা 'ইচ্ছার উৎপত্তি', 'ইচ্ছা প্রসব', 'তাণ্ডব' কিংবা 'হর্ষণ', 'উদ্গম', 'রোমোৎসব'।[১৭]

ওপরের অর্থ থেকে আমাদের দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। প্রথমতঃ উৎসব অর্থে কোপ বা তাণ্ডবকেও বোঝানো হয়েছে। আদিম আরণ্যক মানুষদের প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি যে তাদের নৃত্য-গীতের মধ্যে একটা প্রমত্ত ভাব বজায় থাকত। গানে ছিল উদ্দামতা, নৃত্যে থাকত যৌবনাবেগ ও উদ্দামগতি। কখনও বা এইসব নৃত্য-গীতানুষ্ঠান একাধিক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হত। অতীতে আমাদের দেশে ধর্ম ও গাজনোৎসবে গাজন-সন্ন্যাসীরা নৃত্য-গীত এবং বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে একটা উন্মত্ত বা প্রমত্ত ভাব বজায় রেখে অনুষ্ঠানাদি পালন করত। বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ধর্ম ও শিবের চড়ক-গাজনের অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও এই উন্মত্ত ভাব চোখে পড়ে। কখনও কখনও তাদের ভর হয়। ভরের মুখে তারা মন্ত্র বলে কিংবা প্রাণের আবেগে নানা প্রকার ছড়া কাটে। এর মধ্যে আমরা একটা উদ্দণ্ড ভাব ও তাণ্ডবতার পরিচয় পাচ্ছি। প্রাচীন কালের লোকায়তিকদের আনন্দোৎসবে একটা উদ্দণ্ডতা প্রকাশ পেত। এই লোকায়-তিকেরা ছিল যোগী ও বামাচারী। তারাও প্রতি বছর কোনো একদিনে প্রমত্ত হৃদয়ে সমবেত হত। শুধু সমবেত নয়, নির্বিচার মৈথুনে আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রীগণের সঙ্গে রমণ ক্রিয়ায় লিপ্ত হত। এ ছাড়াও বাংলাদেশের সাঁওতালদের মধ্যেও এই জাতীয় উৎসব প্রচলিত আছে। নাচ, মদ্যপানে এবং ব্যভিচারে সাঁওতালরা পাঁচটা দিন উদ্দামতার সঙ্গে কাটায়। মৈথুন ব্যাপারেও তারা যা খুশি তাই করে।[১৮] তাই উৎসব অর্থে যেখানে রোমোৎসব, উদ্গম, হর্ষণ কিংবা কোপ বা তাণ্ডবকে বোঝাচ্ছে সেখানে প্রাচীন কালের আদিম ভারতীয় জাতি অথবা যোগী বামাচারী লোকায়তিক সম্প্রদায় কিংবা আজকের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উৎসবের ভেতর থেকে সেই ছবিটা অথবা সেই বল্গাহীন উদ্দামতার ব্যাপ্তিটাকে আমাদের বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, উৎসব অর্থে বলা হয়েছে ইচ্ছা প্রসব বা ইচ্ছার উৎপত্তি। প্রাচীন মানুষ তার মনের সুপ্ত ইচ্ছাগুলোকে উৎসবের মধ্যে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছে। যা হয়নি তাকে হওয়াতে চেয়েছে। যা ঘটেনি তাকেও ঘটাতে চেয়েছে। একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি। চাষ-আবাদের সময় প্রাচীন মানুষদের নৃত্য-গীতের মধ্য থেকে শস্যোদ্গমের উজ্জ্বল চিত্রটা ফুটে উঠত। তারা ভূত তাড়াতো, উৎসব ক'রে কিংবা নাচ গানের মাধ্যমে অমঙ্গল

শক্তিকে অপসারিত করার চেষ্টা করত। এইসব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের চেষ্টা থেকেই জাদুর উৎপত্তি হয়েছে। তাই আমাদের মনে হয় উৎসবের আর এক নাম ইচ্ছা প্রসব অথবা ইচ্ছার উৎপত্তি। উৎসবে মানুষ মিলিত হত মনের অরূপ ইচ্ছাগুলোকে রূপময় করে তুলতে। অথবা তার ইচ্ছাকে, তার অভাবকে মানুষ আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের মানসিক প্রেক্ষাপটে উদ্গত হতে দেখতে চাইত। অর্থাৎ তারা তাদের কামনা সফল হওয়ার অভিনয়টা উৎসবের মঞ্চে সম্পন্ন করত। মনের ইচ্ছাকে কোন কিছুতে আরোপ করে সেই আরোপিত ইচ্ছার সফল ছবিটাকে দেখতে মানুষ ভালবাসে। যেমন শস্ পাতার ব্রতানুষ্ঠান। এই শস্ পাতার ব্রততে মানুষ শস্য চায়। কিন্তু সে তার কামনাকে সফল করে তুলতে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৯] তাঁর 'বাংলার ব্রত'-গ্রন্থে শস্ পাতার ব্রতানুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে মানুষের আকাঙ্ক্ষাটা প্রতিফলিত হয় তার নাচ-গান ও ক্রিয়ানুষ্ঠানে।

মেলা

মেলা শব্দের তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে—'(১) অনেক, প্রশস্ত। (২) সমাজ, সভা। (৩) তীর্থাদি স্থলে বহু লোকের সমাগম। কোন পূজা বা মহোৎসবাদি উপলক্ষে এক এক স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়, সেই স্থলে হাট বাজার প্রভৃতি বসে। বহু লোক একস্থানে মিলিত হয় বলিয়া ইহার নাম মেলা হইয়াছে।'[২০] 'মেলকে সঙ্গ-সঙ্গমৌ' (অমর কোষ)=মিলন (meeting, union to assemble together) মানব সমাজে 'মেলক' স্থির করে নারী ও পুরুষের বিবাহ দেওয়া হয়। এই 'মেলক' অর্থে মিলন বা সমূহ। তাই 'মেলক' শব্দটি ঐক্য কারক বা মিলন কারক। মেল (মিল+ ঘঞ্) ঐক্য, মিলন, জনতা উৎসব স্থানে লোকারণ্য—মেলা—মেলক (মেল+ কণ) সঙ্গ, সহবাস (মিল+ণক) অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলিত হয়।

বঙ্গীয় শব্দকোষে মেলা অর্থে 'সমাজ', 'সভা', 'দল'কে বোঝানো হয়েছে। 'মেলন স্থান' অর্থাৎ 'মেলা'। 'মেলন' অর্থে 'সঙ্গ', 'সমাগম', 'সংযোগ', 'সঙ্গম' অথবা 'সংশ্লেষ'। "প্রিয়া সহঃ প্রভু বিলসয়ে সখী মেলে।"[২১]

তাহলে উৎসব এবং মেলা শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে সামগ্রিক ভাবে উৎসব এবং মেলার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। জনসমাগম অথবা সমাবেশে অর্থাৎ বহুজনে একত্রিত হওয়াই হল উৎসব এবং মেলার বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ পৃথক হতে পারে কিন্তু উভয়ের উপাদান এক, তা হল জনমণ্ডলী। এই জনমণ্ডলী অসংহত, বিচ্ছিন্ন নয়। উৎসবে এবং মেলায় যে জনতা আসে তারা সংহত এবং অবিচ্ছিন্ন। বহুজনের ভাবনা চিন্তা সম্মিলিত হয় এই উৎসবে ও মেলায়। একত্রিত মন একটা ঘনীভূত আবেগের দ্বারা চালিত হয়। মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত গীত

শ্রবণে, নৃত্য দর্শনে ও নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানে মানুষ সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উৎসব এবং মেলা জনতাকে একই ভাবে ভাবিত করে তোলে। একই উদ্দেশ্যে একই হিতার্থে পরিচালিত করে। মেলা ও উৎসব যেন 'বহুজন হিতায়—, বহুজন সুখায়'—। সমগ্র জনতার ইচ্ছাশক্তি তাই এক সূত্রে গ্রথিত হয়। এইখানেই উৎসব এবং মেলার সবচেয়ে বড় তাৎপর্য। তাই মেলা ও উৎসবের জনতা কোন বিচ্ছিন্ন জনতা নয়, তা হল সঙ্ঘবদ্ধ জনতা। সেই সঙ্ঘবদ্ধ জনতা মেলা ও উৎসবে সমমনোভাবাপন্ন জনতায় (common interst crowd) পরিণত হয়। মেলাতে বাউল গানের সমাবেশে কিংবা কথক-ঠাকুরের আসরে জনতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এক মনে সেই গান ও কথা শ্রবণ করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত জনতা ধীরে ধীরে একটা সমষ্টি মনে পরিণত হয়। এই জনতায় যেমন সাক্ষর মানুষ থাকে, তেমনি নিরক্ষর মানুষও এসে জড়ো হয়। বর্ণ, শ্রেণী, সংস্কার, রুচির ও শিক্ষার কোন ভেদাভেদ এই জনতায় থাকে না। বাউলের গান অথবা সীতার বেদনা কিংবা শিবের ঘরকন্নার কথা সকলে এই মেলা ও উৎসবে এসে শান্ত মনে শ্রবণ করে।

মেলা ও উৎসবের কোন লোকসঙ্গীত বিশৃঙ্খল জনতাকেও সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে তোলে। কোন ব্যষ্টি মনের রচনা ও সুর সমষ্টির মনকে স্থির ও শান্ত করে দেয়। আত্মস্থ জনতা লোক-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবগাহন করে। সমষ্টি মন, ব্যষ্টি মন বা শিল্পীর নৈকট্য লাভ করে। এমনিভাবে একে অপরের সঙ্গে অন্বিত হয়ে থাকে। এই অন্বিত হওয়ার পিছনে থাকে তিনটি উপাদান। প্রথমতঃ সেই মেলা ও উৎসব। দ্বিতীয়তঃ মেলা ও উৎসবের জনতা। তৃতীয়তঃ মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত লোক-সাহিত্য। যে লোক-সাহিত্য জনতাকে শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়[২২] বলছেন ঃ

"বিশৃঙ্খল জনতাকে লোকসঙ্গীত যত সহজে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শান্ত করিতে পারে, আর কোন কিছুই তাহা পারে না। কারণ, লোকসঙ্গীতের সুর সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, উচ্চতর কিংবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আবেদন এত সর্বব্যাপী হইতে পারে না।"

মেলা ও উৎসবে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীত শুনতে পাই! লোক-কবিরা কখনও মুখে মুখে আবার কখনও বা স্মৃতি থেকে উৎসবানুষ্ঠানে কত নূতন ও পুরাতন লোকসঙ্গীত প্রচার করেন। লোক-কবি ও শিল্পীদের সৃজনশীলতার গুণে সাধারণ মানুষেরা আকৃষ্ট হয়। মেলা ও উৎসবের একই মঞ্চে মুখোমুখি এসে উপস্থিত হয় শিল্পী ও শ্রোতার দল। সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং নানা সাময়িক ঘটনার অভিজ্ঞতাকে নিয়ে লোক-কবি ছড়া ও গান রচনা ক'রে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে আপামর সাধারণ শ্রেণীর কাছে তা প্রকাশ করেন। মেলা ও উৎসবের সমমনোভাবাপন্ন জনতা বা রসাস্বাদনকারীর মনের সঙ্গে কবি ও শিল্পীর মনের একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপিত হয়। তাই লোক-কবির সঙ্গে রসাস্বাদনকারীও একই ভাব-ধারায়

একাত্ম হয়ে যায়। শিল্পীর গানে ও ছড়ায় বর্ণিত দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও রসঘন মুহূর্তগুলোর মধ্যে জনতার হৃদয় নিজেকে অনুসন্ধান করে। উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে লোক-কবি এবং জনতার মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভবপর হয়। এই সাক্ষাৎ নৈকট্য লাভের মধ্য দিয়ে একের সুখ-দুঃখ-সমস্যা-ইচ্ছা ও কামনা উৎসবের জনারণ্যে প্রবাহিত হয়। নারায়ণ বসু[২৩] বলছেন ঃ

"...both the communicator and the communicant stood on the same platform and were made aware of their problems in the work-a-day life..."

এইখানেই লোক-সাহিত্য প্রচারে মেলা ও উৎসবের সার্থকতা। শিল্পী ও জনতার মুখোমুখি সংযোগ ঘটে মেলা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে (**Face to Face Communication**)।

এইসব আলোচনার সূত্রে আমাদের কাছে মেলা ও উৎসবের তাৎপর্যটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জনতা ও লোক-কবিরাই হল তাই মেলা ও উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে সেই সাধারণ মানুষের কাছে লোক-সাহিত্য প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠাননির্ভর লোক-সাহিত্যের পরিচয় পেতে হলে আমাদের দেশের বিভিন্ন মেলা ও উৎসব এবং আঞ্চলিক গীতানুষ্ঠান প্রভৃতির কথা জানা প্রয়োজন। লোক-সাহিত্যের প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবের মত যুগবাহিত প্রাচীন লোক মাধ্যমের ভূমিকা তাই আজ আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার মেলা এবং উৎসব ঃ প্রসঙ্গ ও পরিচয়

মেলা ও উৎসব

উৎস ও পটভূমি বিশ্লেষণ ঃ আমাদের বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে নানা ধরণের অসংখ্য মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইসব মেলা ও উৎসবের মধ্য থেকে বাঙালীর আপন ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাবধারার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য ধরা পড়ে বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতি এবং লোক-সাহিত্যে। টুসু-ভাদু গানে, মুখোস নৃত্যে, কাঁটা ঝাঁপে, ঝাঁপান উৎসবে, গম্ভীরা ও গাজন গানে এবং বাঙালীর বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানেও শিল্প, সংস্কৃতি এবং লোক-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। মেলা ও উৎসবকে তাই আকস্মিক এবং খামখেয়ালী পূর্ণ লোক-সমাবেশ বা জনতার ভিড় মনে করা চলে না। গ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে মেলা ও উৎসব হল আনন্দ ও লোকশিক্ষার এক জীবন্ত বাহন।

সমাজবাদী চিন্তাধারার সমর্থন যাঁরা করেন এবং কৃষিকেন্দ্রিক বাংলার লোক-জীবনের সংগঠন ও বিকাশের কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা তাই আমাদের মেলা ও উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখার কথা অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যেই বাংলার পল্লীজীবনে মেলার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ দেশের মেলা ও উৎসবগুলি সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষার এক সফল প্রচারভূমি।

বাঙালী জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্থান পতন ও বিকাশের ধারাটি পর্যালোচনা করবার সময় বাঙালীর লোক সমাজের স্বরূপ ও সমাজ গঠনের ইতিহাসের কথাটাও তাই আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগধর্ম ও সমাজধর্ম মানসিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। যুগধর্মের বাতাবরণে মানুষ যেমন লালিত পালিত হয়, সেই ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতিও সমানভাবে সুগঠিত হয়। সাহিত্য হল মানসিক সম্পদ। যা মানুষের চিন্তা, বোধ ও বৃত্তি থেকে উৎপন্ন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের[১] আলোচনা থেকে আমারা জানতে পারি যে—প্রাচীন নরনারীর কাছে গান ও আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে একটা কাজের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাদের গান ও আনন্দ প্রকাশের মধ্যে কামনা ও জাদু বিশ্বাসও জেগে থাকত। সেই কামনা ও জাদু বিশ্বাস থেকে জন্ম নিত তাদের আচরণীয় অনুষ্ঠান ও শিল্পকর্ম। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাণবস্তু হল কামনা। মুখে মুখে রচনা করা এইসব কবিতা বা গানের সংকলনের মধ্যে কামনাটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এইসব মন্ত্র কোনও না কোন কাজে বা অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ হত। পার্থিব বস্তুর কামনাকে ঘিরেই ঋগ্বেদের এই কবিতা বা গানগুলির সৃষ্টি। অর্থ, অন্ন, পশু, পুত্র ও

নিরাপত্তা প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর জন্যে মানুষের একনিষ্ঠ কামনা। কিন্তু এই সম্পদের প্রার্থনা ব্যক্তির জন্যে নয়, তাহলে সমষ্টির জন্যে বা গোষ্ঠীর জন্যে। অর্থাৎ আমার জন্যে নয়—তা হবে আমাদের সকলের জন্যে। সম্পদ প্রার্থনা সর্ব-সাধারণের জন্যে ও সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিতরণ করে দেবার জন্যেই এই আন্তরিক কামনা জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন কর্ম ও বৃত্তিকে অন্যতম সহায় করে প্রাচীন মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গান করেছে। কবিতা রচনা করেছে। যেমন—

"...পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া মানুষদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের ভিত্তিতে আমরা মনে করতে পারি, আদিম সমাজে কাজ বা উৎপাদন ক্রিয়া ছাড়া গান হয় না এবং গান ছাড়া কবিতা হয় না এবং জাদু বিশ্বাসগত অনুষ্ঠান (ritual) আদিম মানুষের কাছে জীবন সংগ্রামের—উৎপাদন ক্রিয়ার—একটি অন্যতম সহায়। ঋগ্বেদ যদি প্রাচীন সমাজের গান ও কবিতার সঙ্কলন হয়, তাহলে সে গান বা কবিতার সঙ্গে কাজের—অতএব, জাদু অনুষ্ঠান বা ritual এরও—কোনো-না কোনো প্রকার আদি সম্পর্ক অনুমিত হতে বাধ্য।"[২]

পণ্ডিত ও গবেষকগণের সিদ্ধান্তে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর শোণিত মিলনে বাঙালী জাতি ও তার শিল্প সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। সেই শিল্প সংস্কৃতির বিকাশের আড়ালেও বিভিন্ন সংস্কৃতির এক অভিন্ন মিলন কাজ করেছে। তাই বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতিকে 'সংকর জন' এবং 'সংকর-সংস্কৃতি' বলা যেতে পারে। বাঙালীর মেলা ও উৎসবে এই 'সংকর-সংস্কৃতি'র কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এর নেপথ্যে যে কারণ আছে তা বিশ্লেষণ করলে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে। সুপ্রাচীন বঙ্গভূমিতে আর্য সংস্কৃতির বীজ রোপিত হবার আগে আর্যেতর সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। প্রাক্তন প্রাগার্য জনগোষ্ঠী ছিল সেই সংস্কৃতির ধারক। প্রধানতঃ এরাই ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে গোপাল হালদার[৩] মনে করেন যে—যারা বাংলাদেশের আদিবাসী তারা বাংলাভাষী ছিল না। তাদের ভাষা ছিল 'হিন্দ্-আর্য'। নৃ-বিজ্ঞানের মতে বাংলার প্রাচীনতম মানুষেরা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ। এ ছাড়াও প্রাচীন বঙ্গভূমিতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার অধিবাসীরা বসবাস করত। এরা কোনো এক সময়ে পশ্চিমবাংলায় ও মধ্য বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁ প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষেরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর-ই অন্তর্গত একটা ভাঙা ভাঙা ভাষায় কথা বলে। তাই বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে বাঙালী জাতির নিচের তলায় অন্-আর্য ভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও সংস্কৃতির এক মজবুত স্তর গাঁথা হয়ে আছে। সেই স্তরের ওপর বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতির আর্যীকরণ সুসম্পন্ন হয়েছে। এরই ফলে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে উঠেছে বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতির ওপর তলার কাঠামো। কালক্রমে ওপর ও নিচের মধ্যে শোণিত মিলনের ফলে বিকাশ

লাভ করেছে বাঙালীর সংকর-সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতির মধ্যে নিবিড়ভাবে বাসা বেঁধে আছে আর্য-অন্-আর্যের এক সংমিশ্রিত রূপ। এই রূপাবয়বেই প্রতিফলিত হয় বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর্যেতর মানব গোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের আর্যীকরণ সম্পন্ন হবার পর উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হল আত্মিক মিলন। এই পারস্পরিক মিলন, আদান-প্রদান ও আর্যীকরণের ফলে বাঙালী সংস্কৃতির ওপর তলার কাঠামোটি অলংকৃত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তার নিচুতলার বনিয়াদে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও অধুনা বিলুপ্ত বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর আত্ম-মহিমা-জনিত ধ্বনি ও স্পন্দনটি জেগে রইল। সেই জন্যে অনেকে মনে করেন যে বাঙালী জাতির নিচু তলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সেই পূর্বতন প্রাগার্য সংস্কৃতির প্রভাব আজও বর্তমান—তারাই অন্ত্যজ এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ। অথবা এদের তলায় যারা আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের মধ্যেই পূর্বতন প্রাগার্য সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল এইরূপ:

"...ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যগণ জয়ী হইলেন —কিন্তু অনার্যেরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না, তাহা আর্য-উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না তাহারা আপনাদের আচার-বিচারের সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য সমাজ বিচিত্র হইল।"[৪]

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের[৫] আলোচনা থেকেও এ কথা প্রমাণিত যে প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে উন্নত এবং সভ্যসমাজের পাশাপাশি 'প্রাকৃত প্রাচীন সমাজ সহাবস্থান করেছে।' এই সহাবস্থানের জন্যে প্রাচীন সমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার ও সংস্কার প্রভৃতি উন্নত সমাজের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে গেলেও যেতে পারে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই আলোচনা থেকে আমরা আরও অনুমান করতে পারি যে সেই সভ্যসমাজের ওপর অনুন্নত আদিবাসীদের ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের একটা প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের পণ্ডিত ও গবেষকগণ এই আদিবাসীদের বিভিন্ন নামে ভূষিত করেছেন। যেমন অনার্য বা আর্যপূর্ব বা আর্যেতর কিংবা দ্রাবিড়। এরাই হল আমাদের দেশের আদিম কোম (Tribal) সমাজ। এই ট্রাইব্যাল সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এইসব অনুন্নত জাতিদের অবদান উন্নত সভ্য-সমাজের মধ্যে অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। তাই সভ্য-সমাজের ওপর ভারতীয় আদিবাসীদের ধ্যান-ধারণা এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিক ভেদে আদিবাসী সমাজের ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব ভারতবর্ষের বিভিন্ন সভ্য সমাজের উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে আছে। কারণ—"...অনার্যদের এই দেশে প্রবেশ

করবার পর শিক্ষিত ও সংস্কৃত আর্যদের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু কিছু অসংস্কৃত অনার্য-বিশ্বাস প্রবেশ করেছিলো।...এ প্রসঙ্গে এ. বি. কীথের মত হল—"স্থানীয় অসভ্য মানুষদের নানান ধ্যান-ধারণা আর্যদের ধ্যান-ধারণার রাজ্যে 'সেঁদিয়ে' গিয়েছিলো।"[৬]

আর্যেতর ও আর্যভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে আর্য-অন-আর্যের যে শোণিত মিলন সম্পন্ন হল তার ফলে বাঙালী জাতির ওপর তলায় বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এক মিলিত বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়। এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচারকেরা তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন। এই তন্ত্র অতি প্রাচীন এরং একেবারে গোড়াতে এই তন্ত্র আর্যেতর জাতিসমূহের মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল। এই আর্যেতর জাতিরাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী শক্তি রূপে দেখা দিয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রচারকেরা তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বাঙালী জাতির ওপর তলার বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিজয়বার্তার মধ্যে তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যা হোক বাঙালী সমাজের ত্রি-স্তরে দেখা দিল যথাক্রমে নাগরিক সমাজ, গ্রামীণ সমাজ এবং সর্বশেষ স্তরে রইল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সমাজ। বাঙালীর এই ত্রি-স্তর সমাজিক কাঠামোয় অন্ত্যজ শ্রেণী মানুষের সংখ্যাই বেশি। একথা আগেই বলা হয়েছে যে এই ইতর জাতির ধমনীতেই প্রাগার্য সংস্কৃতির শোণিত ধারা বহমান। আমাদের মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই সামাজিক ত্রি-স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকেও আছে এই ত্রি-স্তর। একদিকে রাজা যে হল ধনভোগী নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। ফাগুলাল প্রভৃতিরা হল ধন উৎপাদনকারী গ্রামীণ সমাজ আর পালোয়ান প্রভৃতি হল অন্ত্যজ শ্রেণী মানুষের সমাজ। বাঙালী জাতির এই সামাজিক ত্রিস্তরের পাশাপাশি বাঙালী লোক-সমাজেরও শ্রেণী বিন্যাস আমাদের চোখে পড়ে। এই লোক-সমাজের ওপর তলার কাঠামোতে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী, দ্বিতীয় তলায় নিম্নতর সমাজ আর একেবারে নিচের তলায় অবস্থান করছে বাংলার প্রাচীন কোম্ সম্প্রদায়। এরাই হল অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায়। এই উপেক্ষিত নিচুতলার সমাজের কথা উপেক্ষা করলে বাঙালী সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে না। কারণ বাঙালীর ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই ট্রাইব্যাল সমাজের প্রভাব ও পরিচয় অঙ্গীভূত হয়ে আছে। বাঙালী জাতির স্তর বিন্যাসের তৃতীয় স্তরে অন্ত্যজ সমাজ এবং বাঙালী লোক-সমাজের কাঠামোর শেষ ধাপে আদিবাসী সমাজ অবস্থান করছে। যে সমাজ আজ পর্বতে, মাঠে, নদীতীরে, জঙ্গলে এবং জনবহুল নাগরিকসমাজ থেকে বহুদূরে বসবাস করছে। তাদের ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে বাঙালীর মেলা ও উৎসব, বার ব্রত এবং টুসু, ভাদু প্রভৃতির মত বাংলার প্রাচীনতম গ্রামীণ লোক-উৎসবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ বাঙালীর বিশেষ বিশেষ মেলা ও

উৎসবের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলার প্রাচীন কোম্ সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বাংলার লোক-সাহিত্যে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজের পরিচয়ও গাঁথা হয়ে আছে। সেইসব লোক-সাহিত্যের পরিচয় পেতে গেলে বাঙালীর মেলা ও উৎসবের মধ্যে এসে আজ আমাদের দাঁড়াতে হবে। যুগ পরম্পরায় বাংলার গ্রামীণ মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করেই মেলা ও উৎসবনির্ভর বাংলার লোক-সাহিত্য মুখে মুখে প্রচারিত হয় জনমণ্ডলীর মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রচার মাধ্যমগুলি অপেক্ষা মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোক মাধ্যম লোক-সাহিত্য প্রচারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ এই মাধ্যম না থাকলে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংযোগ সাধন সম্ভবপর হত না। মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত আচার-আচরণ, পালনীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং গীত ও পঠিত লোক-সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন কোম্ সমাজ এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী সম্মিলিত সেই আর্যেতর সমাজের অসংবদ্ধ শিল্প-সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা কিংবা আচার-অনুষ্ঠানের অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, বিবর্ণ চেহারাটি ধরা পড়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ বাঙালীর ব্রত উৎসবের মধ্যে প্রাচীন সমাজের ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের আদিম মানুষেরা মনের অতল তলে সঞ্চিত কামনাকে সফল করার পথে নকল নাচ-গানের আশ্রয় গ্রহণ করত। এর দ্বারা তারা মনে করত যে তাদের অন্তঃস্থিত কামনা বুঝি বা সফল হয়ে উঠবে। এটা ছিল আদিম মানুষদের একটা বিচিত্র বিশ্বাস। এটাকে জাদু বিশ্বাস বা magic বলা যেতে পারে। অর্থাৎ কল্পনার হাতিয়ার দিয়ে অজেয় প্রকৃতিকে বশীভূত করার এক অদম্য প্রচেষ্টা। একদিকে বাস্তবের কঠোর-কঠিন জীবনের অমীমাংসিত সমস্যা, অন্যদিকে কাল্পনিক রণশয্যায় শায়িত সেই কঠিন জীবনের সমস্যাটি পরাভূত। তাই তারা জয়ের নেশায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উৎসবে মেতে উঠত। মনে মনে বিশ্বাস করত অজেয় প্রকৃতি পরাভূত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন মেয়েলী ব্রত উৎসবের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণার পরিচয় আমরা পাই। যেমন শস্ পাতার ব্রত। এই শস্ পাতার ব্রততে মানুষ শস্যের কামনা করে। যে ব্রতটি বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে 'ভাঁজো' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৭] বলছেন ঃ

"সে যে ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্ পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্র মাসের মন্হনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্হনষষ্ঠীর পূর্ব দিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠী পূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং ইঁদুর মাটির সঙ্গে মেখে একটা নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার পাঁচ দিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ

বৎসর শস্য প্রচুর হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র দ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান। নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্র চিহ্ন দেওয়া আলপনা; কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শস্ পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তার পর সাত আট থেকে কুড়ি পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বেদীর চারদিক ঘিরে নাচ গান শুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে:

ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা,
ভাঁজের গলায় দেবো আমরা পঞ্চ ফুলের মালা।...

এরপর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়া কাটাকাটি করে...সমস্ত রাত দুই দলের নাচ গান ছড়া কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারারা ঝিকি-মিকি।...এর পর রাত্রি শেষ, মেয়েরা আপন আপন শস্ পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিংবা নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্য বপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হলো এবং অনুষ্ঠান শেষ হলো উৎসবের নৃত্যগীতে..."

এই জাতীয় খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির ছড়া-আলপনা ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে একটা জাতির মানসিকতা ও চিন্তা রাজ্যের ছাপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত মূল্যায়ন নির্ধারণের উপাদান উপকরণ হিসেবে বাঙালীর এইজাতীয় ব্রত উৎসবের আবেদন ও মূল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সমাজ বিকাশের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার প্রতিচ্ছবি এইজাতীয় ব্রতগুলির মধ্য থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কারণ আমাদের সমাজের অনগ্রসর মানুষদের নৃত্য গীতোৎসব সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানে তাদের জাদুবিশ্বাস আজও সচল হয়ে ওঠে। মনের কামনাকে তারা সেইসব ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে ও কামনা সফল হবার স্বপ্ন দেখে। সেই প্রাচীন জাদুবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার পরিচয় বহন করে নিয়ে বেঁচে আছে আজকের খাঁটি মেয়েলি ব্রত উৎসবগুলি। এমনি করেই উৎসবের দীর্ঘ অববাহিকার পথ ধরে যুগপরম্পরায় প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার ও অনুভূতি আমাদের সামনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ব্রত উৎসবের মূলে থাকে দশজনের কামনা। আর সেই কামনাকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই দশজনে মিলিত হয়ে অনুষ্ঠান পালন করে। আদিম সমাজের মানুষেরাও দশজনে মিলে অর্থাৎ সমন্বিত হয়ে কর্মোদ্যমে মেতে উঠত। আদিম মানুষদের এই আচরণ ধর্মটির পিছনে যে সত্য ও বিশ্বাস ছিল তা হল দশজনে মিলে কাজ করতে হবে। তাই আদিম সমাজে একক প্রচেষ্টার কোন মূল্য নেই। গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্য দিয়ে মানসিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করা হত। সে নাচই হোক, গানই হোক অথবা কোন কাজই হোক বা উৎসব হোক। ব্রতধারার মধ্যেও এই গোষ্ঠীবদ্ধতা আমাদের চোখে পড়ে। কামনা সফল হওয়ার কাল্পনিক ছবিটাকে তারা হাস্যে, লাস্যে, গীতি-কথায় এবং নৃত্যে ও আলপনায়

মূর্ত করে তোলে। আজও যখন আমরা ভাদু ও টুসু গীতোৎসবে নর-নারীর ভাবাবেগকে লক্ষ্য করি তখন তার মধ্যে সমষ্টির কল্পনানুভূতিকেই প্রত্যক্ষ করি। সেখানে গ্রামের নিরক্ষর পুরুষ ও রমণী সমবেতভাবে এইসব নৃত্যগীতোৎসবে মেতে ওঠে। আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে এইভাবে গ্রামীণ মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। মেলা ও উৎসবে এইসব গ্রামীণ জনতা অংশগ্রহণ করে শিল্পীর সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। একদল উৎসব করে, আর একদল সেই উৎসবে আনন্দের অংশীদার হয়। একদল উৎসবকারী, অন্যদল মেলা ও উৎসবের অংশগ্রহণকারী। এমনি করে বাঙালীর মেলা ও উৎসবে দশজনে এক হয়ে যায়। তাই মেলা ও উৎসবে সবাই মিলে একই সঙ্গে একই কথা ভাবে। শিল্পীর গান গাওয়ার সঙ্গে শ্রোতার মনও নীরবে গান গায়। মেলা ও উৎসবে একদল আচার-অনুষ্ঠান পালন করে অন্য দল তা দেখে কল্পনায় সেই আচার-অনুষ্ঠান পালন করার স্বাদ গ্রহণ করে। মেলা ও উৎসবে গীত এবং প্রচারিত লোক-সাহিত্য শ্রবণ করে অন্যেরা আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে। এইভাবে নিরক্ষর মানুষের হৃদয় রাজ্যে লোক-সাহিত্য নানা আবেদন সৃষ্টি করে চলেছে বিরামহীনভাবে। সব থেকে বড়ো কথা হল যুগ পরম্পরাগত মেলা ও উৎসবের মধ্য থেকে প্রাচীন মানুষদের ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের নানা ইঙ্গিত ও ঐতিহ্য নানা রূপে আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয়। তাই ইতিপূর্বে আমরা বাঙালী জাতি ও তার সংস্কৃতিকে 'সংকর জন' বা সংকর সংস্কৃতি বলে এসেছি। বাঙালীর মেলা ও উৎসবের মধ্যেও এই 'সংকর সংস্কৃতি'র পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'সংকর সংস্কৃতি'র তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আর্য ও অনার্যের মিলনের কথাও আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খাঁটি মেয়েলী ব্রত সম্পর্কে 'বাংলার ব্রত'[৮] গ্রন্থে যে আলোচনা আছে তার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। কারণ বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতিকে বোঝার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। যথা—"...ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্য ব্রত' বলে। এটা ঠিক যে-আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অন্য ব্রত'—ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠিপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয় ভরসা হাসি-কান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এ দেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য্য এবং না-আর্য্য বা 'অন্য ব্রত'দের মধ্যে সর্বদিক দিয়ে, এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও, আদান-প্রদান চলছিল। পুরাণের দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস; ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই; কেবল এই মেয়েলী ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন পুরুষ অন্য ব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। পর পর স্তর পড়তে পড়তে মাটির ওপরের অংশ ক্রমে নীচে চলে যায়;

তখন পুরোনো জিনিস বা পৃথিবীর পুরোনো জীবজন্তুর সন্ধান নীচের তলায় গিয়ে জমা হয়। মানুষের ইতিহাসও তাই। মানুষ যতই অদল-বদলের মধ্যে দিয়ে চলুক না কেন, এমন কতকগুলো জায়গা থাকে যার মধ্যে মানুষের পূর্ব পূর্ব সঞ্চিত জিনিসগুলি ভাঁজের পর ভাঁজ পরে পরে সাজানো থাকে; আলমারিতে তাঁর নিজের ব্যবহারের ছেলেবেলা থেকে বুড়ো-বয়সের পরনের কাপড়, খেলার টুকিটাকি, নানা খাতাপত্র আসবাবের মতো।

সব উপরে হিন্দু অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তারপর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতু স্তর; তার তলায় অন্য-ব্রতদের এইসব ব্রত—একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে··· ।" মেলা এবং উৎসব ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রতধারার মধ্য থেকে সেই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার পরিচয় বার হয়ে আসে। ধর্ম বোধে আচ্ছন্ন, আচার-বিচারে নিষ্ঠা, সংস্কার ও বিশ্বাসের বাতাবরণে লালিত বাঙালী লোক সমাজের সেই অন্ত্যজ শ্রেণীর আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় বাংলার মেলা, উৎসব ও ব্রতানুষ্ঠানে পাওয়া যায়। লোককবি তার কথা ও গানে, ছড়া ও গাথায় সেইসব ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানকে ভাষায় মূর্ত করে তোলে। এমনি করেই আদিম সমাজের মানুষদের প্রাচীনতাকে অনুষ্ঠানে ও লোক-সাহিত্যে ধরে রাখা হয়। যুগ-বাহিত এইসব মেলা ও উৎসবের পরিচয় তাই আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। কারণ, কোন প্রাচীন কৌম সমাজ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হবার দরুণ আজ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণার কোন অবশিষ্টাংশ কোন উৎসবের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আজও হয়ত বেঁচে আছে। সেই আর্যেতর জাতির মানসিকতা, কোন জাদু বিশ্বাস অথবা ধর্মবোধ মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করে আজও বর্তমান কালের মানুষের কাছে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংহত সমাজের সভ্যতার দর-দালান থেকে সেইসব অস্পষ্ট, অসংবদ্ধ সংস্কার, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করা চলে না। সেইসব অসংবদ্ধ ধর্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানকে নিয়ে যেসব লোক-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি আমাদের কাছে তাই উপেক্ষণীয় নয়। সভ্য সমাজের অগোচরে অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ধর্ম, সংস্কার এবং লোক-সাহিত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ[১] এইসব অনগ্রসর শ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্পকলাকে উপেক্ষা না করে বলছেন ঃ

"···দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়; ভদ্র সমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম প্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য—কিন্তু ওরা ছোট লোক।

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাব প্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা

আকারে এখনো আছে—কিন্তু ওরা ছোটোলোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমনকি সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়তো এ সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের স্মৃতি ব'লেই গণ্য করি নে, কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ও যুক্তিকে অনুধাবন করে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল দেশের প্রাচীন ও যুগবাহিত মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে লোক-সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি সংগ্রহ করা। মেলা ও উৎসবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লোককবি ও শিল্পীগণ সমবেত হয়। সেখানে ভাব প্রকাশের কোন কৃত্রিমতা থাকে না। আশুতোষ ভট্টাচার্য[10] ১৩৬৮ সালে পুরুলিয়া জেলায় লোক-সাহিত্যের উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলার সংস্কৃতির একটি লুপ্তপ্রায় সম্পদের সন্ধান পান। ইহা ছো নামে পরিচিত এবং লৌকিক নৃত্যনাট্য। শ্রীভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"···মুখোসের ব্যবহার ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং লৌকিক রামায়ণ মহাভারত পুরাণ—ইহার বিষয়বস্তু।···এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত যুক্ত আছে, তাহা লোকসঙ্গীত এবং যে পুরাণ কাহিনী আছে, তাহাতেও লৌকিক রূপ প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং ইহা লোক-সাহিত্য অনুশীলনেরই একটি অঙ্গ···।" সেইজন্যে আমাদের মনে হয় যে বাংলার মেলা ও উৎসব হল বাংলার শিল্প সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যের চর্চা, অনুশীলন ও প্রচারের সজীব প্রাণকেন্দ্র। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে নিরক্ষর নরনারীর সমাজে লোকশিক্ষার বিস্তার হয়। সাক্ষরহীন মানুষদের কাছে লোক-সাহিত্যের মাধ্যমে আনন্দ ও শিক্ষা বিতরণ করা এবং জনতাকে সমমনোভাবাপন্ন করে তোলাও মেলা ও উৎসবের আর এক প্রধান কাজ। তাই মেলা ও উৎসবের সম্যক পরিচয় তুলে ধরার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের অসংখ্য মেলা ও উৎসবের মধ্য থেকে আমরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি মেলা ও উৎসবের পরিচয় প্রদান এবং শ্রেণী ভাগের পূর্বে মেলা ও উৎসবের যে ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার কিছু অবকাশ আছে।

মেলা ও উৎসবের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি দিক আছে। এর মধ্যে প্রথমতঃ মেলা ও উৎসবের পালনীয় আচরণীয় এবং অনুষ্ঠেয় রীতি-নীতি। এই রীতি-নীতিগুলি হল মেলা ও উৎসবের ক্রিয়াচার ও সংস্কার। দ্বিতীয় ধারায় আছে মেলা এবং উৎসবের পঠনীয়, শ্রবণীয় ও গেয় সম্পদ। যা হল লোক-সাহিত্য। এই লোক-সাহিত্য মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গীত পঠিত এবং প্রচারিত হয়। মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করে জনতার মাঝখানে লোক-সাহিত্য পরিবেশিত হয়। তৃতীয়তঃ উৎসব ও মেলার যা কিছু দর্শনীয় এবং প্রদর্শনীয় সামগ্রী তা হল মেলা ও উৎসবের শিল্প-সংস্কৃতির দিক। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবের একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ও দৈনন্দিন

জীবনের ব্যবহারিক সামগ্রী ও পণ্যসম্ভার মেলা ও উৎসবে বিক্রয়ের জন্য জড়ো করা হয়। তাই এখানে এসে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করে। মেলা ও উৎসবকে ঘিরে হাট-বাজার বসে। গ্রামের জনসাধারণ ও অনুন্নত সমাজের নরনারীরা মেলা ও উৎসবে এসে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র সংগ্রহ করে। দেশের কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি মেলা ও উৎসবের হাটে বিক্রয় হয়। এমনকি উড়িষ্যার মৃৎশিল্প পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ এইভাবে মেলা ও উৎসব উপলক্ষে সুদৃঢ় হয়। এটা হল মেলা ও উৎসবের একটা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক। বাংলার মেলা ও উৎসবের শ্রেণীগত পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা মোটামুটি ভাবে মেলা ও উৎসবকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছি। মেলা ও উৎসবের এই শ্রেণী ভাগের ভিত্তিতে আমরা এখানে বিশেষ কয়েকটি মেলা ও উৎসবের পরিচয় তুলে ধরে তাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। মেলা ও উৎসবের শ্রেণীগত ভাগটি এইরূপ—

(ক) মানব-মানবীর স্মৃতিবিজড়িত মেলা ও উৎসব।
(খ) বাংলার গাজন-গম্ভীরা এবং ধর্মঠাকুরের পূজা ও উৎসব।
(গ) বাংলার আঞ্চলিক লোক-উৎসব ও গীতানুষ্ঠান।
(ঘ) বাংলার ব্রত উৎসব ও ব্রতানুষ্ঠান।

বাউল-বৈষ্ণবদের মেলা ও উৎসবের আলোচনা প্রসঙ্গে বাউল সাধনার কথাও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে। তাই বাউলের গান ও ধর্মসাধনাকে বাউল-বৈষ্ণবদের মেলার আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন না ক'রে বাউলধর্ম ও সাধনার কথাও এখানে বিচার করা হয়েছে।

(ক) ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানব-মানবীর স্মৃতি-বিজড়িত মেলা ও উৎসবের মধ্যে আমরা এখানে বিশেষ কয়েকটি মেলাকে আলোচনার অন্তর্গত করেছি। এর মধ্যে জয়দেব-কেন্দুবিল্বের মেলা, কাঁচরাপাড়ায় সতী-মার মেলা, দধিয়া-বৈরাগীতলার মেলা, শ্রীখণ্ডের মেলা ও রামকেলির মেলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাউল-বৈষ্ণবদের মেলা

কদমখণ্ডীর ঘাটে জয়দেব-কেন্দুবিল্বের মেলা (বীরভূম)

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এমন কতকগুলি মেলা হয় যেখানে বিশেষ করে বাউলদের সমাবেশ ঘটে। এই জাতীয় মেলাতে বাউল গানের আসর বসে। বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে বাউল-বৈরাগীরা এসে সমবেত হয় এইসব মেলাতে। একতারা, গুপীযন্ত্র সহযোগে তাঁরা মেলার আসরে বাউল গান পরিবেশন করে। নৃত্যযোগে এই বাউল গানের সুর শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের মনকে নাড়া দেয়। সাধারণ মানুষ বাউল গানের ভাব ও অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও তারা নিবিষ্ট চিত্তে

সেই সকল গানের সুর শুনে আনন্দ পায়। বাউল গানের সুরে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। তাই মনে হয় বাউল গানের অর্থ ও ভাব নয়, তার সুরই মানুষের মনকে টেনে রাখে। এই জাতীয় মেলাগুলির মাধ্যমে বাউলেরা সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ যেমন পায়, তেমনি মেলায় আগত মানুষেরাও সুযোগ লাভ করে মেলার মঞ্চে মুখোমুখি হয়ে বাউলদের গান শোনায়। সব থেকে বড়ো কথা হল যে এই মেলাগুলির মাধ্যমে বাউল গানের প্রচার যেমন ঘটে, তেমনি মেলার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই গানের যোগাযোগও স্থাপিত হয়। বাউলেরা মেলাতে এসে তাদের প্রাণের ঝুলি উজাড় করে গান গায়। গানগুলি সুরের ধারায় লোকের হৃদয়ে-মনে ছড়িয়ে যায়। এই সুরের জাদুমন্ত্রেই শ্রোতারা শিল্পীর সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। বাউলের মনের সঙ্গে আমাদের মন অভিন্ন ও একাত্মতা অনুভব করে। ধর্ম, তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বাউল গানের আধ্যাত্মিক সম্পদ না বুঝেও বাউল-মনের সঙ্গে সাধারণ মানব-মনের একটা অলিখিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেই যোগাযোগের আকর্ষণেই আবার মানুষ আসে বাউল-মেলায়—বাউলের গান শুনতে। বাউল গান প্রকৃতরূপে লোক-সাহিত্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু বাউল গানের মেলাগুলি যে বাউল গান প্রচারে একটি প্রাচীন লোক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ—যুগপরম্পরায় এই জাতীয় মেলাগুলি বেঁচে আছে বাউল গানের জন্যেই। এই সকল মেলাতে বাউল গানের আসরে কখনও কখনও বাউলেরা মুখে মুখে গান রচনা করে এবং সেই গান পরিবেশন করে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আনন্দ দেয়। বাউল গানের এই মৌখিক প্রচার মাধ্যম এই শ্রেণীর মেলাগুলিতেই সম্ভব হয়। মৌখিক প্রচারের যে এক অদম্য প্রাণশক্তি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মৌখিক প্রচার এবং এই জাতীয় মেলাকে মাধ্যম করে বাউল গান সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেঁচে থাকে। এই-খানেই বাউল মেলার সার্থকতা। বাউল গানের মৌখিক প্রচারের মধ্য দিয়েই ঐতিহ্য পরম্পরাগত বাউল-মেলাগুলির জনপ্রিয়তা গ্রামীণ লোক-সমাজে আজও অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে বলে আমাদের মনে হয়। জয়দেব কেঁদুলীর মেলা এই জাতীয় একটি প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন বাউল-মেলা। যদিও এই প্রাচীন মেলাটি 'গীতগোবিন্দে'র কবি জয়দেব গোস্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতি বছর বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বাউল গানের প্রচার এবং বাউলদের সমাগমই এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সভায় সেযুগের বিখ্যাত কবি পঞ্চকের সমাবেশ হয়েছিল। এই কবি পঞ্চক হলেন, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ এবং জয়দেব গোস্বামী। কবি জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভায় সভাকবি ছিলেন ১১৮০ সালে। একথা স্বীকার করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।[১১] গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রণেতা কবি জয়দেব গীতিনাট্যের আকারে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক চব্বিশটি

গান রচনা করে তৎকালীন বঙ্গে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী কালে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করে শুধু অনুপ্রেরণা লাভ করেন নি, তাঁরা কবি জয়দেবের নিকট অনেকাংশে ঋণী ছিলেন। বীরভূমের প্রধান শহর সিউড়ী থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণে অজয়ের ধারে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গ্রামে জয়দেবের নিবাস ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই গ্রামের নাম কেঁদুলী বা জয়দেব-কেঁদুলী নামে খ্যাত। বহুকাল থেকে এই স্থানে অজয়ের ধারে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে এক বিরাট মেলা বসে। এই মেলা জয়দেব-কেঁদুলীর মেলা নামে পরিচিত। দেশের দূরদূরান্ত থেকে সাধু-সন্ত, ফকির, বাউল ও বৈষ্ণবদের সমাগম ঘটে এই মেলাতে। মেলাতে বাউল গানের আসর বসে আখড়ায় আখড়ায়। দেশের দূরতম স্থান থেকে মানুষেরা সমবেত হয়। জয়দেবের জীবনী থেকে জানা যায় যে জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী এবং স্ত্রীর নাম হল পদ্মাবতী। সঙ্গীত কলারসিক কবি জয়দেব ও নৃত্যপটিয়সী পদ্মাবতীর সম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দীনেশচন্দ্র সেনের[১২] আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পদ্মাবতী লক্ষ্মণ সেনের সভায় নৃত্য করতেন এবং "সেবাদাসী" রূপে তিনি কবি জয়দেবের সঙ্গিনী ছিলেন। পদ্মাবতী পুরীর মন্দিরে সমর্পিতা হয়েছিলেন। "পদ্মাবতী চরণ চারণ" পদেও এইরূপ দৃষ্ট হয় যে পদ্মাবতী নৃত্য করতেন এবং জয়দেব সেই নৃত্যের তাল রক্ষা করতেন। সুকুমার সেনের আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে কবি জয়দেবের স্ত্রী প্রথম জীবনে 'দেবদাসী নটী' ছিলেন। কবির কাব্য গীতগোবিন্দ গাইবার জন্যে জয়দেবের দল ছিল। সেই দলে পদ্মাবতী নাচতেন ও গাইতেন আর জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন কিংবা দোহারের কাজ করতেন। (সুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। পৃ. ৪৭-৪৭ দ্রষ্টব্য)…বীরভূম-বিবরণ…[১৩] গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে দক্ষিণ দেশে এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন অপুত্রক। অবশেষে তাঁরা পুরীধামে এসে জগন্নাথ দেবের কাছে নিবেদন করলেন যে তাঁদের পুত্র অথবা কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে সেবক কিংবা সেবিকা রূপে প্রভুর চরণে তাকে দান করবেন। কিছুকাল পরে পদ্মাবতী নাম্নী তাঁদের এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হল। স্বপ্নে তাঁরা জগন্নাথদেবের আদেশ পেলেন যে কেন্দুবিল্বে জয়দেব গোস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, সেই ব্রাহ্মণকে সমর্পিতা কন্যা দান কর। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-দম্পতি কেন্দুবিল্বে এসে জয়দেবকে সেই কন্যা সম্প্রদান করলেন।

এই গ্রন্থে আরও উল্লিখিত আছে যে বহু ক্লেশ স্বীকার করে জয়দেব নিত্য গঙ্গা স্নানে যেতেন। একদিন গঙ্গা দেবীর আদেশ হল যে গঙ্গাদেবী কবির জন্যে প্রত্যহ অজয়ে গিয়ে উপস্থিত হবেন। বছরের মধ্যে তিনদিন গঙ্গাদেবী অজয়ের জলে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবেন। জয়দেবের বিশ্বাসের জন্য পরবর্তী পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন অজয়ের জল থেকে গঙ্গা দেবী নিজ শঙ্খ বলয়িত

বাহু দুটি দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সেইমত পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গাদেবী তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। সেই সময় কবি কদমখণ্ডীর ঘাটে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেন। কিন্তু মহাশ্মশান কদমখণ্ডীর ঘাটে ব্রাহ্মণগণ ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। উপরন্তু অন্ন ব্যঞ্জনাদি ঐখানেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। নিরুপায় জয়দেব প্রভূত অন্ন ব্যঞ্জনাদি কদমখণ্ডীর ঘাটেই প্রোথিত করে রাখলেন। পরবর্তী পৌষ-সংক্রান্তির মহোৎসবে যোগদানের জন্যে ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দকে জয়দেব নিমন্ত্রণ করলেন। অজয়ের জলে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হবেন। তাই সেখানে অগণিত মানুষ এল। নরনারীর মনস্কামনা সিদ্ধ হল।

"হেন কালে দুই বাহু শঙ্খ-উত্তোলন।
কদম্ব খণ্ডীর ঘাটে দিলা দরশন।"[১৪]

প্রবাদ আছে যে নিজকৃত ভুল বুঝতে পেরে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ জয়দেবের নিকট গিয়ে প্রসাদ ভিক্ষা করলে জয়দেব বিগত বছরের মৃত্তিকা-প্রোথিত ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। মহোৎসবের শেষ দিন অন্ন-ব্যঞ্জন পুঁতে রাখার প্রথা সেই দিন থেকে আজও প্রচলিত আছে। গীত-গোবিন্দের কবি জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বদিন থেকে মেলা বসে। কবি জয়দেবের স্মৃতি-বিজড়িত এই মেলায় বাউলের সমাগম ঘটে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রধানত তিন দিন মেলা থাকে। তারপর ভাঙা মেলা আরও দু-চারদিন থাকে। মেলার প্রথম দিন অজয়ের জলে পুণ্য স্নান ও মন্ত্র পাঠ হয়। এয়ো স্ত্রীলোকেরা স্নানের পর সাবিত্রী-সত্যবানের কাছে পূজো নিবেদন করে। সাবিত্রী দেবীকে সিঁদুর দান করে। বিস্তৃত মেলা ক্ষেত্রে একাধিক আখড়া ও বিভিন্ন সাধকগণের সাধন-পীঠ আছে। মেলা উপলক্ষে এইসব আখড়ায় কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। ভক্তবৃন্দ এবং মেলায় আগত পুণ্যার্থীরাও এখানে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে। এইসব সাধন-পীঠের মধ্যে কাঙ্গাল ক্ষ্যাপার সাধন-পীঠ, মনোহর ক্ষ্যাপার সাধন-পীঠ উল্লেখযোগ্য। সাময়িকভাবে বাঁধা সামিয়ানার নিচে এইসব আখড়ায় ধর্মালোচনা ও বাউল গান প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। নদীর এক ধারে শ্মশান। অজয় নদের উত্তর তীর বরাবর বিস্তৃত স্থানে মেলা বসে। মেলাতে পণ্য-দ্রব্যাদির সাথে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ও দৈনন্দিন কাজের ও ঘর-গৃহস্থালির দ্রব্য-সামগ্রী ব্যাপক আকারে কেনা-বেচা হয়। এ ছাড়া থাকে আমোদ-প্রমোদের জন্য নানা আয়োজন। সন্ধ্যার পর বৃক্ষতলায়, ছোট ছোট কুটিরে, বাউলদের জটলা দেখা যায়। সামিয়ানার নিচে আখড়ায় আখড়ায় জনসমাবেশে বাউল গানের আসর বসে। আবার বৃক্ষতলায় বা ছোট কুটিরে বাউলেরা অল্প লোকের সমাবেশেও গান শোনায়। গানের ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে বাউলেরা তাদের গানের সঙ্গে নৃত্য জুড়ে দেয়। সে নৃত্যে দেহের দোলন-ই বেশি। গানের ভাব নৃত্যের চপলতায় প্রকাশিত হয়। এই নৃত্যযুক্ত বাউল গান শ্রোতার কাছে এক বাড়তি আকর্ষণ রূপে

দেখা দেয়। বাউল গান ও নৃত্যকে যুগ্মভাবে শ্রোতা উপভোগ করে। নৃত্য ও গান দুই যুগ্ম সম্পদ শ্রোতার চিত্তে রস সঞ্চার করে। তাই মেলার মানুষেরা তদ্গত চিত্তে বাউল গান শ্রবণ করে। সাধনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরুবাদ এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক নানা শ্রেণীর বাউল গান মেলার আসরে শোনা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে যাঁর স্মৃতি বিজড়িত এই মেলা এবং যাঁর নামাঙ্কিত ভিটেয় এই মেলার আয়োজন সেই জয়দেব সম্পর্কে এখানে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। জয়দেবকে নেপথ্যে রেখে জয়দেব-কেঁদুলীর মেলা মুখ্যতঃ বাউল গানের মেলায় পরিণত হয়। তাই আমাদের মনে হয় জয়দেব-কেঁদুলীর মেলা—বাউলের মেলা, তথা বাউল গানের মেলা।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বাউল-বৈষ্ণবদের আরও অনেক মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু জয়দেব-কেঁদুলীর মেলাতে বাউল গানের আসর বসে ব্যাপক আকারে। ছোটবড় আখড়ায় আখড়ায় সারারাত ধরে চলে বাউল গান। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত্রে অজয়ের কূলে বাউলের গান এক মায়াময় রহস্যের সৃষ্টি করে। সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আজ সেই প্রাচীন ঐতিহ্যটি জীর্ণ ও বিবর্ণ। তবু বাউল গানের আসরে অবলীলাক্রমে আজও সাধারণ মানুষ এসে সমবেত হয়। বাউলের সাধন-রহস্য ও ধর্মতত্ত্বের কথা গানের মধ্যে প্রচারিত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্জ্ঞেয়। তবু তারা শোনে। বাউল গানের অমৃত সুধা পান করে আকণ্ঠ ভরে। বাউল-বৈষ্ণবদের আরও কিছু মেলার পরিচয় দেবার আগে বাউলের ধর্ম ও সাধনার কথা, বাউল গানের কথা আলোচনা করে নিলে আশা করি বাউল-মেলাগুলির মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে। কারণ আমরা জানি যে বাউলের গানই হল বাউল সাধনার উৎস। সেই উৎসের আড়ালে বাউল সাধন রহস্যের যে দীপশিখা দীপ্যমান তার উত্তাপ ও রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় বাউল গানের ভিতর থেকে। তাই বাউল ধর্ম-সাধনার কথা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জয়দেবের মেলা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি বাউল গানেরও অবতারণা করা হয়েছে।

বাউল গান এবং বাউলের ধর্ম ও সাধনা

বাউল ও বাউলদের ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণ বহু সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর[১৫] আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাউল-অর্থ হল বায়ুগ্রস্ত কিংবা পাগল। বাউলেরা মনে করে যে সামাজিক হিসেবে তারা মৃত হয়ে আছে। অর্থাৎ 'জীয়ন্তে মরা'। বাউলদের কাছে এই 'জ্যান্তে মরা' সাধনার আর একটি অঙ্গ। তাই বাউলদের কাছে কোন সামাজিক দাবি আদায় করা চলে না।

কারণ বাউলেরা বিশ্বাস করে যে মহান দেবতা এই মানবদেহ-ভুবনের মধ্যেই বিরাজিত। যিনি চিন্ময় এবং বিশ্বদেবতা। এইজন্যে বাউলেরা মনে করে যে 'যা আছে ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে'।[১৬] বলা বাহুল্য যে এই ভাণ্ডই

মানবদেহ। সেই মানবদেহের ভেতরে আছে মন। বাউলেরা সেই মনকে শুদ্ধ করতে চায়। বাহ্য আচার-বিচারে তাদের কোন আস্থা বা বিশ্বাস নেই।

"...যিনি মনকে সাধন করিয়াছেন, অন্তরেই তাঁহার শিখা, অন্তরেই তাঁহার উপবীত।

অথাস্য পুরুষ স্যান্তঃ শিখোপবীতিত্বম"[১৭]

তাই বাউলেরা মানুষকেই ভালবাসে। পৃথিবীর এই প্রেম ভালবাসাই তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত। মানবদেহ ভুবন রাজ্যই তাদের কাছে স্বর্গসুখাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। সেইজন্য বাউলেরা বিশ্বাস করে যে মুক্তি হল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ।[১৮]

'বাউল'-শব্দটি সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত[১৯] অনুমান করেছেন যে এই শব্দটি 'বাউর' হিন্দী শব্দের বানানের এক বিকৃত রূপ হিসেবেও বাংলায় আসতে পারে। সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকেও বাউল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। এই 'বাতুল' হল যারা বায়ুরোগগ্রস্ত উন্মত্ত অথবা পাগল ব্যক্তি। বেয়াকুল (vyakula) শব্দটির সঙ্গে বাউল শব্দটির আধুনিক ভাবনাগত একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'বেয়াকুল' শব্দটির মধ্যে অধীর আগ্রহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। পরমার্থকে লাভ করার জন্যই তাদের চিত্তে উৎফুল্লজনিত এক তীব্র ঔৎসুক্যের প্রকাশ ঘটে। তাই সেই পরমার্থকে লাভ করার জন্যে তারা এক আধ্যাত্মিক জীবনের পথকে বেছে নেয়। এই পরমার্থই বাউলদের কাছে মনের মানুষ ('Man of the heart')। শ্রীদাশগুপ্ত বাউল শব্দের উৎপত্তির কারণ হিসেবে 'আউল' এবং আরবী 'আউলিয়া' শব্দের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে আউল ও বাউল সমজাতীয় শব্দ এবং 'আউল' শব্দটি আরবী আউলিয়ার সহযোগী শব্দ। 'আউলিয়া' (Awalia) শব্দটি 'ওয়ালী' শব্দের বহুবচনের রূপ। প্রকৃতরূপে যার অর্থ হল 'নিকট জন', বন্ধু কিংবা ভক্ত। এই আউলিয়া সম্প্রদায়রা হল প্রকৃতরূপে সত্যনিষ্ঠ মানুষ। এ ছাড়া গ্রন্থকার 'বাউল' শব্দ সম্পর্কে আর একটি মতের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকারের এই মতটি হল—যে ব্যক্তি সকল সামাজিক রীতি-নীতি ও দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে সে এক অর্থে 'দিওয়ানা' বা পাগল। শ্রীদাশগুপ্ত অনুমান করেছেন যে—সুফী শব্দ এই 'দিওয়ানা'র সঙ্গে বাংলা বাউল শব্দটির তুলনা করা যেতে পারে।

এই সকল অনুমান থেকে মনে হয় যে সংস্কৃত 'বাতুল' (উন্মাদ) শব্দটি প্রাকৃতের রূপ নিয়ে 'বাউল' শব্দ রূপে বাংলাভাষায় প্রচলিত হয়েছে। এই বাউল বা বাতুল ব্যক্তিও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা আচার-অনুষ্ঠান, বেশভূষা এবং কথাবার্তা, ভাবভঙ্গীর মধ্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবহার ও লোকাচারকে যেন প্রতিনিয়তই এড়িয়ে চলে। সে নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার আত্মসমাহিত ভাবটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সে ক্ষিপ্ত বা 'ক্ষেপা' কিন্তু আত্মমগ্ন ও উদাসীন। বাউলেরা সাধারণ সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি। বাউলদের আচরণ সাধারণ

মানুষের মত নয়। সমাজে এরা উন্মাদ বা বাতুল বলেই পরিচিত।

শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে বাউলের সমার্থ শব্দ হল আউল। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[২০] বলছেন ঃ

"বাউলের সমার্থ বোধক আর একটি শব্দ 'আউল'। বর্তমানে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর মুসলমান সাধককে 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলা হয়। ইহার মূলও মনে হয় সংস্কৃত 'আকুল' শব্দ। ইহা 'আকুল' শব্দেরই প্রাকৃত রূপ। 'আকুল' শব্দটি 'আবেগ-চঞ্চল', 'আলুথালু', 'বে-সামাল' 'অস্বাভাবিক মনোভাব সম্পন্ন' প্রভৃতি ভাবের দ্যোতনা করে এবং এক প্রকার 'বাতুল' (বাউল)-এরই সমার্থ বোধক⋯।" এই অনুমানকে সত্য বলে ধরে নিলে মনে হয় 'আকুল' বা 'বেয়াকুল' শব্দটির সঙ্গে 'বাউল' শব্দটির তাৎপর্যটি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। কারণ বাউলের প্রকৃতির মধ্যে ব্যাকুলতা বা আকুলতা থাকে। বাউলও এক অর্থে 'আবেগ-চঞ্চল', 'আলুথালু', 'বে-সামাল' এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ও সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ বহির্ভূত অস্বাভাবিক মনোভাব সম্পন্ন এক ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি। একটি গানে আছে ঃ

"আঁট ভাব অন্তরে রাখে
বাইরে সে উড়ন-পেকে,
বুঁদ হয়ে বসে থাকে সে আপন স্বভাবেতে ॥
(ও সে) কভু হাসে, কভু কাঁদে,
কভু নাচে কভু যাচে,
সদা সমান ভাব তার শুচি-অশুচিতে ॥⋯"[২১]

বাউলদের এই সাধনাকে 'উল্টা সাধনা' বলা হয়েছে। এই সাধনার পথ হল উল্টা পথ। এই সাধনার দুটি ধারা। একটি ধারা হল বাউলদের সাধনার নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। অন্যটি হল প্রেমকে স্বীয় চেতনায় উপলব্ধি করা। এই প্রেম বা পরমানন্দকে উপলব্ধি করাই বাউলদের প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেই পরম পুরুষকে চিনে বার করা। যে পরম পুরুষ নিজের আত্মার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাউলের সাধনায় যোগমূলক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপাদানগুলিও অপ্রধান নয়। প্রেমের উপাদান এবং যোগমূলক ক্রিয়া বিষয়ক উপাদান একে অপরের সঙ্গে গভীর ভাবে অন্বিত। এই যোগমূলক ক্রিয়া ও উপাদান চারিচন্দ্রের সাধনার অন্তর্গত। এই 'চারিচন্দ্র' হল শুক্র, রজঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র। এটাই বাউলের যোগ সাধনা। ধর্মপ্রাণ বাউলেরা নিজেদের শোধিত ও একাগ্র চিত্ত করে তোলে যোগ ক্রিয়ার বিভিন্ন পন্থার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পরম পুরুষ বা মনের মানুষকে (Man of the heart) অনুসন্ধান করাই হল বাউলদের প্রেমের ধর্ম। মনের মানুষ বাউলদের কাছে কখনও কখনও 'অচিনপাখি'। সারা জীবন ধরে বাউলেরা নিজের দেহের পিঞ্জরের ভেতরে এই অচিন পাখির অনুসন্ধান করে। যে অচিন পাখি দেহের খাঁচায় রহস্যজনক ভাবে যাওয়া আসা করে। বাউলেরা তাদের গানের মধ্যে এই ভাবকেই অভিব্যক্ত করেছে। তাই বাউলেরা নিজ দেহকে সম্যকভাবে চেনবার

চেষ্টা করেছে। কারণ দেহের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারলেই বিশ্বরূপের স্বরূপকে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এই স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে বাউলেরা যোগ সাধনার পথ অতিবাহিত করে। পালন করে যোগমূলক ক্রিয়া প্রক্রিয়া। এই যোগমূলক ক্রিয়া সাধন পদ্ধতি হল বাউলদের গুহ্য সাধনা। এই গুহ্য সাধনার দ্বারা বাউলেরা একটা সাধক জীবন পালন করে। এরই পাশাপাশি তাদের একটা ব্যবহারিক জীবনও আছে। এই সাধক জীবন ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[২২] বাউলদের দুটি জীবনের কথা বলেছেন। একটি হল বাউলদের বহির্জীবন অন্যটি অন্তর্জীবন।

এখন প্রশ্ন আসে বাউলদের সেই গুহ্য সাধনাটি কি? বাউলেরা তাদের যে সাধনাকে নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় তা হল প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের আস্বাদনের মধ্য দিয়ে আত্মজ আনন্দের স্বরূপকে উপলব্ধি করা। এই গুহ্য সাধনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[২৩] বলেছেন যে যৌন সুখকে যোগ-পদ্ধতিতে নিজ আয়ত্তে এনে তাকে অতীন্দ্রিয় আনন্দে পরিণত করাই হল সহজিয়া সাধন পদ্ধতির গূঢ় রহস্য। এই পদ্ধতির দ্বারা দেহ ও মন উভয়েরই বল বৃদ্ধি হয়। ইতিপূর্বে আমরা যে চারিচন্দ্রের আলোচনা করেছি, সেই চারিচন্দ্র ভেদের দ্বারাই বাউল সাধকগণ পরীক্ষা করে যে দেহের জড়ত্ব নাশ হয়ে সেই অসিদ্ধ দেহ, সিদ্ধ বা অপ্রাকৃত দেহে পরিণত হচ্ছে কিনা। আর এটা দেখাই হল বাউল সাধকদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্যেই 'চারিচন্দ্র ভেদ' একান্ত প্রয়োজন বলে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন। এই চরিচন্দ্র ভেদের দ্বারাই বাউলদের অসিদ্ধ জীবন সিদ্ধজীবনে পরিণত হয়। প্রাকৃত জীবন থেকে অপ্রাকৃত জীবনে ঘটে উত্তরণ। সাধনার পথে তাই প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু প্রাকৃত প্রেম থেকে অপ্রাকৃত প্রেমকে লাভ করার পরে আর প্রকৃতি সেবার প্রয়োজন হয় না। আত্মোদ্ভূত প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই তখন সাধকের আনন্দ। এই প্রেমের স্বরূপ যে তার দেহের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধক তাকে এতদিনে উদ্ভাবন করল। প্রকৃতি-পুরুষ সংসর্গেই সাধক তার দেহ থেকে লাভ করল এক 'সিদ্ধ' বা 'পক্ক' জীবন। এইখানেই তার সত্যকারের আত্মোপলব্ধি। যথা—

"বাউলদের প্রেম প্রকৃতি পুরুষ মিলনাত্মক, প্রাকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ হইতে উদ্ভূত দেহের ঊর্ধ্বগত এক আত্মবিস্মৃতময় অনুভূতি। ইহা একান্ত মানবিক। দেহের বাহিরে বাউলদের কোনো সাধনা নাই। তাহারা অনুমান মানে না। তাহাদের সমস্তই 'বর্তমান'। এই স্থূল মানব দেহকে এত অমূল্য সম্পদ বলিয়া আর কেহ মনে করেন নাই। দেহকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রেমলাভ করিতে হইবে। কাম হইতেই এই প্রেমের উদ্ভব। আমাদের বহু গানে এই কথার উল্লেখ, আভাস ও ইঙ্গিত আছে।"[২৪]

শশিভূষণ দাশগুপ্তের[২৫] মতে সুফী রহস্যবাদে মানবদেহকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র জগত বা ব্রহ্মাণ্ড রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র জগতে

সহজ সত্য অধিষ্ঠিত। সেই সত্যই হল পরম ও প্রকৃত সত্তা। সে হল আমাদের আত্মার স্বরূপ বা মানব প্রকৃতি। বাউলরাও এই ধর্মকে পল্লবিত করে তুলেছে। যথা—

"The mosque that is built in the hearts of the saints
Is the place of worship for all, for God dwells there."[২৬]

এই কায়া সাধনার কথা বা দেহ সম্পর্কিত গূঢ় তত্ত্ব সহজিয়া বাদীদের সাধন প্রণালীর মধ্যে গভীরভাবে নিহিত আছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন যে বৌদ্ধ সহজ পন্থীদের জীবনে ও ধর্মে এই কায়া সাধনা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কায়া সাধনার এই নিগূঢ় যোগ প্রণালীর দিক দিয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই কায়া সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত[২৭] বলছেন—

"...Again we have seen that in all schools of esoteric Yogic practice the body has been held to be the abode of all truth. The same view is equally emphasised in the vaisnava sahajiya school. It is said in a song ascribed to Candīdās that truth resides in the body.[২৮] It is said in the Ratan Sara that if one can realise the truth of the body (bhanda) one will be able to realise the truth of the universe (brahmananda)..."

এই আলোচনা ও অভিমত থেকে জানা গেল যে কায়া সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধন পদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ। সহজিয়া বাউলেরাও এই কায়া সাধনার কথা তাদের গানে নানাভাবে বলেছেন। তাই বাউলদের কথা হল—

"...যা আছে ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে, অথর্বেরও সেই একই কথা। এই মানব-দেহ দিনে-দিনে কমলের মত ফুটিয়া চলিয়াছে—

হৃদয় কমল চলছে গো ফুটে কত যুগ ধরি।

... ...

... ...

বাউলদের সেরা কথাই মৈত্রেয় উপনিষদে, দেহই তোমার দেবালয়। তাহাতে যে জীব তিনিই তো শিব—

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ"[২৯]

এই কায়া সাধনার মর্মভেদ করতে হলে পুরুষ-প্রকৃতি ও কামের উপাসনার কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। সহজিয়া বাউলেরা তাই ইন্দ্রিয়ের সাধনা করে। কিন্তু তারা ইন্দ্রিয়ের দাস নয়। তাই তারা কঠিন কঠোর যোগাভ্যাসের দ্বারা কামকে সাব্যস্ত করে দেহের অভ্যন্তর থেকে আনন্দ স্বরূপকে উন্নত করে তোলে। সেই পরম সত্যকে নিজ দেহের ভেতর থেকে চিনে নিয়ে বাউলেরা

তার স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টায় রত থাকে।

তাই এই দেহ, এই কাম থেকেই প্রেম ও আনন্দের উৎপত্তি। নরোত্তম দাস[৩০] বলছেন ঃ

"পুরুষ প্রকৃতি কামেতে উৎপত্তি
কামেতে সবার জন্ম
পশু পক্ষী সব কামেতে উদ্ভব
কামেতে সবার কর্ম।
কাম উপাসনা কাম সে সাধনা
কাম কেলী সব তন্ত্র
কামের মাধুরী শ্রীরূপ মঞ্জরী
কাম হরিনাম মন্ত্র—"

প্রাচীন মানুষদের জীবনচর্চার আবেগানুভূতি থেকে আমরা জানতে পারি যে—কামই ছিল সকল জিনিসের গোড়ার কথা। পূর্ণরত্ন[৩১] লোকায়তিকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন যে লোকায়তিকরা নির্বিচার মৈথুনে একত্রে সমবেত ও মিলিত হত। এই মিলনের মধ্যে প্রমত্তভাবটি বড়ো হয়ে উঠত। এমনকি প্রতি বছর বিশেষ একদিনে সকলে একত্র হয়ে ইচ্ছানুসারে স্ত্রীগণের সঙ্গে রমণে লিপ্ত হত। গুণ রত্ন এটাকেই লোকায়তিকদের রতি উৎসব বলে অভিহিত করেছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের[৩২] মতে লোকায়তিকদের ধারণাটি ছিল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকায়তিকরা ছিল ইহলোকবাদী। তারা মাটির পৃথিবীকেই সর্বস্ব মনে করত। কারণ লোকায়ত অর্থে বস্তুবাদ অথবা জনসাধারণের দর্শন এবং বস্তুবাদী দর্শন। এই ইহলোক সংক্রান্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে যারা পরলোক মানে না। আত্মা, ধর্ম, মোক্ষ যারা মানে না তারাই ছিল লোকায়তিক। তাদের মতে আত্মা মানে দেহ। এই পৃথিবীটাই তাদের কাছে সর্বস্ব। লোকায়তিকরা ছিল নাস্তিক এবং তারা কামকেই পুরুষার্থ মনে করে। জনসাধারণের মধ্যে এই দর্শন পরিব্যাপ্ত ছিল বলেই এই দর্শনের নামকরণ হয়েছে জনসাধারণের দর্শন। এদের এই দর্শনের গোড়ার কথা হল কাম বা দেহাত্মবাদ যা এক অর্থে বস্তুবাদ (materialism)।

আমাদের এত কথার বলার উদ্দেশ্য হল যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধারণার মধ্যেও এই দেহবাদ তথা কায়া সাধনার কথা সুস্পষ্ট। তাই সেই সহজ সাধনার কথা বলতে গিয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত[৩৩] বলছেন ঃ

"...the two aspects of Sahaja (i. e., Rasa and Rati) under the imagery of the seed and the Ovum and the cosmos as following from their union..."

বৈষ্ণব সহজিয়া মতাবলম্বী ও ধর্মাবলম্বীরা অনেকে সাধারণভাবে বাউল নামে পরিচিত হয়। এখন সহজিয়া বাউল ও তাদের সহজ সাধনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। বাউলদের সহজমত ও

সহজিয়া সাধনা গভীরভাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার কাছে ঋণী একথা শশিভূষণ দাশগুপ্ত[৩৪] মনে করেন। তাই বাউলদের সহজ-সাধনা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজ সাধনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাউলদের সহজিয়া সাধনার প্রাক্ পটভূমিটি বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সহজিয়ায় পরম সত্যকে প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে কৃষ্ণ ও রাধার প্রসঙ্গ এসেছে। কৃষ্ণ ও রাধাই হল তাদের কাছে চিরন্তন আনন্দ গ্রহণকারী এবং আনন্দ-রূপিণী। সমস্ত পুরুষের প্রতিনিধি কৃষ্ণ এবং রাধা সমস্ত রমণীকুলের। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে পুরুষ ও রমণীর মিলনকে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হিসেবে দেখা হয়। এইভাবে যুগে যুগে নরনারীর যুগল মিলনের মধ্য দিয়ে রাধ-কৃষ্ণের মিলন আস্বাদিত হয়ে আসছে। এটাই হল আরোপিত যুগল মিলন। এই আস্বাদনের মধ্যেই বৈষ্ণব সহজিয়াগণ আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে। এই শ্রেণীর বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়াগণই হল পূর্বতন সহজিয়া সম্প্রদায়।

বাউলদের সাধনা প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে উপেন্দ্রকুমার দাস বলছেন ঃ

"এঁদের সাধনা তান্ত্রিক সাধনা। এই সাধনায় সনাতন ধর্মীয় তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয়ের ধারা মিশেছে।...বাউলধর্মকে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনাংশের একটা বিশিষ্ট রূপ মনে করা হয়।"[৩৫]

সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কায়া সাধনার কথা আছে তেমনি শক্তি-সাধনাতেও দেহকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উপেন্দ্রকুমার দাস তাঁর 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা' শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থে শক্তিসাধনায় দেহের গৌরবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন ঃ

"শক্তিসাধনায় দেহের গৌরব বিশেষভাবে স্বীকৃত। শাক্তরা বলেন শরীর যদি না থাকে তাহলে কি দিয়ে পুরুষার্থ লাভ হবে। তা ছাড়া মানবদেহ বিচিত্র শক্তির আধার। শক্তি সাধনার অন্যতর লক্ষ্য এইসব শক্তিকে পূর্ণ বিকসিত করা।..."[৩৬]

"...স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ ভেদে জীবদেহ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ দেহেরই আধার কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনীই কেন্দ্রীয় কীলক (pivot) যার উপরে জীবের শারীরিক প্রাণিক এবং মানসিক শক্তি সমবায়ে জটিল দেহযন্ত্রটি আবর্তিত হয়। স্বরূপতঃ চিদ্‌রূপিণী কুণ্ডলিনীই দেহাবচ্ছিন্ন জীব। কাজেই দেহযন্ত্রটি তিনি এবং তাকে চালাচ্ছেনও তিনি।..."[৩৭]

পূর্বতন সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনায় কায়াসাধনার কথা বলা হয়েছে। যারা মনে করত যে মানবদেহই হলো এই বিশ্বজগতেরই অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র জগৎ বা ক্ষুদ্র পৃথিবী। আবার এই ক্ষুদ্র পৃথিবী হলো বিশ্বজগতেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। মানবদেহের মধ্য থেকেই তারা সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে। কারণ তাদের মতে সত্য মানবদেহেতেই বিরাজমান, পরবর্তীকালে বাউল সহজিয়াগণ এই বিশ্বাসের অংশীদার হয়েছে। কারণ তারা মনে করে এই দেহ-ই হল ভাণ্ড এবং বিশ্বরূপ হল ব্রহ্মাণ্ড।

এখন এই সহজ মতটি কি ? সহজ মত হল তাদের কাছে এক চরম সত্তা (ultimate reality)। অথবা পরমানন্দময় প্রকৃত সত্তা যেটা বাউলেরা তাদের গানের মধ্যে প্রকাশ করেছে। যোগক্রিয়ার দ্বারা আপন পরমানন্দময় সত্তাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের মত বাউলেরাও সেই সহজ পথের অনুগামী হয়েছে।

এই সহজ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[৩৮] বলেছেন যে সহজিয়া অর্থে যা জন্মেছে কিংবা যা একটা কিছুর জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বললে এইরকম দাঁড়ায় যে এই জগতের সমস্ত প্রাণ এবং বস্তু সহজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। এইসব প্রাণবস্তু সহজ থেকেই সমুৎপন্ন এবং আবার সহজের মধ্যেই বিলীয়মান। অর্থাৎ সহজ থেকে এসে আবার সহজেই ফিরে যায়। উপনিষদে আছে—

"...Bliss is to be known as Brahman, and from bliss proceeds all the objects, and through bliss they live and in bliss do they return and merge..."[৩৯]

এই সহজই হল পূর্ণ প্রেমের রসানুভূতি যার মূল বা সার সর্বদেহে বিরাজমান। সহজিয়ারা কৃত্রিমতা ও আন্তরিকহীনতাকে পরিহার করে। সত্য এবং স্বাভাবিক পথ ও পন্থাকেই তারা বেশি পছন্দ করে। সহজিয়াগণের মত বাউলেরাও গুরুবাদে বিশ্বাসী। বাউল কবিদের সহজিয়া বলা হয় এই কারণে যে তারা পরমানন্দময় প্রকৃত সত্তাকে সহজভাবে উপলব্ধি করে। এই মতের সমর্থনকারী শশিভূষণ দাশগুপ্ত[৪০] বলেছেন যে বাউলেরাই প্রকৃতরূপে সহজিয়া আন্দোলনের অকৃত্রিম অনুসরণকারী। এইসব অনুসরণকারী সহজিয়া সম্প্রদায় নানা ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। কর্তাভজা
২। বাউল
৩। বৈষ্ণব
৪। শৈব
৫। কিশোরীভজা
৬। পরকীয়া সাধনা—

এই বিভাজনের কথা বলতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[৪১] সহজিয়াবাদের মধ্যে নারীর প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছেন। সহজিয়াদের আর একটা বিশ্বাস হল যে সাধনার একটা বিশেষ পর্যায়ে পুরুষের 'নারীভাবে' পর্যবসিত হওয়া চাই। নারীত্বের অনুভূতি ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের অভিজ্ঞতা ও আস্বাদন লাভ সম্ভবপর হয় না।

"পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে ॥"

কিংবা

"স্বভাব প্রকৃতি হইলে তবে রাগ রতি ।।..."[৪২]

সহজিয়াদের এই সহজ-ই বাউলদের কাছে অন্তরঙ্গ ঈশ্বরে পরিণত হয়েছে। সেই ঈশ্বর তাদের আপন মনের বাসিন্দা। সেই সহজের সঙ্গেই বাউলদের প্রত্যক্ষ প্রেম। পরমার্থের মত বাউলদের গানে সেই অন্তরঙ্গ ঈশ্বরই আবার মনের মানুষে পর্যবসিত (Man of the heart)। বাউলেরা সেই মনের মানুষের সঙ্গে প্রেমের আদান প্রদান করে। তার সঙ্গে বাউলেরা মনের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। সেই অন্তরঙ্গ ঈশ্বর বা মনের মানুষের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার দ্বারা একাত্ম হওয়ার ভাবনার ভিতর থেকেই বাউলেরা সহজের স্বরূপ কিংবা পরমাত্মার স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। তাই বাউলদের ধর্ম আত্মোপলব্ধির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাউলদের এই আত্মোপলব্ধি ঘটে প্রেমের মধ্য দিয়ে। সেই প্রেম হল—

"...between our human personality and the Divine personality —residing in the human as the true self..."[৪৩]

এই আত্মপ্রেম মানুষের ভেতর দিয়েই স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হয়েছে। বাউল গানের দীপশিখায় বাউলের ধর্ম, দর্শন, সহজতত্ত্ব দীপ্ত হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে এই বাউল গান লোক জীবনকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে বাউল গানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন ঃ

"This striking feature of the songs of the Bauls attracted well known poets and composer of songs of the second half of the nineteenth century to compose poems in the pattern of the Baul songs, though, however, these poets and composers were not in any way attracted to the secret sexo-yogic practices of the Bauls. Even the well known Bengali lyric poet Bihari Lal Chakravarti of the second half of the nineteenth century was irresistably tempted to compose hundred songs in the pattern of the Baul Songs and he himself called these songs Baul Songs. Similarly, Harinath Mazumdar of the late nineteenth century composed many Baul Songs in a nom de plume."[৪৪]

বাউল গানের মধ্যে কোন গভীর তত্ত্ব ও দর্শন ছাড়াও আসে নানাবিধ প্রসঙ্গ। সাম্প্রতিককালে মেলার আসর থেকে সংগৃহীত এইসব গানগুলোর মধ্যে শ্রীরাধিকার বিরহ, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতির মত আরও অনেক জনপ্রিয় ও প্রাচীন বিষয়কে নিয়ে বাউল গান রচিত ও গীত হয়। একটি বাউল গানে শ্রীরাধিকার বিরহের কথা গভীর আবেগে উচ্চারিত—

"আমার সুখের নিশি দুঃখে গেল
এলো না বন্ধু শ্যামরায়

মন রে কই তোমায় সুখের নিশি
প্রভাত হয়ে যায়।
তমাল ডালে কালো কোকিল
কৃষ্ণ গুণ গায়
(তুই) আর ডাকিস নে কালো কোকিল
আয়রে আমার কোলে আয়
বলি বিছানায় কালো সাপ
দংশিছে আমায়…।”[৪৫]

অন্য একটি বাউল গানে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের কথা আছে ঃ

“রাই চাঁদে আর শ্যাম চাঁদে
মিলন হল আজ চাঁদে চাঁদেরে
চাঁদে চাঁদে জড়িবে কি বা
চরণে চরণ ছেঁদে
চাঁদের গলায় চাঁদের মালা
চাঁদের নূপুর পদে…।”[৪৬]

আর একটি বাউল গানে দেখি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস প্রসঙ্গ ঃ

“বহু দিনেব পুরান সখা
ভাল হল পেয়ে দেখা
আমারে ফেলিয়ে একা
নদে আসিলে
হাতে লয়ে দণ্ড
মাথায় প্রেমের ভাণ্ড
কৌপীন ধারণ করে
মাথা মুড়ালে…।”[৪৭]

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বর্তমান ছাত্রসমাজকে নিয়ে বাউল সুরে স্বভাব কবি মুকুন্দদাসের একটা গানও শোনা গিয়েছিল জয়দেব-কেন্দুবিল্বের মেলাতে ঃ

“মরেছে সব ছেলেরা
কলম পিষে
তারা বাঁচবে বলো আর কিসে ?
করেছে বি. এ. পাস
শিখেছে ছাই পাঁশ

কেটেছে ঘোড়ার ঘাস
কলেজে বসে…”

আবার চেনা-জানা জগতের ছবি নিয়ে আটপৌরে ভাষায় বাউল গানে দেহতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্বের পরিচয়-ও পাওয়া যায় ঃ

“আমি আর কতদিন থাকব হরি
জেলখানায় ভরা—
আমার হাতে বেড়ি
আছি যে দাঁড়ায়ে—
জজ কোর্ট করলাম, হাইকোর্ট করলাম
তবু নজর বন্দী হলাম
সেসন কোর্টে মঞ্জুর করলে মা
এবার মামলায় হেরে গেলাম।…”[৪৮]

অথবা ঃ “হরিভজন ভারি লেঠা
(হরি) গুরুর ভজন ভারি লেঠা
হরিভজন করবি যদি
সেচার জল মড়ক্ চাতে ওঠা
ঘরে চোরে করল চুরি
চাবি রইল আঁটা
সেই চোরকে যে ধরতে পারে
সেই তো বাপের বেটা।
নদাই গুড় গুড় বাবাজী বলে
নিজেকে দেখি মোটা
হরি ভজন ভারি লেঠা।…”[৪৯]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর “Obscure Religious cults”, গ্রন্থের প্রারম্ভিক ভূমিকায় বাউলদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম ও মতের অনুগামীরা বাউল নামে খ্যাত হলেও বাউল গানগুলি অশিক্ষিত জনসাধারণের দ্বারা রচিত। এরা হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। মনের মানুষ এবং মানুষের প্রতি ভালবাসাই হল এইসব গানের বৈশিষ্ট্য। গানের মধ্য দিয়ে বাউলেরা তাদের মনের মানুষকে ভালবেসেছে। সেই মনের মানুষই হল বাউলদের আপন ব্যক্তিসত্তার বাসিন্দা। আবার সেই মনের মানুষ বাউলদের কাছে এক অন্তরঙ্গ চির প্রেমিক। এই অন্তরঙ্গ চির প্রেমিকের সঙ্গেই তাদের প্রেমের আদান-প্রদান। এই প্রেমের জন্যেই বাউলেরা পাগল। তাই ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউল গানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বাউলরা তাদের গানে সেই মনের মানুষের সঙ্গে মেলবার আকুলতার কথাই বার বার প্রকাশ করেছে। বাউলরা তাঁদের গানে অনন্তের রহস্য বা অসীম জগতকে সীমার মধ্যে পাবার চেষ্টা করেছে। সেই জন্য বাউলদের কাছে এই পৃথিবী, মানুষ ও তার প্রেমই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদগুলিকে অবলম্বন করেই বাউল তার গান রচনা করেছে। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলছেন ঃ

"বাউলেরা স্বর্গের সুখ চাহেন না। চাহেন মুক্তির পরমানন্দ। বাউলেরা বলেন, মুক্তি হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ। এই মুক্তিলাভ করিলে ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য সাধক আপনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাউলেরা মানুষই জানেন। তাঁহাদের মতে স্বর্গের অমৃতের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর...।[৫০] আর মহত্তর হল তাদের মানসলোক। মানুষের যোগসাধনার উপযুক্ত স্থান হল এই মানসলোক। বাউলরা সেই মানসলোকের সাধনায় ব্যাপৃত থাকে। তারই অন্বেষণে বাউলরা সারাজীবন ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অথচ সেই মনের মানুষ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তারই আপন চিত্তলোকে। 'মানুষের ধর্ম'[৫১] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক নিরক্ষর-পাগল ভিখারী পথিকের মুখে শোনা কয়েকটি বাউল গানের উল্লেখ করেছেন—

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে,
হারায়ে সেই মনের মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

কিংবা— "তোর ভিতর অতল সাগর।"

অথবা— "মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ।"

বাউল তাই দেবতাকেই তার মনের মানুষে পর্যবসিত করেছে। সেই মনের মানুষকে নিয়েই বাউলরা বেশি গান গেয়েছে। যার আবাস স্থল হল মানুষের দেহ-মন্দির। এই মনের মানুষ বাউলের কাছে এক শাশ্বত অন্তরঙ্গ প্রেমিক। বাউল গানে একদিকে যেমন আছে সেই মনের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনার মহান দীর্ঘশ্বাস, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্যে এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বাউলের গানে আমরা আর একটি বিস্ময়কে খুঁজে পাই। বাউলদের কাছে একটি বড় বিস্ময়-বোধ হল তারা মনে করে যে এক অচিন বস্তু দেহধারী প্রেমিকের মধ্যে বসবাস করছে। বাউল সেই অচিন বস্তুকে নিজের শরীরের মধ্যে অহরহ উপলব্ধি করে। সে তাকে খেলায়, হাসায়, ভাবায় এবং ভালবাসায়। বাউল তাকে পরিত্যাগ করতে চাইলেও পরিত্যাগ করতে পারে না। কারণ দেহরূপী খাঁচার মধ্যে সে যেন এক অচিন পাখি। বাউলের

কাছে এটাই এক পরম বিস্ময় যে—সেই অচিন পাখি আসা-যাওয়ার লীলা খেলায় মত্ত রয়েছে। যে খেলার স্বরূপ হল ব্যক্তিরূপে প্রকাশ ও বিচরণ, তারপর খেলা শেষে পুনরায় আবার তার নিজের মধ্যেই ফিরে আসা। সেই অচিন পাখির অন্বেষণে বাউল সারা জীবন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সে তার নিজের খুব কাছেই আছে। তবু বাউলের সেই বিস্ময়াপন্ন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—

"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়..."[৫২]

এই সব বিষয় ও ভাব নিয়ে বাউল গান গায়। বাউল গানের মধ্যে নানা বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মনের মানুষ সম্পর্কিত, গুরুবাদের গান, অনিত্যতার গান, সাধন রহস্যের গান, রাধা-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান এবং হেঁয়ালী ও ধাঁধাঁ বিষয়ক তত্ত্ব গান। এই সব গান বাউলেরা মেলা ও উৎসবের মাঝখানে এসে প্রচার করে। মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করেই বাউলেরা তাদের এই গান সাধারণ মানুষকে শোনায়। এই গান-ই হল বাউলদের জীবনের সাধন-ভজন ও রাগ-অনুরাগের ভাষ্য। তারা তাদের এই গান দিয়েই জগত ও জীবনকে বাউলের ধর্ম বোঝাতে চায়। এই গানই বাউলদের ঈশ্বর পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

"...I have often tried to meet these people, and sought to understand them through their songs, which are their only form of worship..."[৫৩] উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে বাউল গানের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

"আমার লেখা যাঁরা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে এত সহজ হয়ে মিশে গেছে।"[৫৪]

তাই সহজ ভজনের পদ্ধতি ও তত্ত্বের আটপৌরে রূপের প্রয়োগ বাউল গানের অন্যতম সম্পদ। আর এই গানের ব্যাপক প্রচার ঘটে বিশেষ করে বাংলার বাউল মেলাগুলিতে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[৫৫] বলেছেন ঃ

"...বাউল গানের মধ্যেই এই সহজ-ভজনের পদ্ধতি ও ঐ তত্ত্বাংশেরই একটা বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশি পাওয়া যায়। বাউলদের তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে লিখিত বিশেষ কোনো সন্দর্ভ নাই, সাধন-পদ্ধতিরও স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ কোনো বিবরণ নাই। গানেই তাহাদের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও ক্রিয়া-পদ্ধতি ব্যক্ত হইয়াছে। গানই তাহাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।" এই কথার অনুসরণে বলা যায় যে বাউলের গান বাউল

সাধনার অমূল্য সম্পদ। বাউল গানের ভাষার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে সহজ ভজনের পদ্ধতি। বাউল গান-ই হল বাউলের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন ক্রিয়ার এক স্বচ্ছ দর্পণ। প্রচ্ছন্ন ভাব ও ভাষার অন্তরাল থেকে বাউল ধর্মের অপার মহিমা মেঘে ঢাকা সূর্যালোকের মত বিচ্ছুরিত হয়। সাধারণ মানুষ আলোর উৎসে পেঁছিতে পারে না বটে কিন্তু আলো দেখতে পায়। বাউল গানের আলোচনা প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাই বলছেন ঃ

"...বাংলার বাউল গানের ভিতরও যে সুগভীর তত্ত্ব এবং দর্শনের কথা আছে, তাহা বাদ দিলেও ইহার নৃত্য ও সঙ্গীত জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালীর মনে যে রস আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেই ইহার সাহিত্যিক পরিচয় প্রকাশ পায়। বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যার গানে যে তত্ত্বকথাই থাকুক, তাহা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্য দিয়াই রূপায়িত হইয়া থাকে। সুতরাং বাউলের তত্ত্ব না বুঝিয়াও বাউলের সঙ্গীতের মধ্য হইতে রসাস্বাদন করিতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় না।"[৫৬] এই জন্য আমাদের মনে হয়, মেলা ও উৎসবে বাউল গান শুনে যে গভীর আনন্দ-আস্বাদ লাভ করা যায়, তা সত্যই এক দুর্লভ সম্পদ। বাউল গান যেন প্রাত্যহিকের পৃথিবীতে এক একটি অমূল্য মণিহার। যা সৌন্দর্যে ও গভীর ভাবনার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। তাই মেলার আসরে বাউল গান শুনে সাধারণের মন বাউল-মন হতে চায়। জয়দেবের মেলা থেকে সংগৃহীত এমনই কিছু বাউল গান এই আলোচনার অবসরে এখানে নিবেদন করলাম। জয়দেব কেন্দুবিল্বের মেলায় গীত এই বাউল গানগুলির মধ্যে বাউলের সাধনা, ধর্ম, দর্শন, দেহতত্ত্ব, উল্টা সাধন-ভজন প্রভৃতি নানা বিষয়—আটপৌরে ভাষার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সাধনতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন মহিমায় গানগুলি সমৃদ্ধ। গীতসংখ্যা ৩, ৪, ৫, ৮, ১০ এবং ১১ নম্বরের বাউল গানগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গীতসংখ্যা (১)

এ মানুষ সে মানুষ আছে
মানুষ হয়ে মানুষ খুঁজতে হবে ॥
মানুষ দেবতা মানুষ ভূত
মানুষ জাতি কি অদ্ভুত
মানুষ সত্য মানুষ মিথ্যা—
মানুষ হয়ে মানুষ জানতে হবে ॥
খেপা মানুষে মানুষ আছে—
মানুষে মানুষ জানতে হবে ॥

মানুষ অনিত্য, মানুষ নিত্য
মানুষ পূজে মানুষ ভক্ত

দেখ এই মানুষে কি আসক্ত—
হরি দেবাদিদেব ইন্দ্র হবে ।।
আর মানুষ জন্মে মানুষ মরে
(আর) কেউ কি রে তা স্বীকার করে
গোঁসাই পূর্ণানন্দ কইলেন মনে
মানুষেই সাধন সিদ্ধ হবে ।।[৫৭]

বাউলেরা মানুষের মধ্যেই সত্যকে অন্বেষণ করেছেন। তাই তারা মানব ধর্মের পূজারী। পাপ-পুণ্য, সত্য, অসত্য এই মানব জীবনেই বর্তমান। কিন্তু চিরন্তন সত্যকেই বাউল খুঁজতে চেয়েছে মানব দেহের অভ্যন্তরে।

গীতসংখ্যা (২)

মানুষ আছে হুঁশেতে
আছে মানুষ মানুষেতে—
মানুষেতে মানুষ খেলে
মানুষে ছলিতে ।।

মানুষেতে মানুষ আছে
মানুষ নাচায় মানুষ নাচে
আবার মানুষ যায় রে মানুষের কাছে-
মানুষ হইতে ।।

* * * * * * * *
* * * * * * *
* * *

মানুষ ইতর মানুষ ভদ্র
আবার মানুষ নরক মানুষ শুদ্ধ
মানুষ মুক্ত মানুষ বদ্ধ
(এই) মানুষের মায়াতে ।।

* * * * * *
* * * *

যদি মানুষ হতে মানুষ খোঁজ
তবে মানুষে মানুষ ভজ,
নিত্য বলে নিত্য খোঁজ—
মানুষের চরণে ।।[৫৮]

গীতসংখ্যা (৩)

এসেছো বসেছো ভবে
তাস খেলিতে—
এক ব্রহ্ম টেকার মর্ম—
জেনে নাও মন আগেতে ॥

দুই রঙেতে হচ্ছে খেলা
চিনে নাও মন দুরির খেলা—
তিনরঙে তিরিখানা,—
চৌকা হয় চার ধামেতে ॥

পঞ্চ ভূতের পঞ্জাখানা
ছয় রিপুতে ছক্কাখানা
সাত সমুদ্র সাতাখানা—
খুঁজলে পাবে দেহেতে ॥

আট কুঠুরি চিনবে যখন
আটার মর্ম জানবি তখন
নব দ্বারের মায়াখানা—
চোদ্দ হয় তার রঙেতে ॥

দশেন্দ্রিয় দশাখানা
কাম গোলামে দিচ্ছে হানা
ইচ্ছাশক্তি কাবার কর—
কে পারে পিঠ লইতে ॥

গোলাম বিবি এল হাতে
জ্ঞান সাহেবকে দাওনা তাতে
ইস্তক বিন্তি হবে তাতে (হয় রে তাতে)—
ভুলনা কাবার করিতে ॥

জ্ঞানানন্দ কি করিলি
খেলতে এসে হেরে গেলি
চির দিন কি পড়ে রইলি—
পঞ্জাতে ছক্কাতে ॥[৫৯]

জীবন, সংসার আর মানবদেহ-ই হল বাউলের উপাস্য। তাস আর তাস খেলার মধ্যে দেহতত্ত্ব আর সাধন তত্ত্বের বিষয়টিকে নিয়ে বাউল এক গভীর দর্শনকে এই গানের মধ্যে তুলে ধরেছে।

গীতসংখ্যা (৪)

কত করবি আর বেচা কেনা—
দোকানী ভাই দোকান সারোনা ॥
ও তোর লাভের আশায়.
দিন কেটে গেল—
দোকানী সব মালমশলা
স্বজনে নিল—
ও তোর ঘরের মাঝে সিঁধ কেটেছে
ভোলা মন—
হায়রে মন তাও কি এবার দেখনা ॥
দোকানী ভাই দোকান সারোনা।"[৬০]

* * *
* * *

এই সংসার ও মনুষ্য জীবন অনিত্য। কিন্তু তবু মানুষকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য প্রলোভন, লোভ, কামনা, বাসনা ও লালসা। দোকান, দোকানী ও কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে বাউল শিল্পী এই গানে এক সুমহান সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছে। Earthly pleasures never exist but the infinite truth remains forever—

গীতসংখ্যা (৫)

(আরে) এমন উল্টা দেশ গো
গুরু কোন দেশে আছে,
আছে ঊর্ধ্ব দিকে গাছের গোড়া—
অধোদিকে ডাল মেলেছে ॥
আছে সেই দেশেতে কতই লোকের বাস
তাদের মুখে ফল-মূলাদি পান করে না
নাকে নাই নিঃশ্বাস ॥

* * * *
* * *

আছে সেই দেশেতে কতই নদনদী
ও তার ঊর্ধ্ব দিকে জলের স্রোত—
বহে নিরবধি ॥

* * * *

আবার সেই দেশেতে এক মরা বৃক্ষে
ফল ধরেছে ॥
এমন উল্টা দেশ গো…[৬১]

এই গানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাউলের সাধন রহস্য ও উল্টা সাধনার কথা।

গীতসংখ্যা (৬)

রজকিনী কথা ক'লো—
চণ্ডীদাস কয় রাছ ধরিল—
(ও) হায় রে মাছ ধরিল,
চণ্ডীদাস কয় এ দেশে আর রব না—
প্রেমের মরা জলে ডোবে না—
যেজন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সনে প্রেম চলে না,
প্রেমের মরা জলে ডোবে না ।।[৬২]

* * * * *
* * * *
* * *

রজকিনী আর চণ্ডীদাসের অমলিন প্রেমকে বন্দনা করেছে বাউল। প্রেম অবিনশ্বর। প্রেমের মৃত্যু নেই। তাই 'প্রেমের মরা জলে ডোবে না'…।

গীতসংখ্যা (৭)

শুধু মুখের কথায় গৌর মিলবে না
আগে না জানিলে গুরুর উপাসনা
যদি মুখের কথায় মিলত গৌর
তবে ভজন সাধন কেউ করত না।
দশেন্দ্রিয় বশ হবে
হিংসা নিন্দা তম যাবে—
তবে দেহ পবিত্র হবে—
তখন হৃদয় মাঝে দেখতে পাবে,
গৌর বরণ কাঁচা সোনা ।।
(আর) গৌর অনুরাগী যারা
হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা
তারা সর্বত্যাগী বিষয় ছাড়া
তা নইলে হবে না।[৬৩]

* * * * *
* * * *
* * *
* *

গীতসংখ্যা (৮)

আমি শুনতে চাই তোমার কাছে—
এমন মাটি ছাড়া বীজ বোনে কোন দেশে,
ও সেই ফুল ছাড়া হয় মূলের গতি—
মূল ছাড়া এক মানুষ আছে ॥
গুরু আমি শুনতে চাই তোমার কাছে ।[৬৪]

*   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *

গীতসংখ্যা (৯)

মন ফকিরা মনের কথা
আমার গুরু কি তা জানে রে—
রাজার ঘর চোর সেঁধিল পুকুরপাড়ে সিধ
জলের পরে বিছানা পেড়ে ডাঙ্গায় মারে নিদ ।

চিল বিয়ালো খালে রে
বিড়াল বিয়ালো ডালে—
ছাঁ পোনা সব ধরে খেল,
দাঁড়কোনা মাছে ।
বামুন পাড়ায় মড়া ম'ল
চাষার কাথায় হাল
রাজার ঘরে ছাওল হল
ভেটেলি খেল ঝাল ।

*   *   *   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *

সমুন্দুরেতে জল নাই
পাহাড়ে মারে ঢেউ,
যার বাবার কোলে মাগ নাই—
তার বেটার কোলে বউ ॥[৬৫]   *   *   *

*   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *

গীতসংখ্যা (১০)

চৈতন্য চাঁদের উদয়
যার হৃদয় আকাশে
সে যে ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড দেখে
দীপ্তাকার বসে
চেতনে হয় চৈতন্য
কোথায় তার উৎপন্ন
বলে গোঁসাই কর ধন্য
দুই তিথি এক যুগে আসে

* * * * * * *
* * * * * *
* * * *

চেতন গুরু মারে লাথি
আন্ধার ঘরে জ্বলছে বাতি
সেই চিনে পুরুষ-প্রকৃতি,
ভেবে অধীন ভবাভাসে ।।[৬৬]

গীতসংখ্যা (১১)

আত্ম তত্ত্ব জেনে আয়রে
আমার মন
সাধনের মূল সাধন—
জেনে আয়রে আমার মন ।।

জানতে পারলে দেহের স্থিতি
পাবি রে পরম রতি
নইলে হবে আধোগতি
নইলে চৌরাশী ভ্রমণ ।
সত্ত্বঃ রজঃ তম গুণে ত্রিভুবন
ইহার কি সে চোদ্দ ভুবন কয় কহনা
সূক্ষ্ম করে এই দেহের জানতে চাই উপাসন.
ইহার কোনখানে স্বর্গ
কোনখানে উপবর্গ—
অজ্ঞান আমি জানিলাম না
কি কারণ ।।[৬৭]

* * * * * *
* * * * *
* * * *

মানব দেহকেই বাউল সাধকেরা ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয় বলে মনে করেছেন। দেহভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ অবস্থান। তাই বাউল সাধকেরা দেহতত্ত্বকে গভীরভাবে জানবার চেষ্টা করেছে। যাকে বলা হয়েছে কায়া সাধনা। কারণ এই কায়ার মধ্যেই বাউলের আরাধ্য চিরন্তন মনের মানুষ অহরহ লীলা করে চলেছে। সে দেহের মধ্যে ধরা দেয় আবার অধরা হয়ে অচিন পাখির মত চলে যায় কিন্তু আবার ফিরে আসে কায়ার মধ্যেই।

বাউল গানের এই সব অন্তর্নিহিত অর্থ ও রহস্য (Shut significance) সর্বসাধারণের কাছে পরিস্ফুট হয় না। কারণ এইসব বাউল গানের শব্দ হল শোধিত বা মার্জিত (refined), ভাব ও অর্থ হল অত্যন্ত পরোক্ষ (remote) এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (minute)। মেলার আসরে নৃত্যরত বাউল শিল্পীকে উন্মত্তভাবে গান গাইতে দেখে দর্শক রসাপ্লুত হয়।

জয়দেব-কেন্দুবিল্বের মেলা ছাড়াও আরও কয়েকটি মেলা ও উৎসব আছে যেখানে বাউলদের সমাবেশ ঘটে। সেই জাতীয় দু-একটি মেলা ও উৎসবের কথা বলে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

ঘোষপাড়ায়
সতী-মা'র মেলা

কাঁচড়াপাড়া (উত্তর ২৪ পরগণা)

এই মেলাটিতেও সহজিয়া বাউল ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের সমাবেশ ঘটে। এই মেলা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মেলা। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই একাধিক শ্রেণী দেখা যায়। কর্তাভজা সম্প্রদায় তাদের মধ্যে একটি। এই কর্তাভজা সম্প্রদায় সহজিয়া ধর্মের উপাসক। এক সময়ে পশ্চিমবাংলায় কর্তাভজা সম্প্রদায় বাউল ধর্মের একটি শক্তিশালী সংঘরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কাঁচড়াপাড়ার অন্তর্গত ঘোষপাড়ায়। কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"কর্তাভজা সম্প্রদায় সহজিয়া-ধর্মের উপাসক এবং ইহাদের তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি সারা বাংলায় একই শ্রেণীর সাধন পদ্ধতির সমগোত্রীয়।…এই ধর্মের আদি প্রবর্তক 'ফকির ঠাকুর' বা 'ফকির আউল চাঁদ', 'কর্তাবাবা' বা আদিগুরু রামশরণ পাল এবং আদি-প্রচারক তাঁহার পুত্র দুলাল চাঁদ।…[৬৮]
এই মেলা ও সতী-মা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে[৬৯] নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ কথিত আছে যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় দেড় শত বছর পরে ফকির আউল চাঁদ নদীয়ার উলাবীর নগর গ্রামে আবির্ভূত হন। ভক্তেরা অনুমান করলেন যে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অন্তর্ধান করে আউল চাঁদ রূপে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গৌর পূর্ণিমায় ঘোষ-পাড়ায় প্রতি বছর মেলা বসে। ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমার

অন্তর্গত ঘোষ পাড়া গ্রামে রামশরণ পালের বাড়ির চারপাশে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা হয় সপ্তাহ ব্যাপী। মেলাতে হিন্দু বাউল ও মুসলমান ফকিরের সমাবেশ ঘটে।

ফকির আউল চাঁদ ঘোষপাড়ায় সদগোপ বংশোদ্ভূত রামশরণ পালের সঙ্গে এসে মিলিত হন। এখানে নিভৃত-নির্জনে অবস্থান কালে বাইশ জন ভক্ত তাঁর শিষ্য নিযুক্ত হন। রামশরণ পাল প্রধান রূপে নির্বাচিত হন এই বাইশ ফকিরের মেলার মধ্যে। ভক্তেরা রামশরণকে 'কর্তাবাবা' নামে অভিহিত করলেন। সহজপন্থীগণের মধ্যে কর্তাভজন সম্প্রদায়ের সূচনা করেন আদি-কর্তা রামশরণ পাল। সতী-মা রামশরণের স্ত্রী ছিলেন। সতী-মা'র প্রকৃত নাম হল সরস্বতী দেবী। নদীয়া থেকে আগত সেই ফকির আউল চাঁদকে সতী-মা পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন। আউল চাঁদ সতী-মাকে কঠিন পীড়া থেকে মুক্ত করেন। এরূপ জনশ্রুতি যে ফকির আউল চাঁদের অন্তর্ধানের ছ'বছর পর পুনরায় তিনি সতী-মার গর্ভে দুলাল চাঁদ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই দুলাল চাঁদ কর্তাভজন ধর্মের প্রকৃত প্রচারক।

সতী-মা আপন সাধনার দ্বারা এবং ফকির আউল চাঁদের পুণ্য আশীর্বাদের ফলে অচিরে অলৌকিক শক্তি সম্পন্না এক বাক্‌সিদ্ধা রমণীতে পর্যবসিত হন। এই মেলার সঙ্গে সতী-মার নাম যুক্ত হয়ে তা সতী-মার মেলা নামে অভিহিত হয়। এখানে আছে ডালিমতলা ও সতী-মার পুকুর। ডালিমতলায় এসে মেলার তীর্থযাত্রীরা মানত করে। সতী-মার পুকুরে স্নান করে ভক্ত ও তীর্থযাত্রীবৃন্দ নীরোগ হওয়ার বাসনা করে। পুকুরের জলের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ ও কিংবদন্তী শ্রুত হয়। এই পুকুরের নাম হিমসাগর। এরূপ জনশ্রুতি যে এখানে অবগাহনে পুণ্য হয়। পূর্বোক্ত ডালিমতলায় আছে একটা পুরনো ডালিম গাছ। এই ডালিমতলাতেই সতী-মা সিদ্ধ হন। লোকের বিশ্বাস এখানে হত্যে দিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এ ছাড়া এখানে আছে সতী-মার সমাধি ও শয্যা এবং কর্তাদের সমাজ গৃহ।

নৃত্যবিদ্ মণি বর্ধন[১০] সতী-মার মেলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন ঃ

"...ঘোষপাড়ার মেলায় বাউল জমায়েতে গুরুবাদ, গুরুতত্ত্বের আলোচনা শুনতে পেলাম। বিভিন্ন বাউল বিভিন্নভাবে গুরুকীর্তন ও গুরুতত্ত্বের আলোচনা করছেন দেখলাম।..."

সন্ধ্যায় চাঁদের আলোতে আম্রকুঞ্জের এক পাশে বসেছে জমায়েত, চলেছে একতারার গুঞ্জন। ধরল একজন গান। গানটি গুরু সম্পর্কে—

বল সখি গুরু কেমন বস্তু ধন
জানিনে ঐ গুরুতত্ত্ব গুরু কেমন বস্তু অর্থ
কি সম্বন্ধ তাহার সনে
কি ভাবে ভাবিব মনে
ভাবি সদা মনে মনে চিন্তা অনুক্ষণ ॥

খঞ্জনী বাজিয়ে উত্তর দিল গানের মাধ্যমে অন্য একটি বাউল। সে ধরল গান। গানের কথা—

গুরু হন জগৎপতি।
মন্ত্র দাতা, ইনি ত্রাতা, এরূপে সেরূপের স্থিতি।
গুরুতত্ত্ব সকলের সার, গুরুর উপর বস্তু নাহি আর।
গুরু ব্রহ্ম এই সারাৎসার, জানিবে সম্প্রতি।…”

এমনি করে গানের মাধ্যমে উত্তর প্রত্যুত্তর ও আলোচনা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। মেলা ও উৎসবে এমনি করেই আনন্দ ও শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। মুখে মুখে এ-রূপ আলোচনা ও গান বাঁধার একটা প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। সেই প্রভাব শ্রোতার মনকে প্রভাবিত করে। মৌখিক প্রচারের যে এক অদম্য শক্তি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই সতী-মার মেলা থেকেও বাউল গানের প্রচার হয়। বাউলের আসর থেকে উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে গুরুবাদ ও গুরুতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা সাধারণ মানুষ শুনতে পায়। এমনি করে মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে গায়ক কথক ও ধর্মতত্ত্বের প্রচারকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাংলার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা, কত ইতিহাস ও বাউল গানকে যে মেলা ও উৎসবগুলি বাঁচিয়ে রেখেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই মেলা ও উৎসব না থাকলে এইসব কথা আর কিংবদন্তী, গান ও ধর্মতত্ত্বের সজীবতা প্রমাণিত হত না। শুধুমাত্র পুঁথিপত্র ও গল্প-গ্রন্থের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকত।

দধিয়া-বা দৈধা-বৈরাগীতলার মেলা

কাটোয়া (বর্ধমান)

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বৈরাগ্যতলা বা বৈরাগীতলার দধিয়া গ্রামের প্রান্তে প্রতি বছর মাঘী সপ্তমীতে সরস্বতী ভাসানের পর দিন বিরাট স্থান জুড়ে এই মেলা বসে। গোপাল দাস বাবাজীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে এই মেলার অনুষ্ঠান। অনেকে মনে করেন গোপাল দাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে এই মেলা। মেলাতে বৈষ্ণব, বাউল ও বৈরাগীদের সমাবেশ ঘটে। গোপাল দাস বাবাজী ছিলেন এক পরম ভক্ত ও সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর জীবনকে ঘিরে নানা কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি এই অঞ্চলে প্রচলিত। গোপাল দাস সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন[৭১] বলছেন ঃ

“গোপাল দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে যে, ইনি একজন উৎকৃষ্ট কীর্তনীয়া ছিলেন। বাড়ী বুঁদই পাড়া।”

কিন্তু এই মেলার যিনি প্রাণ-পুরুষ সেই গোপাল দাস বাবাজী ছিলেন অন্য আর এক বৈষ্ণব-সাধক। যিনি বহু পূর্বে উত্তর ভারত থেকে দধিয়া গ্রামে আগমন করেন। মেলার উত্তর পূর্ব কোণে সাধক গোপাল দাসের সমাধি। লোকেরা বলে এই গোপাল দাসই হলেন এই মেলার প্রবর্তক। তাঁর সমাধির পাশে অনুষ্ঠিত হয় মানত এবং ভোগ। সামনের আঙিনায় চলে

বাউলদের নৃত্য-গীত। সাধারণভাবে মেলার প্রথম তিন-দিনই হয় অন্নকূট উৎসব। এই অন্ন-মহোৎসবে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। মাঘী-সপ্তমীতে অর্থাৎ মেলার প্রথম দিনে হয় ফল এবং চিঁড়া মহোৎসব। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে অর্থাৎ অষ্টমী ও নবমী তিথিতে হয় অন্নমহোৎসব। শেষ দিনে সম্পন্ন হয় ধূলোট অর্থাৎ অন্নকূট মহোৎসব। এই মেলার একটা পুরনো ইতিহাসও আছে। নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের[১২] আলোচনা থেকে জানতে পারি যে—এ মেলার পূর্ব নাম ছিল আনন্দবাজার। সেই সময় দূর দূরান্ত থেকে জুয়াড়ীদের আগমন ঘটত। দিবারাত্র চলত জুয়াখেলা। এ ছাড়া এই মেলাতে আসর জমাতো…বহুসংখ্যক বারবণিতা। সাময়িকভাবে গড়ে উঠত বারবণিতাদের ঘর আর শুঁড়িখানা। এরা বিপুলভাবে অর্থ উপার্জন করত। তখন এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঝুমুর গানের প্রতিযোগিতা। মল্লারপুর, চন্দননগর থেকে নামকরা ঝুমুরের দল আসত। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জমিদারি উচ্ছেদ ও নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে পড়ে আজ সেই আনন্দবাজার অপসারিত। তার জায়গায় এসেছে সার্কাস। কিন্তু এই মেলাকে ঘিরে রমণীকুলের প্রাধান্য আজও অক্ষুণ্ন।

মণি বর্ধনের[১৩] আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, পুরুষদের সমাগম হয় প্রথম তিন দিন। তারপরই সুরু হয় মেয়েদের ভিড়। শ্রীবর্ধনের মতে বাংলা দেশের কোন মেলায় বা উৎসবে এত রমণীর সমাবেশ দেখা যায় না। এখানে রমণীরাই কেনা-বেচা করে। এখানে প্রচারিত একটি বাউল গানের মধ্যে আছে রমণীররূপ ও প্রেমের বন্দনা। যথা—

"দেখবি যদি সোনার মানুষ, দেখে যারে মন-পাগলা
অষ্টরং গোলাপী বরণ, ষোলকলার পূর্ণিমা।
তার কপালে আছে লক্ষণ
কৌতুকেলা অকৌতুক ধন—
রূপ দেখে হয় আনন্দ—মদন হয় রে বেতালা।

* * * * * *
* * * * *
* * *

ঊরু দুটি কলার বোগ, দেখতে যেন চাঁদের ছটা
সিংহ-কটি ঐ দেখ চেয়ে, বাহু দুটি বেলুন-কাটা
হাত দুটি জবার কুলা
দেখে যারে মন-পাগলা।"[১৪]

অথবা— "মন রে—
যুবতী ফণী—ধরো না
উঠবে বিষম জ্বালা, নয় হলাহল
দেখ মন অপবিত্রে মরো না

(ওরে) প্রণয় মাণিক আছে বটে
তাহার মাথার উপরে—
কেউ পেয়েছে ভালবাসা, রাজ্য ধন
কেউ ভাসিছে অকূল পাথারে।
কেউবা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে রে
ফকির হয়ে দেশ ছেড়ে যায়
আর আসে না—
মন রে যুবতী ফণী ধরো না।"[১৫]

দধিয়ার মেলা : কথা ও কাহিনী

দীর্ঘকাল আগে সুদূর উত্তর ভারত থেকে বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজী এসে উপস্থিত হলেন বর্ধমান জেলার এই দধিয়া গ্রামে। এই অঞ্চল তখন ছিল ভীষণ অরণ্যসংকুল। শোনা যায় ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। সেই সময় গোপালদাসের পুণ্য আবির্ভাব। তিনি এসে সেই নিভৃত নির্জন দধিয়া বৈরাগীতলায় বসতি স্থাপন করলেন। ধীরে ধীরে এই প্রবাদপ্রতিম পুরুষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। গোপালদাস ছিলেন এক শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ। নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড সৃষ্টি করে গ্রামবাসীকে বিস্মিত করে দিতেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে গোপালদাস খড়ম পায়ে পুষ্করিণীর জলের ওপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে যেতেন এপার থেকে ওপারে। অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্যে অসময়ে বৃষ্টি নামিয়ে সমস্ত গ্রামকে জলময় করে সেই জল থেকে কৈ মাছ সংগ্রহ করেন। আবার নিমগাছ থেকে আম পেড়ে সন্দেহভাজনদের আমঝোল খাওয়ান। লোকমুখে প্রচলিত আছে যে গ্রামবাসী গোপালদাসের দেওয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে আশাহত গোপাল-দাস ঠাকুর সেবার প্রসাদসামগ্রী মাটির তলায় পুঁতে রাখেন। গ্রামবাসীদের ভুল ভাঙে। তারা গোপালদাসকে নিমন্ত্রণ করে। গোপালদাস সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে গ্রামবাসীদের জানান আগে তারা এসে ফিরিয়ে দেওয়া রঘুনাথের ভোগ গ্রহণ করলে তবেই গোপালদাস তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

গ্রামবাসীরা সম্মত হয়ে গোপালদাসের আশ্রমে আসে। মাটির তলায় রাখা রঘুনাথের ভোগের সামগ্রী তুলে গ্রামবাসীকে আহার করান। সবাই অনুভব করে সেই ভোগ স্বাভাবিক ও সুস্বাদু রয়েছে। আহার করে সকলে তৃপ্ত হন।

গোপালদাস বাবাজী বেশ কিছু বিষয়-সম্পত্তি পত্তনীস্বরূপ মোগল দরবার থেকে লাভ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এই পত্তনীর দ্বারাই মেলার খরচ ইত্যাদি বহন করা হত। তাই মনে হয় গোপালদাস ছিলেন বৈরাগীতলার মেলার প্রবর্তক। পরবর্তীকালে সরকার পত্তনীদারের কাছ থেকে মেলার যাবতীয় দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে ইজারাদারদের হাতে মেলা পরিচালনার ভার তুলে দেন।

গোপালদাসের পুণ্যস্মৃতিতে আজও সাড়ম্বরে বৈরাগীতলার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা বসে পুরনো দীঘির চারপাশে। দীঘির নাম "সাওতা"। প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই মেলাটি অনেকের মতে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মেলা। গোপালদাস দধিয়া গ্রামে রঘুনাথ জীউ-এর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালদাস বাবাজীর ভক্ত-শিষ্যবৃন্দ ও মোহান্তেরা এই মেলার অন্নকূট উৎসব এবং অন্ন বিতরণের বিশাল কর্মকাণ্ডটিকে আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। লোকেদের বিশ্বাস যে গোপালদাস বাবাজীর পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে অন্নদান করলে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় ও মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তাই আজও অসংখ্য মানুষ গোপালদাসকে স্মরণ করে অন্নভোগ মানসিক ক'রে অন্নভোগ দেয়। রঘুনাথ-মন্দিরের চারপাশে সমবেত হয়ে বাতাসা হরির লুঠ দেয়।

বিশাল ও বিস্তৃত মেলা প্রাঙ্গণের নানাস্থানে বড় বড় উনুন জ্বলে। শাক-সব্জী ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদির প্রস্তুতিপর্ব দেখে মনে হয় কোন রাজবাড়িতে সমগ্র রাজ্যের প্রজাদের জন্য ভোগের আয়োজন চলছে। গো-শকট বোঝাই করে আসছে চাল, ডাল, তরি-তরকারি এবং অন্যান্য আহারের সামগ্রী। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ধনী, দরিদ্র সবাই মাটিতে পংক্তিভোজে অংশগ্রহণ করে। এখানে কোন জাতিধর্মের ভেদাভেদ নেই। গোপালদাস বাবাজীর মেলায় সবাই এক ও অভিন্ন। এ এক অত্যাশ্চর্য এবং অভিনব অন্ন-মহোৎসব। যাকে স্থানীয় মানুষেরা বলে 'মচ্ছব'। তাই দধিয়া বৈরাগীতলার মেলা শুধু মেলা নয়, এ হল মেলা ও উৎসব।

কৃষিজাত পণ্যের সমারোহ এ মেলার এক বড় আকর্ষণ। লাঙলের জোয়ালের কাঠ, ফাল, কোদাল, গাঁইতি, শাবল প্রভৃতি কৃষি-কর্মের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকানে থরে থরে সাজান থাকে। এ ছাড়া বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে সাবুই বাবুই ঘাস, সাবুই ঘাসের দড়ি ও রঙ-বেরঙের নানা ধরনের জেলেদের মাছ ধরার জাল প্রভৃতির অনেক দোকান।

মেলায় আসে করাতির দল। বিহারের দুমকা থেকে আসে জানালা দরজার কাঠ। সারি সারি কাঠের দোকানে কেনা-বেচা চলে। কাঠের মিস্ত্রিরা মহা উৎসাহে তৈরি করে গরুর গাড়ির চাকা, ঘরের পাল্লা, দরজা ও জানালা। চোখে পড়ে বাবলা কাঠের দোকান। শাল গাছের গুঁড়িকে চৌচির করে করাতির দল প্রস্তুত করে কাঠের নানা আসবাব সামগ্রী।

পল্লীজীবনের সঙ্গে কি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এই মেলার। ছোট বড় কতো রকমের মিষ্টান্নের বিপুল আয়োজন চোখে পড়ে এই মেলায়। এইসব রকমারি মিষ্টি খাবারের দোকানে ভিয়েন বসে। মিষ্টান্নের এমন রকমারি বিচিত্র সম্ভার অভূতপূর্ব। মুর্শিদাবাদ, কান্দী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বেলডাঙা, খাগড়া প্রভৃতি নানা স্থান থেকে যেন জামাই সেজে এসেছে এইসব মিষ্টান্নেরা। এরই পাশে রয়েছে আধুনিক পণ্যসম্ভারের সারি সারি দোকান। মেলায় এসেছে মডার্ন সার্কাস, বসেছে যাদুবিদ্যার আসর। লাউডস্পীকারের

গর্জন, ঘোষণা, চটুল গান-বাজনার হৈ-হৈ হিল্লোল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাচীন এইসব মেলাগুলির ওপরে পড়েছে এক আধুনিকতার উগ্র প্রলেপ।. এটা আজ অবশ্যম্ভাবী। দ্রুত আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, কম্পিউটার কালচার ও সমাজের নৈতিক পরিবর্তনের অপরিহার্য পরিণাম হিসেবে মেলাগুলির সাজ-পোষাকে রুচি বদল হচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে গোপালদাস বাবাজীর পুণ্যস্মৃতি ও মহিমাকে দধিয়া গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই সুপ্রাচীন মেলাটিকে আন্তরিক হৃদয়ে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। পশ্চিমবাংলার বৈরাগী-তলার মেলা তাই এক সুমহান জাতীয় সংহতির মেলা ও উৎসব।

শ্রীখণ্ডের মেলা (বর্ধমান)

বৈষ্ণব সাধক ঠাকুর নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে প্রতি বছর বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামের বড়ডাঙাতে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশীর দিনে নরহরি সরকারের তিরোভাব হয়। শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বচর ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্তা ছিলেন। নরহরি সরকারের জন্ম হয়—১৪৭৮ সালে এবং এঁর তিরোভাব ঘটে ১৫৪০ সালে। চৈতন্য মহাপ্রভু, নীলাচলে যখন ছিলেন তখন ঠাকুর নরহরি সরকার তাঁর অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন। শোনা যায় যে নরহরি ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন। এই নরহরি সরকার ছিলেন লোচন দাসের গুরু। লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গলে"র উপদেষ্টা ছিলেন ঠাকুর নরহরি সরকার। এই ইতিবৃত্ত আমরা জানতে পারি দীনেশচন্দ্র সেনের[৭৬] আলোচনা থেকে। নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথিতে প্রতি বছর শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙায় মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যে উৎসব বড়ডাঙার মহোৎসব নামে প্রচলিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঠাকুর নরহরি সরকারের প্রথম বার্ষিক তিরোভাব উৎসব শ্রীখণ্ড গ্রামের গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাসের প্রচেষ্টায় বড়ডাঙাতেই পালিত হয়। সেই থেকে অদ্যাবধি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বড়ডাঙাতেই। দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে নানা স্থান থেকে বৈষ্ণব মোহান্ত, আচার্য, কবি, কীর্তনীয়া এবং বাউলগণের ব্যাপক সমাবেশ হয়েছিল। নরহরি চক্রবর্তী রচিত "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থে তাঁদের নামের সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। যথা—

"প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়—
কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দময়
প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র
ভুবনমোহন যেঁহো গুণের সমুদ্র"[৭৭]

তাই শ্রীখণ্ডের মেলা ও বড়ডাঙার মহোৎসব বৈষ্ণব বাউলদের কাছে এক

পবিত্র তীর্থভূমি। প্রতি বছর কীর্তন ও বাউল গানে বড়ডাঙার মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়।

রামকেলির মেলা (মালদহ)

মালদহের ইংরেজবাজার থেকে গৌড়ের পথে বৈষ্ণব তীর্থ রামকেলিতে যে মেলা হয় সেখানেও বাউল ও বৈরাগীদের সমাবেশ ঘটে। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে পাঁচ থেকে সাতদিনব্যাপী ইংরেজবাজারের মহদীপুর গ্রামে সাড়ম্বরে রামকেলির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রামকেলির মেলাও বেশ প্রাচীন। রামকেলির মেলা প্রসঙ্গে শোনা যায় যে গৌড়ের শাসন-কর্তা হোসেন শাহের রাজত্বকালে একবার শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে এই গ্রামে এসে রামকেলির কেলিকদম্ব মূলে অধিষ্ঠান করেছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে সেখানে তমাল বৃক্ষের নিচে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আজও বর্তমান। রামকেলিতে চৈতন্যদেবের পুণ্য আগমনকে সর্বসাধারণের নিকট স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই রামকেলিতে প্রতি বছর বৈষ্ণবদের এই জনপ্রিয় মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে—জয়দেব কেঁদুলীর মেলা, শ্রীখণ্ডের মেলা, দধিয়া বৈরাগীতলা ও রামকেলির মেলা এবং সতী-মার মেলা ও উৎসব হল বাংলা ও বাঙালীর সহজিয়া বাউল, বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়ার মেলা। এইসব মেলাতে একদিকে যেমন বাউল গান শোনা যায় অন্যদিকে তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনাও হয়। বাউল গান, কীর্তন প্রভৃতি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। জয়দেব গোস্বামী, সতী-মা, বৈষ্ণবসাধক নরহরি সরকার কিংবা গোপালদাস বাবাজীকে কেন্দ্র করে এইসব মেলা ও উৎসবের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হলেও এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাউল ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতাদর্শ গানে, কথকতায় ও আলোচনার দ্বারা বাংলার প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বর্তমান বাঙালী প্রজন্মের যোগাযোগটি আজও অটুট হয়ে আছে। একথা ঠিক যে এইসব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এগুলি যুগে যুগে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়। কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন মেলা ও উৎসবগুলি এক বিশেষ ধাঁচের লোকমাধ্যম। তাই এই লোকমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে বাউল গান, বাউল নৃত্য, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি লোক সংস্কৃতির অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্পদ অন্তর্হিত হয়ে যাবে। এইসব শিল্প-সংস্কৃতি, নাচ, গান প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দেশী মেলা ও উৎসবগুলি যেন পল্লী বাংলার বুকে এক সুসজ্জিত শকটের মত এগিয়ে চলেছে। এর গতি যদি স্তব্ধ হয়ে যায়—তাহলে গ্রামবাংলার জনসাধারণের কাছে মেলার শিল্প-সংস্কৃতি চিরকালের মত নীরব হয়ে যাবে।

বাউল মেলাগুলি মুখরিত হয় বাউল গানে ও নৃত্য মহিমায়। প্রাণাবেগে

উচ্ছল বাউল নৃত্যের মধ্য দিয়ে নৃত্য সংস্কৃতির যে বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায় তা যেমন অভিনব তেমনি সেই বাউলের নৃত্য-মহিমা, আঙ্গিকের বিচারে ও কলা-কৌশলে অপরূপ ও লীলাময়। মণি বর্ধন বলছেন:[৭৮]

"...বাউল-নৃত্যের আঙ্গিকে, হংসগতি, ময়ূরগতি আজও পরিলক্ষিত হয়। বাউলদের নৃত্য-আঙ্গিকে, আজও তারা প্রয়োগ করে 'অর্ধ্যধিকা', 'বিচ্যবা,' পাদচারী, প্রয়োগ করে 'অশ্বোৎ প্লাবন', অন্তভ্রমরী ও নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিবিধ শির ও গ্রীবাকর্ম। 'কটিচ্ছিন্ন', 'উদবৃত্তম', 'প্রসর্পিতম্', 'গজক্রীড়িতম', 'সর্পিতম্', 'উপসৃতকম', 'বিদ্যুৎভ্রান্তম' প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রোক্ত করণ, গতি ও চলন নৃত্য আঙ্গিকে পরিলক্ষিত হয়। মণিপুরের যে রাস-নৃত্য নিয়ে আজ আমরা গর্ব করি, যে নৃত্যের খ্যাতি সারা জগৎ জুড়ে, সে নৃত্যের আঙ্গিক, নৃত্যছক ও মাতৃকা এবং রূপবন্ধ একদিন বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে এই বাঙলার নবদ্বীপ হতেই মণিপুরবাসী ধর্মান্তরিত হওয়ার কালে গৃহীত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মে, মণিপুরবাসী ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে বাঙলার নৃত্য ও গীত নীত হয়েছিল মণিপুরে।..." বাংলাদেশের এই প্রাচীন নৃত্য-গীত-বাদ্য মূলক সংস্কৃতি মণিপুর গ্রহণ করেছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্যের[৭৯] আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে—অতীতে মণিপুর একসময়ে ব্রহ্মদেশের অধীনে ছিল। তারপর একদিন যখন বাংলাদেশ থেকে বৈষ্ণবধর্ম গিয়ে সেখানে প্রচারলাভ করেছিল সেইদিন মণিপুর তার সমাজ-জীবনের মধ্যে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল সেই ধর্মকে। এমনি করে সে নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়েও বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতি-মূলক উপাদান-উপকরণ গ্রহণ করে আপন স্বকীয়তা রক্ষা করেছিল। তাই দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক কাহিনীকে মণিপুর নৃত্য-গীত-বাদ্যের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের সমাজেও স্থানান্তরিত হয়। কোন দেশের লোক-সংস্কৃতি তথা লোক-সাহিত্য, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং নৃত্য-গীতের মাধ্যমে একটি দেশের সংস্কৃতিকে শুধু প্রভাবিত করে না উপরন্তু সেই দেশের সংস্কৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকে। মেলা এবং উৎসব আবহমানকাল থেকে এইসব প্রাচীন লোক-সংস্কৃতিমূলক নৃত্য-গীতকে মানুষের কাছে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই মেলা ও উৎসবের স্পর্শে সেইসব প্রাচীন শিল্প-সম্পদ আজও সজীব হয়ে ওঠে।

(খ) বাংলার গাজন-গম্ভীরা এবং ধর্মঠাকুরের পূজা ও উৎসব

এ-কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে প্রাচীনকাল থেকে বাংলা দেশে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর আগমনের ফলে এবং বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে বাঙালীর লোক-সংস্কৃতির চেহারাটা বিচিত্র উপাদানে গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ও আর্যেতর সংস্কৃতির মিলনের ফলে বাঙালীর লোকসাহিত্য

এবং উৎসবেও তার একটা প্রভাব পড়েছিল। আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, টুসু, ভাদু লোকসঙ্গীত এবং ধর্মঠাকুরের গাজন প্রভৃতি নৃত্য-গীতোৎসবের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতিগত প্রভাব যে অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এটা অনেকেই অনুমান করেন। এই জাতীয় আঞ্চলিক উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে লোক কবিগণ বিভিন্ন ছড়া ও গান রচনা করেন।

আঞ্চলিক উৎসব ও গীতানুষ্ঠান পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের কয়েকটি লৌকিক উৎসব ও গীতানুষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরেছি। লৌকিক দেবতাকে নিয়ে এইসব উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন শিব, ধর্মঠাকুর, ঘেঁটু প্রভৃতি। আমাদের এই পর্যায়ে আলোচিত আঞ্চলিক উৎসব ও গীতানুষ্ঠানগুলি হল—গম্ভীরা, গাজন, ভাদু, টুসু, ইঁদ, করম, ঝাঁপান, ঘেঁটু ইত্যাদি।

মালদহের গম্ভীরা উৎসব

বর্তমান উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চল অতি প্রাচীন স্থান। বাংলার সুপ্রাচীন বৌদ্ধ, এবং মুসলমান রাজাদের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী, গৌড় প্রভৃতি অঞ্চল অতীতে এই মালদহের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল বাংলার রাজধানী হবার পর ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের সঙ্গে এর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হতে থাকে। কালক্রমে এই অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয় যার নাম দেওয়া হয় গম্ভীরা। সাম্প্রতিককালে এটি আদ্যের গম্ভীরা অথবা শিবের গম্ভীরা নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও প্রাচীনকালে গম্ভীরার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে গম্ভীরা শব্দের অর্থ হল 'প্রকোষ্ঠ'।[৮০] কিন্তু মালদহে আদ্যের গম্ভীরা অর্থে আদ্য বা শিবের গাজনকেই বোঝায়। শ্রীভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"...গম্ভীরা অর্থাৎ যাহার অর্থ প্রকোষ্ঠ তাহা দ্বারা কেন যে গাজন বা শিব স্তুতিমূলক সঙ্গীত বুঝায় তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।"[৮১]

গম্ভীরা নামোৎপত্তির অনুসন্ধানে হরিদাস পালিত[৮২] যে সকল তথ্য উপস্থিত করেছেন তার দ্বারা আমরা জানতে পারি যে মালদহ অঞ্চলে চণ্ডী-মণ্ডপকেই গম্ভীর বা গম্ভীরা বলা হত। গম্ভীরা অর্থে আরাধনা ও ধর্ম-সংক্রান্ত কোন গৃহবিশেষ। যার আকার চণ্ডীমণ্ডপের মত। মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে গম্ভীরা চণ্ডীমণ্ডপ বা শিবালয় হিসেবেই অধিক পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে এই গম্ভীরাতেই শিবের আরাধনা করা হত। কালক্রমে গম্ভীরা পূজা প্রকারান্তরে গম্ভীরার শিব-উৎসব হিসেবেই জনসাধারণের কাছে প্রচলিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু গম্ভীর অথবা পঙ্কজ দ্বারা শিবালয়গুলি সাজানো হত। গম্ভীরা নামকরণের এটাও একটা কারণ হতে পারে বলে হরিদাস পালিত মনে করেন। কিন্তু গম্ভীরার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক

এসে পড়ে এই জন্যে যে গম্ভীরা শিবের একটা নাম। যথা—'যুগাদিকৃদ্‌ যুগাবর্তো গম্ভীরো বৃষ বাহনঃ'।[৮৩]

এই প্রসঙ্গে 'আদ্যের গম্ভীরা'[৮৪] গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে—"গৃহিলোক আপন বাসভবনস্থ গম্ভীরা গৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্মপাদুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আদ্যা দেবী তথায় পূজা পাইলেন। চণ্ডীকারূপে পূজা পাইবার সময় আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরায় থাকিত। ক্রমে চণ্ডিকা শিবপত্নী হইলে 'হরগৌরী-রূপে' গম্ভীরা মণ্ডপে স্থান পাইলেন। এই গম্ভীরাতেই ধর্মোৎসব হইত। সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাবকালে 'হরগৌরীর' পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।" তাই পরবর্তীকালে গম্ভীরা ব্যাপক অর্থে শিবের গাজন রূপেই পরিচিতি লাভ করল। তবু গম্ভীরা শব্দটিকে নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য[৮৫] মনে করেন যে গম্ভীরা শব্দটি তিব্বতো-চৈনিক কোন শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় 'গম্ভীরা' নামে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। সেই গমীরা শব্দটি সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে গম্ভীরা শব্দে পরিণত হওয়াই সম্ভব। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শব্দটি মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কারণঃ

"গৌড় রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে দ্বিতীয় ধর্মপাল দেবের ও গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজত্বকালে গম্ভীরা শব্দে ঐ প্রকারের গৃহবিশেষই বুঝাইত। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গীতে তাহা অবগত হই…।

দুই দুতে বান্ধী রাণী থুইল গম্ভীরে॥ ২২৩
গম্ভীরে বসিয়া যোগী ধ্যানেতে জানিল। ২৩১
হাড়িপা গম্ভীরে বসি ধ্যানে দিল মন॥ ২৯৯
আপনার কায়া ছাড়ি গম্ভীরে রাখিয়া।
মায়াপতি জাত্রা কৈল দৈবজ্ঞ হইঞা[৮৬]…" ৩০৩

অধুনা মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরা গীতোৎসবে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কোন ভিন্ন স্থান বা বিশেষ গৃহ নেই। অথচ মধ্যযুগের বাংলায় গম্ভীরা অর্থে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা গৃহকেই বোঝাত। তাই বর্তমানে মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরা গান বা গম্ভীর উৎসব হিসেবে যেটা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে গম্ভীরার প্রাচীন শব্দগত তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় বলে আমাদের ধারণা। তবে প্রাচীন কাল থেকে গম্ভীরা গানের প্রচলন ছিল। একটা সামিয়ানার নিচে শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এই উৎসব পালিত হত। সর্বাগ্রে গত বছরের প্রধান ঘটনা সমূহ বা বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা করা হত নৃত্য গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে। যে বিষয় নিয়ে গম্ভীরা গানের সূচনা হয়, তাকে ঐ গানের 'মুন্দা' বলে। যেমন দেশে হয়ত অত্যন্ত বানরের উৎপাত হয়েছে, লোকেরা বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ—তাই বানরের উপদ্রব বিষয়ক গান রচিত হল। অতএব সে গানের 'মুন্দা' হল বানরের উৎপাত। তেমনি ভোটরঙ্গ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় ও ঘটনা কোন গানের

'মুন্দা' হতেও পারে। তাই মুখে মুখে আসরে গান রচনা করা হত। 'মুন্দা' বলে দিলে তবেই 'খলিফা' গীত রচনা করে। গীত রচয়িতাকেই খলিফা বলা হয়। গান ও অভিনয় অনেক সময় একই সঙ্গে চলে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য 'আদ্যের গম্ভীরা'[৮৭] গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে এই গম্ভীরা গীতোৎসবের প্রবক্তা ছিলেন দিনাজপুর অঞ্চলের শিবভক্ত বাণরাজা।[৮৮] প্রাচীনকালে হিন্দু ও মুসলমানগণের ধর্মীয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা গান রচিত হত। কালক্রমে মানুষের রুচি বদলের সাথে সাথে সমসাময়িক ঘটনাবলী গম্ভীরা গানের বিষয়ীভূত হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী গম্ভীরা গানকে প্রভাবিত করেছে। দেশের সাম্প্রতিক বা সমসাময়িক চেতনায় বর্তমানের গম্ভীরা গান নানাভাবে অনুপ্রাণিত। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য[৮৯] মনে করেন যে গম্ভীরা গান আঞ্চলিক সঙ্গীত হলেও এই সঙ্গীত একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। শ্রীভট্টাচার্য মনে করেন যে এই অনুষ্ঠানই শিবের গাজন। মালদহ অঞ্চলে এটি আদ্যের গম্ভীরা হিসেবে পরিচিত। আদ্য বা শিবের গম্ভীরা উপলক্ষে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, তা হল এই গম্ভীরা গান। এই অনুষ্ঠানে মুখোস-নৃত্য দেখানো হয়। এই নৃত্যকে বলে গম্ভীরা নৃত্য। শিবের গাজন-ই যে প্রকারান্তরে নামান্তর প্রাপ্ত হয়ে মালদহে গম্ভীরা নামে খ্যাত হয়েছে একথা হরিদাস পালিতও স্বীকার করেছেন তাঁর আদ্যের গম্ভীরা গ্রন্থে। (৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ পৃ. ৬৪ দ্রষ্টব্য)

বর্তমানে মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও চৈত্র সংক্রান্তিতে, আবার কোথাও বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে গম্ভীরা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। বৈশাখের মাঝামাঝি কোন সময়ে গম্ভীরা গানের আসর বসে। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস যে শিবের গাজন বা শিবের বন্দনা করলে দেশের যাবতীয় অমঙ্গল দূর হয়। তাই আগেকার দিনে গম্ভীরা উৎসবের কিছু আগে থেকেই ভক্তেরা নানারূপ সঙ্ সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিবের নাম করে ভিক্ষা চাইত। কোথাও আবার এই উৎসব উপলক্ষে গম্ভীরা গান ও কবি গানের আসর বসত। গম্ভীরা উৎসবে বার্ষিক বিবরণীর পর্যালোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অনেক সময় গম্ভীরার লোককবিরা সমাজের ঘটনা, অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয় সমাজের হিতার্থে। অপর সকলে এর দ্বারা সচেতন হয়। কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রবণতা প্রকাশ পায় এই সব গানে ও ছড়ায়। তাই অনেকে মনে করেন যে এই গম্ভীরা একটা উৎসব হয়েও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে। পরোক্ষভাবে গম্ভীরার গায়কগণ মানুষের সামাজিক জীবনের বর্ষ বিবরণী প্রকাশ করে দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করে। সবাই মিলে মিশে একই সমাজের হিত করার প্রচেষ্টায় গম্ভীরা অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে সবাই আলাদা হলেও দলবদ্ধভাবে সমাজে সকলেই যে এক ও অভিন্ন এই চেতনা জেগে ওঠে গম্ভীরা উৎসবে। বর্ষ বিবরণী প্রকাশের ফলে যেমন কোন

হিতকর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে, তেমনি কোন ব্যক্তিগত গুপ্ত এবং অহিতকর কার্য বর্ষ বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সর্বোপরি এই উৎসবের মাধ্যমে একটা সামাজিক কল্যাণ সূচিত হয়। মানুষের পাপ-পুণ্যবোধকে গম্ভীরা উৎসবে অভিনয়ের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। তাই সমাজের লোকেরা সাবধানতা অবলম্বন করে। শিল্পীগণ সমসাময়িক নানা বিষয় ও ঘটনাকে নিয়ে গম্ভীরা উৎসবে গান রচনা ও পরিবেশন করে। খোলা আঙিনায় সামিয়ানা টাঙানো হয়। সেই সামিয়ানার নিচে বসে গম্ভীরা গানের আসর। সাধারণতঃ বছরের শেষ তিন দিন এই গানের অনুষ্ঠান হয়। আবার কখনও কখনও সারা বৈশাখ মাস ধরে গীতানুষ্ঠান ও বিগত বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয়।

গম্ভীরা উৎসবের সূত্রপাত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা তাতে অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরাও যেমন 'গম্ভীরা' করে, তেমনি নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী প্রভৃতি সমাজের অনুন্নত শ্রেণীরাও গম্ভীরা উৎসব পালন করে।

গম্ভীরা উৎসব প্রধানতঃ চারদিন পালিত হয়। প্রথম দিন ঘটভরা। দ্বিতীয় দিন ছোট তামাসা। তৃতীয় দিন বড় তামাসা। চতুর্থ দিন হয় আহারা। অঞ্চল বিশেষে অনুষ্ঠান ও দিনলিপির তারতম্য ও পার্থক্য চোখে পড়ে। চৈত্র সংক্রান্তির তিন-চারদিন আগে থেকেই গম্ভীরা উৎসবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের সূত্রপাত হয়। মূল অনুষ্ঠানের সূচনা চৈত্র সংক্রান্তিতে হলেও ঘটভরা ও তামাসা প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলো কয়েকদিন আগে থেকেই সুরু হয়। অঞ্চল বিশেষে 'ঘটভরা' প্রথায় দেখা যায় যে মূল সন্ন্যাসী অর্থাৎ প্রধান ভক্ত ঘটে জল ভরে। বংশানুক্রমে কোথাও কোথাও প্রধান ভক্ত কে হবে তা স্থির করা হয়। ঘটভরার দিন সকলে সমবেত হয়। তারপর গ্রাম প্রধান বা বিশেষ কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে নিকটবর্তী নদী, পুকুর প্রভৃতি থেকে ঘট ভরে আনা হয়। ঘট ভরার সময় ঢাকীরা ঢাক বাজায়।

গম্ভীরার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানকে 'ছোট তামাসা' বলা হয়। 'তামাসা' অর্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্যকেই বোঝায়। এই দিনে শিব-পার্বতীর পূজো হয়। এই পূজায় অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে 'বালাভক্ত'রা এসে সমবেত হয়। 'বালাভক্ত' হল ছোট ছোট বালক বা কিশোর ভক্ত। প্রধান ভক্ত সমবেত ভক্তদের সামনে এসে গম্ভীরা মণ্ডপে দাঁড়িয়ে সকলকে শিবস্তুতি পাঠ করায়। ছোট তামাসার রাত্রে নৃত্য-গীত ও মুখোশ-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

গম্ভীরার তৃতীয় দিনকে বলে বড় তামাসা। বয়স্করা এইদিন নৃত্য-গীত করে। শিব-পার্বতীর পূজো ও শোভাযাত্রা এইদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান। এক গম্ভীরা থেকে অন্য গম্ভীরায় গমন ও ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্ত্রী, সাঁওতাল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছেমত পোষাক পরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। আগেকার দিনে ভক্তরা কেউ কেউ ত্রিশূলের

মত ক্ষুদ্র বাণ বুকের পাশে বিঁধিয়ে সেই ত্রিশূলের মুখে কাপড় জড়িয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিত। তার ওপর অন্য ভক্ত ধূপ চূর্ণ নিক্ষেপ করে উল্লাস ধ্বনি করে উঠত এবং অন্য ভক্তরা উন্মত্তভাবে নৃত্য করতে থাকত। সন্ধ্যায় হনুমানের মুখোস পরে হনুমান সাজত। কাঁচা কলাপাতা দিয়ে হনুমানের দীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করে অগ্রভাগে শুকনো কলা পাতা জড়িয়ে অন্য ভক্ত তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। অগ্নিদগ্ধ লেজ নিয়ে অভিনেতা হনুমান লম্ফ প্রদান করে সশব্দে হুঙ্কার ছাড়ত। এটাই ছিল সমুদ্র পারাপার ও লংকাদগ্ধের অভিনয়, বা লংকা দগ্ধ পালা। রাত্রে বড় তামাসার দিন নানা শ্রেণীর নৃত্য প্রদর্শিত হত। নৃত্যের সাথে সাথে সুরু হত গান। শিব-নিন্দা-স্তুতি দ্বারা শিবের গান সুরু হলেও ধীরে ধীরে সেই গানের 'মুন্দা' দেশের বা ব্যক্তির কিংবা সমাজের কোন ঘটনার ওপর আলোকপাত করে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে গম্ভীরা গানে বিষয়গত বৈচিত্র্য যাই থাকুক না কেন এতে মূলতঃ শিব-দুর্গার বিষয়টাই কেন্দ্রীভূত থাকে। যার জন্যে গম্ভীরা গান মুসলমান সমাজের আওতায় এসে তা আলকাপ গানে রূপান্তরিত হল। আশুতোষ ভট্টাচার্য[২০] মনে করেন যে আলকাপ গান শিব-বিষয়ক গম্ভীরা গানেরই ইসলামি সংস্করণ। আলকাপ গানের রুচি ও নীতিবোধ কিছুটা আরো নিম্নস্তরের। উপরন্তু আলকাপ গানের বিষয়বস্তুও নিতান্ত লঘু পর্যায়ের।

বড় তামাসার দিন রাত শেষ হবার আগেই 'মশান নাচা' হয়। এই প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত[২১] বলছেন ঃ

"...মশান সুবৃহৎ আলুলায়িত কেশ, সিন্দুর লিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খ পরিহিত, সালঙ্কারা বিকটবদনা বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধুনাচিতে ধুনা প্রদান করিয়া সেই ধূম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করে। এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা মণ্ডপে কালী প্রভৃতির নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতান বাজায়, তখন মুখার নৃত্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। তৎকালে পূজক একটি মাল্য এবং ধূপের ধূম সম্মুখে প্রদান করিলে কালীমুখা প্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়া ধূম গ্রহণ করিয়া শান্ত হয়। মশান-কালী ধূলায় লুণ্ঠিত হয়।..."

সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে একটা অনার্যীয় রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আদিম বা বন্য মানুষেরা শিকার করে এসে পরাভূত মৃত প্রাণীকে নিয়ে যেমন আগুন জেলে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করত বড় তামাসার দিন 'মশান নাচা' অনুষ্ঠানটিও যেন কিছুটা সেই রকমের। যদিও সামগ্রিক বিচারের মাপ কাঠিতে উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়গত সমতা নেই। কিন্তু 'মশান নাচা'র আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা বন্য বা আদিম ভাব বিরাজমান। সাম্প্রতিককালে সামাজিক পরিবর্তন ও রুচি বদলের সাথে সাথে গম্ভীরা অনুষ্ঠানের নানা প্রকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকালের

গম্ভীরার আচার-অনুষ্ঠানের অবশিষ্টাংশ আজকের গম্ভীরা উৎসবের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগবাহিত একটা উৎসব ঠিক এমনি করেই পুরনো রীতি-নীতি ও প্রাচীন মানুষদের ধ্যানধারণাকে বাঁচিয়ে রাখে।

গম্ভীরা উৎসবানুষ্ঠানের শেষ দিনে হয় আহারা। গম্ভীরা অনুষ্ঠানের পুজার বিশেষ রীতি-নীতির নাম হল আহারা। কাঁচা বাঁশের ডগায় মোচা, আম প্রভৃতি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেই মোচা ও আমকে পুজো করা হয়। এই পুজোর নাম হল আহারা। আহারা পুজোর দিন হর-পার্বতীর পুজোও হয়। ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করানোই হল এই অনুষ্ঠানের আর এক বিশেষ রীতি। আহারার আর একটা বড় তাৎপর্য হল যে এই দিনে 'শিবের চাষের' অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে শিবের চাষ ও শিবের শাঁখারি বেশ ধারণ হল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিবের চাষ করার বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যরসাত্মক। শিবের চাষ করার অভিলাষ হয়েছে, কিন্তু জমি প্রয়োজন। পার্বতী ইন্দ্রের কাছে জমি চাইতে বলছে। শিবের অভিলাষই পার্বতীর অভিলাষ। তাই শিব ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলছেন ঃ

"তুমি ভূমি দিলে আমি
চষি গিয়া চাষ
পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ"[৯২]

'শিবের চাষ' অভিনয়ে কেউ বীজ বপন করে, কেউবা হাল, লাঙল চালায় আবার কেউ ধান রোপণ করে। কেউ আবার গরু, মহিষ সেজে মাঠে ঢুকে আচমকা ধান ক্ষেতে বা গোলায় ঢুকে ধান চুরি করে খায়। আহারার দিনে গানের আসর বসে। গানের শেষে সেই বিপুল জনসমাবেশে বর্ষ বিবরণী বা গত বছরের কোন উল্লেখযোগ্য কিংবা গুপ্ত ঘটনাকে নিয়ে গান রচিত ও পরিবেশিত হয়। এই বিষয়টি গম্ভীরা উৎসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় ও চাঞ্চল্যকর।

'শিবের চাষ' অভিনয়ের মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষদের কাছে শিব যেন ঘরের মানুষ হয়ে ওঠে। দেবতা-শিব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। অভিনয়ের দ্বারা শ্রোতা, দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। নানা পুরাণ ও ধর্ম গ্রন্থের অলৌকিক জগত থেকে শিব আমাদের লৌকিক জগতের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। গম্ভীরা উৎসবের নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়েই 'শিবের চাষ' প্রসঙ্গটি জনসমাবেশে প্রচারিত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করে। এমনি করে এই সকল অনুষ্ঠান নিরক্ষর মানুষের কাছে আনন্দ ও শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি যুগে যুগে প্রচার করে আসছে। এইখানেই গ্রামীণ সমাজে সাক্ষরহীন জনতার কাছে উৎসবানুষ্ঠান ও সেই সব উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রচারিত নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো আমাদের পল্লীসমাজে প্রাচীন লোকমাধ্যম হিসেবে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একথা আমরা আগেই বলেছি যে শিবমাহাত্ম্য বর্ণনা ছাড়াও সামাজিক দুর্নীতি, গ্রামীণ সমস্যা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুক-রসিকতা

এবং বর্ষ-বিবরণী প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে লোক কবিগণ গম্ভীরা উপলক্ষে বিভিন্ন সঙ্গীত রচনা করে। উৎসবে দেবতা ও পশুপাখীর মুখোস পরে শিল্পীরা নৃত্য প্রদর্শন করে দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দেয়। তাই গম্ভীরা উৎসবের গানগুলি, লোক-সাহিত্য হিসেবে আজও তার নিজস্ব আসনকে সুদৃঢ় করে রেখেছে।

"...গম্ভীরা উৎসবে শৈবধর্মের মধ্য দিয়া গ্রাম্য কবির কবিত্ব-শক্তি বিকাশ পাইয়াছে। গম্ভীরার গীতগুলি গ্রাম্য কবিদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া অশিক্ষিত জনগণ হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও কবিত্বস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে দেশে গম্ভীরার মধ্য দিয়া কবিত্বের ও সাহিত্যের পুষ্টি ও কবি ও সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে।...গম্ভীরা এই মহৎ কার্যে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ফলে গ্রাম্য সাহিত্য ও কবিত্বের বিকাশ এবং উহার উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে।"[৯৩]

গম্ভীরা আঞ্চলিক গান হলেও, এই গান একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সেই অনুষ্ঠানে দলবদ্ধভাবে সমাজের লোক একই শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক এক দলপতির অধীনে কাজ করার সুযোগ সুবিধা লাভ করে। হরিদাস পালিত[৯৪] একে মাণ্ডলিক পদ্ধতি বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর অনুমান এই গম্ভীরা অনুষ্ঠানই মাণ্ডলিক পদ্ধতির প্রচলন করে দেশে পঞ্চায়েতি প্রথার বিকাশে সাহায্য করেছে। এই অনুমান থেকেই আমাদের মনে হয় যে গম্ভীরা উৎসবে সকলে মিলে একত্রিত হয়ে সমাজের হিত সাধন করতে চেয়েছে। "...আদিম সমাজে একের কোনো সত্তা নেই, একার পরিচয়টা নেহাতই ক্ষীণ। তারা দশে মিলে একসঙ্গে এক হয়ে যখন কিছু করে তখনই কাজটি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।...মনে রাখতে হবে দশজনে মিলে একই সঙ্গে একই কথা ভাবছে, একই কাজ করছে।..."[৯৫]

গাজনের মেলা ও উৎসব

গাজন বাংলার এক জনপ্রিয় উৎসব। এই গাজন উৎসব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন নীলপূজা, আদ্যের গম্ভীরা, ধর্মের গাজন এবং শিবের গাজন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে চৈত্রমাসের শেষ তিন দিন শিবের গাজন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মের গাজন বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। তবে অঞ্চল বিশেষে এই উৎসবানুষ্ঠানের সময় ও তিথির ভেদ দেখা যায়। যেমন বৈশাখ মাসের শেষ দিনে বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের শিবের গাজন এবং আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাঁকুড়ার বেলে তোড়ের ধর্মের গাজনের অনুষ্ঠান দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের গাজন, শিবের ও ধর্মের গাজন নামে পরিচিত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের[৯৬] মতে গাজন বাংলার একটা লৌকিক সূর্যোৎসব যার নাম গাজন এবং এই গাজনই এখন শিবের গাজন নামে অধিক পরিচিত। এই

প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য মনে করেন যে—শিব লৌকিক সূর্য দেবতা যিনি প্রাচীন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পিত হয়ে বাংলার কোথাও কোথাও 'আদ্য' নামে পরিচিত। এই সূত্রে আমরা বুঝতে পারি যে গম্ভীরা উৎসব শিব বা আদ্যের গাজনের সঙ্গে মিলে মিশে বিশেষ করে মালদহের শিবের গাজন 'আদ্যের গম্ভীরা' হিসেবেই প্রচলিত। তবে গম্ভীরা গানের সঙ্গে গাজন উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই। শিবের ও ধর্মের গাজনের সঙ্গে কৃষিকর্ম বা চাষের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। কারণ এইসব গাজন অনুষ্ঠানের ছড়াতে আছে শিবের চাষের প্রসঙ্গ। যেমন—

"বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস ।।
কার্পাস বুনিয়া শিব বুনিয়া গেল কুচনীপাড়া
... ...
গঙ্গা বুনিল সূতা মহাদেব বুনিল তাঁত।"
... ...[১৭]

গাজন উৎসবের নামকরণ সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন যে গাজন উৎসব জনসাধরণের উৎসব। ইতর ভদ্র সকলে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অতীতে গাজনের সন্ন্যাসীদের বিপুল চিৎকারে গাজন-তলা মুখরিত হয়ে উঠত। গীত-বাদ্য এবং ভক্তদের চিৎকারে সমবেত ধ্বনি একটা গর্জনে পরিণত হত। 'গর্জন' থেকেও গাজনের নামকরণের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে বলে অনেকের ধারণা। মূলতঃ গাজন উৎসব ছিল গ্রামের সর্বজনের উৎসব। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই গাজনকে বাংলা দেশের একটা জাতীয় উৎসব বলে অভিহিত করেছেন। 'জাতীয়' কথাটার প্রয়োগের দ্বারা আমাদের মনে হয় যে এই গাজনে সর্বশ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করে। উপরন্তু শিবপূজাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মত এই গাজনের যে জনপ্রিয়তা পরবর্তী কালে ঘটেছে, তার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে হয় যে গাজন বাংলাদেশের সর্বজনের উৎসব। কারণ শিবের গাজন, আদ্যের গাজন, নীলের গাজন এবং ধর্মের গাজন ইত্যাদির পরিচয় ও প্রচার লাভের মধ্যেই এই উৎসবের ব্যাপকতা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, সে-কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ক্রিয়াচার ও অনুষ্ঠান, উপবাসব্রত, কৃচ্ছ্রসাধনার কঠোর-কঠিন রীতি-নীতি এবং নানা ধরণের আচার, বিচার এবং সংস্কার।'

বিভিন্ন আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাংলার গাজন উৎসব শিব ও ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হলেও গাজন বাংলাদেশের একটা লোকোৎসব। 'গাজন' (গো-গ্রাম, জন-জনসাধারণ) কথাটার মধ্যেই বোঝা যায় যে আদিতে এই অনুষ্ঠান ছিল গ্রামীণ জনজীবনের উৎসব, অর্থাৎ লোকোৎসব। বিনয় ঘোষ[১৮] এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"ধর্মের গাজন গ্রামদেবতার লোকোৎসব।...তাঁর গ্রাম্যজনোৎসবের নাম

হয়েছে গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে।" গম্ভীরার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথমে সূর্য পূজা, পরে চড়ক ও ধর্মপূজা এবং সবশেষে আসে গম্ভীরার অনুষ্ঠান। চড়ক পূজাকে অনেকে আদি সূর্য পূজার নামান্তর বলে মনে করেন। চড়কগাছ ও চড়ক চক্র সূর্যের চক্রাকারে পরিভ্রমণকেই বোঝায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব-দুর্গার মহোৎসবই প্রকৃতপক্ষে চড়কের গাজন বা গম্ভীরা অথবা নীল পূজা নামে পরিচিত।

গাজন নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হরিদাস পালিত যে মন্তব্য করেছেন এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। শ্রীপালিত বলছেন ঃ

"বহু জনগণের চিৎকার, বিপুল বাদ্যোদম ব্যাপারে গর্জন উচিত, তাই বোধ হয় এই উৎসব কালক্রমে 'গাজন' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।"[৯৯]

এই প্রসঙ্গে 'আদ্যের গম্ভীরা'[১০০] গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে গাজনের আভিধানিক অর্থ হল শিবের উৎসব। সংস্কৃত 'গর্জন' শব্দ থেকে গাজন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'গর্জন' অর্থাৎ কোলাহল। সন্ন্যাসী ও ঢক্কাদির বাদ্যের কোলাহলে সম্পাদিত হয় বলেই এই উৎসব 'গাজন' নামে অভিহিত।

গাজন উৎসব যে প্রাচীন এবং এই অনুষ্ঠানে যে বিপুল কল-কোলাহল হত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে মাণিক গাঙ্গুলী যে 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য প্রণয়ন করেন তাতে গৌড়ে গাজন উৎসবের কথাও কবি উল্লেখ করেছেন ঃ

"গায়ে ছিল বাদ্যভাণ্ড তাতে দিল কাটী।
কোলাহলে কেঁপে গেল গৌড়ের মাটী"[১০১]

পরবর্তীকালে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর মঙ্গল কাব্যেও গাজন ও ধর্ম পূজার পরিচয় পাই। গৌড়ের রাজা ধর্ম পূজা করেছিলেন। কবি ঘনরাম বলছেন ঃ

"ধর্ম পূজে গৌড়পতি শুদ্ধমতি হয়ে।
ভক্তিযুক্ত মুক্তি আশে ভক্তগণ লয়ে।।"[১০২]

অথবা— "গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে।
শিরে ধর্ম পাদুকা সোনার চতুর্দোলে।"[১০৩]

প্রাচীন গাজন অনুষ্ঠান আজও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয়। অঞ্চল বিশেষে এইসব অনুষ্ঠানের নানা রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান আমাদের চোখে পড়ে। গাজন উৎসবের মাধ্যমে প্রাচীন প্রাগার্য ধ্যান-ধারণা আমাদের গোচরীভূত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে যে-সব গাজনের গান ছড়া গীত প্রচারিত হয় লোক-সাহিত্য হিসেবে সে-গুলোর মূল্য নিতান্ত কম নয়।

সুধীর করণের মতে গাজন উৎসব শিবের বিবাহ উৎসব রূপে সর্বত্র স্বীকৃত। উপরন্তু গাজনের সং বা ছো বা ছৌ-নাচের মধ্যে শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান একটা অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত। ভূতপ্রেত পরিবৃত হয়ে বিবাহের শোভাযাত্রায় শিবঠাকুরের নৃত্য ছৌ-নাচের একটা প্রধান আকর্ষণ।

"মধুমাসে শিবের গাজন কর পূজন দেব ত্রিলোচন
দ্বিতীয় বিবাহ শিবের অতি মনোরম
বুড়ো বরের মাথায় টোপর রূপে বারবার হলুদ দিয়ে গায়
শাঁখা শাড়ি আলতা দিয়ে কনেটি সাজাও
ঢাক ঢোল বাজনা করে শিবের বিয়ে দাও।"[১]

গাজন (বাঁকুড়া)

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এক্তেশ্বরের গাজন উৎসব উপলক্ষে একটা বড়ো মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির তিন দিন আগে থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে হোম-যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াচার সম্পন্ন হয়ে থাকে। সংক্রান্তির পূর্ব দিনে নীলের পুজো হয়। অনেকে মনে করেন যে এক্তেশ্বরের এই মেলাটি বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেলা। পূর্বে গাজনের দিন রাত্রে জ্বলন্ত চিতার মত অগ্নি প্রজ্বলন করে ভক্ত্যারা উৎসব করত এক্তেশ্বরে। এই উৎসবের নাম ছিল সতীদাহ উৎসব। সতীদাহ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে অতীতে সতীদাহের কুপ্রথা যে কি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল, এক্তেশ্বরের গাজন উৎসবে সেই সতীদাহের অনুকরণ ও অভিনয়ই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সামাজিক কু-প্রথা ও সংস্কারকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানিয়ে মানুষের মনে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবকে যুগ পরম্পরা ক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছিল এক্তেশ্বরের গাজন উৎসবে অনুষ্ঠিত ঐ অনুকরণমূলক সতীদাহ প্রথার অভিনয়।

বেগলার সাহেব[১০৫] আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে এক্তেশ্বর মন্দির দর্শন করে এই অঞ্চলের চড়ক ও গাজন উৎসব সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। বেগলার সাহেব লিখছেন ঃ

"...Every year the Charak Puja is observed at this Shrine with great enthusiasm. The festival or Parrab commences in the middle of the month of Chaitra. On the fourteenth day before the end of the month the *pat bhakta* as the chief devotee is called, shaves and prepares himself to live the life of an ascetic till the close of the festival...he daily takes out from the temple the *pat* or sacred seat, consisting of a wooden plank studded with iron nails and having an iron pillow, and bathes it in a neighbouring tank...on the 28th (or the 29th, if the

month has 31 days) on what is known as the *Phal bhanga* day, they eat nothing but fruit, and have by immemorial custom liberty to take fruit from any tree or garden they like. The next day, known as the *dadurghuta* day is the most important day of the festival, for it is the *Parab* or *Gajan* day. On this day a *mela* or fair is held···. The last (Sankranti) day of Chaitra was the set apart for *Charak* or Swinging······Early on the morning of the Sankranti day, a ceremony known as *agun Sannyas*, i. e. walking over burning charcoal took place···"

বাঁকুড়ার প্রাচীন বহুলাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রতি বছর ২০শে চৈত্র থেকে সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সুরু হয় জাগরণ পর্ব দিয়ে। ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা বংশানুক্রমে শিবের মন্দিরে ঢাক বাজায়। চৈত্র সংক্রান্তির শেষ পর্বে (২৬শে থেকে ২৮শে চৈত্র) সন্ন্যাস অথবা ভক্তেরা ব্রত গ্রহণ করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে নিচু শ্রেণীর লোকেরা এই ব্রত গ্রহণ করে। এখানে 'পাটভক্ত' অর্থাৎ প্রধান ভক্ত দুজন থাকে। এরাই বংশানুক্রমে ভক্তব্রত গ্রহণ করে। ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র পাট স্নান ও পাট পুজা হয়। এই 'পাট' হল করাতে-কাটা একটা প্রশস্ত তক্তা। এই তক্তাটা মাথা-মোটা লোহার পেরেক দ্বারা সুশোভিত। এই 'পাট'কে গাজন অনুষ্ঠানের একটা পবিত্র আসন হিসেবে ধরা হয়। এই 'পাট'কে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে স্নান করানো হয়। পাটের ওপর থাকে একটা লৌহ নির্মিত বালিশ। পাটভক্ত উৎসবের শেষ দিন পর্যন্ত কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে। এই ক'দিন পাটভক্ত হয়ে ওঠে এক কঠোর সংযমী তাপস। পাটভক্ত প্রতিদিন সেই পাটকে নিয়ে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে স্নান করায়। বহুলাড়া গ্রামের গাজন অনুষ্ঠানে দুজন পাট-ভক্তের সঙ্গে থাকে আরও দুজন রাজার ভক্ত। ২৮শে চৈত্র 'নাচন' ভক্ত নামে একদল ভক্তেরা নাচগান করে। এইদিন সকালে হয় 'ফল কাটা' অনুষ্ঠান। ইতিপূর্বে বেগলার সাহেব এক্তেশ্বর মন্দিরের গাজন অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই দিনটিকে 'ফল ভাঙা'-পর্ব বলে অভিহিত করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ভক্তরা ফল-মূলাদি ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করে না। এই ফলমূল সংগ্রহের ব্যাপারে ভক্তরা একটা সংস্কার মেনে চলে। ভক্তদের নিজস্ব ইচ্ছানুসারে তারা যে-কোনও ব্যক্তির ফলের গাছ বা বাগান থেকে ফলাদি সংগ্রহ করে আনে। চিহ্নস্বরূপ ফল গাছের মাথায় ভক্তরা কিছু আবির ছড়িয়ে দিয়ে আসে। এই আবির চিহ্ন দেখে বাগান বা বৃক্ষের মালিক বুঝতে পারে গাজনের ভক্তরা ফল চুরি করেছে। এইসব তথ্য জানা যায় 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা'[১০৬] নামক বৃহৎ গ্রন্থ থেকে। ২৮শে চৈত্র সন্ধ্যায় হয় 'গামির স্নান' নামে একটা অনুষ্ঠান। গ্রামের এক নির্দিষ্ট গামির-গাছতলায় গম্ভীরা পুজা হয়। মন্দির থেকে ভক্তসহ পুরোহিত এক দৌড়ে এই গাছতলায় এসে ঐ গামির গাছের

শাখা ভেঙে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে দেবী দুর্গার কাছে ঐ ভাঙা ডাল স্থাপন করে। রাত্রে 'রাণী ভাট' নামে আর একটা অনুষ্ঠানে নাচন ভক্তরা গোস্বামীদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে নৃত্য-গীতাদি পরিবেশন করে। এই সময় পাটভক্ত ও রাজার ভক্ত গৃহস্বামীর গলায় পূজার পবিত্র মালা পরিয়ে দেয়।

পরদিন অর্থাৎ ২৯শে চৈত্র 'বাণফুড়া' বা 'বাণকাটা' পর্ব। এই 'বাণফুঁড়া' বা 'বাণকাটা' পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আত্ম নিগ্রহমূলক এক ভীষণ অনুষ্ঠান। রাত্রিশেষে সকল ভক্তরা তীক্ষ্ম লৌহ শলাকা সর্বাঙ্গে বিন্ধ করে বাজনা বাদ্য ও নৃত্য সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এইসব লৌহ শলাকাগুলো পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপূতঃ করে কামারের দ্বারা ভক্তদের শরীরে বিন্ধ করা হয়। অশোক মিত্র সম্পাদিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ[১০৭] থেকে জানা যায় যে বর্তমান ভেটিয়া পাড়া (বাঁকুড়া) গ্রামের 'নিমাই কর্মকার পুরুষানুক্রমে বাণ ফুঁড়ার কাজ করছে'। এই বাণফোঁড়া, পিঠফোঁড়া সম্পর্কে সুধীর করণের মত হল যে এইসব আত্মনিগ্রহমূলক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে প্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতিকে মনে করায়। গাজন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সুধীর করণ আর একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে পূর্ব ধলভূম ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে শিবের গাজনোৎসবে 'কামিনী' অর্থাৎ কামশক্তি শিবের সঙ্গে অধিষ্ঠিতা থাকেন। এই 'কামিনী'কে কেউ কেউ বলে 'কামিনা'। বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলের গাজন অনুষ্ঠানে এই 'কামিনা'কে দেখা যায় না। ধলভূম, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর অঞ্চলের গাজনোৎসবে শিবের সঙ্গে 'কামিনা'র অধিষ্ঠান উৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অঞ্চলে কোথাও আবার গাজনে 'কামিনা-ঘট' স্থাপন করা হয়। তাঁর আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে এই 'কামিনী' হল পার্বতী।

"বিষম পাপেতে মুক্তি দিতে জীবগণে
কামিন্যা রূপেতে রব ধর্মের গাজনে।"[১০৮]

ধলভূমের গাজনে কোন কোন অঞ্চলে 'কামিনা-ঘট'কে মাথায় বহন করে পাটভক্ত যে পথ দিয়ে আসে সেই পথের উপর একটা মুরগীর ডিম ভেঙে ফেলা হয় অথবা ভাঙা ডিম সেই পথের মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করে রাখা হয়। অর্থাৎ গাজনের ভক্তগণ সেই রাস্তাকে মাড়িয়ে আসে। এটা ভক্তদের একটা সংস্কার। এ প্রথা নিঃসন্দেহে অহিন্দু জাতীয়। শক্তিরূপিণী কামিনার নিকট হয়ত প্রাচীন কালে বলিপ্রথা চালু ছিল। এই ডিম ভাঙা প্রথা যেন সেই প্রাচীন স্মৃতিকে বহন করে আছে। ব্রাহ্মণদের কাছে তাই এই 'কামিনা-ঘট' হিন্দু-দেবীর পূর্ণ মর্যাদা পায়নি। ব্রাহ্মণরা 'কামিনা-ঘট'কে স্পর্শ করে না। তাই কামিনা আজও অন্ত্যজা। পূর্ব ধলভূমের ধর্মের গাজনে সাধারণতঃ এই 'কামিনা-ঘট' স্থাপন, মুরগীর ডিম ভাঙা এবং মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করা প্রভৃতি তথ্য 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান'[১০৯] গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত আছে। এই গাজন অনুষ্ঠান যে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি ময়ূর ভট্ট[১১০] তাঁর কাব্যে শ্বেতাই পণ্ডিত কর্তৃক যে গাজন অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছিল সেই তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই শ্বেতাই পণ্ডিত অবশ্য ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

"পূর্বে সত্যকালে ব্রাহ্মণের কুলে
শ্বেতাইয়ের জন্ম হোল
ব্রহ্মাংশ সম্ভূত শ্বেতাই পণ্ডিত
গাজন প্রকাশ কৈল।"[১১১]

বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামের ধর্মরাজের গাজন উৎসব এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে প্রতি বছর রথযাত্রার পরে যে পূর্ণিমা হয় অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে তিনদিন ব্যাপী এই ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্টোরথের দিন পাটভক্ত নির্বাচন করা হয় কামার-কুমোর সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে। ধর্মরাজের পাটে প্রতি বছর একটা করে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। বেলিয়াতোড়ের ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসব সুরু হয় পূর্ণিমা তিথি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এখানেও হয় ভক্তদের বাণফোঁড়া পর্ব। বাণফোঁড়া পর্বে নানা প্রকার বাণ ভক্তদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে বাণফোঁড়া পর্বের ব্যাপকতা পূর্বের থেকে অনেক হ্রাস পেয়েছে। কারণ পূর্বে এই বাণফোঁড়া অনুষ্ঠান ভয়াবহ আকার নিত। এরূপও শোনা যায় যে এইসব অনুষ্ঠানে কখনও কখনও কোন ভক্তের দুর্ঘটনাও ঘটে যেত। 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান'[১১২] গ্রন্থে মেদিনীপুর জেলাস্থিত 'চোর চিতা' গ্রামের আদিবাসীদের বাণফোঁড়া পর্বের যে ভয়াবহ ও বীভৎস বর্ণনা আছে তা থেকেই মনে হয় যে এইসব অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কোন কোন সময় পিঠফোঁড়া, বাণফোঁড়া অনুষ্ঠানে ভক্তের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেত।

গাজন উৎসব (বীরভূম)

বীরভূমের নানা স্থানে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের পূজা ও অনুষ্ঠান পালিত হয়। কোন স্থানে আষাঢ় বা শ্রাবণ পূর্ণিমায় ধর্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাটির ভাঁড় আর পুষ্পমাল্য সহকারে ধর্মতলা সাজানো হয়। এই অনুষ্ঠানে আগুন খেলা, ফুল খেলা, কাঁটা খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের নৃত্য প্রদর্শন এই উৎসবের আর এক অঙ্গ। ধর্মরাজের মাথায় ভক্তরা পদ্মদান করে। এরপর ভক্তরা ভাঁড় মাথায় করে দাঁড়ায়। ভাঁড়ের ভিতরকার ফুলটা মূল দেয়াসীকে দেওয়া হয়। বীরভূম অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রধান পূজারীকে 'দেয়াসী' অথবা 'দেবাংশী' বলে। বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবশ্য প্রধান ভক্তকে বলা হয় পাটভক্ত। সেখানে পাটকে সাজানো ও মাথায় বহন করার প্রথা আছে। কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে 'ভাণ্ড' বা ভাঁড় মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী নদীতে বা

পুষ্করিণীতে। এই ভাণ্ড পুষ্পদ্বারা সজ্জিত থাকে। বীরভূমের ধর্মঠাকুরের উৎসবে সঙ্-শোভাযাত্রা আর একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। এই সঙ্-শোভাযাত্রার সময় কোন ভক্তের ভর হয়। এই ভর হওয়া প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলছেন ঃ

"শোভাযাত্রার সময় রাস্তার মধ্যেই কয়েক পদ অন্তর এক একজন ভক্ত্যা ধরে তাঁর নাকে প্রচুর পরিমাণে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপবাসী ভক্ত্যা মূর্ছা যান। সেই অবস্থায় তাঁকে ধরাধরি করে ধর্মরাজতলায় আনা হয়—বলা হয় 'ধর্মরাজের ভর হয়েছে'।...[১১৩]

বর্তমানে এই সব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত নিযুক্ত হলেও অতীতে অব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাই এইসব উৎসবানুষ্ঠানে ভক্ত হিসেবে অংশ গ্রহণ করত। তারা হল হাড়ি, ডোম, বাউরি, ধীবর, তন্তুবায়, কর্মকার প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। বীরভূমে প্রস্তর খণ্ডই ধর্মরাজের বিগ্রহ বা প্রতিমূর্তি। অবশ্য বীবভূমের কোন কোন অঞ্চলে ধর্মরাজের কূর্ম মূর্তিও দেখা যায়।

ধর্মঠাকুর বা **বুড়োরাজের গাজন** (বর্ধমান)

অতীতে বর্ধমানের জামালপুরে বুড়োরাজের উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত। বুড়ো শিবের 'বুড়ো' আর ধর্ম রাজের 'রাজা', এই দুয়ে মিলে 'বুড়ো-রাজ'। এই বুড়ো-রাজের উৎসব হয় বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায়। এই উপলক্ষে একটা বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হত। পূর্বে বুড়ো-রাজের পূজাতে নানা পশু-পক্ষী বলি হত। বুড়ো-রাজের পূজায় যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তার মাঝখানে একটা রেখা টানা থাকে। বিনয় ঘোষের[১১৪] মতে এই নৈবেদ্যের অর্ধেক হল শিবের আর বাকি অর্ধেকটা হল ধর্মরাজের। তাই বিনয় ঘোষ মনে করেন 'শিব' এবং 'ধর্ম' এই দুই অস্তিত্ব বুড়ো-রাজের একই অঙ্গে শোভিত। মনে হয় এর মধ্যে দিয়েই দুই সংস্কৃতির মিলন সূচিত। ধর্ম-ঠাকুরের আকৃতি ও স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে সুধীর করণ বলেছেন যে ধর্ম-ঠাকুরের সঙ্গে সূর্য, যম, বরুণ, শিব প্রভৃতি দেবতার নাম একই সূত্রে গ্রথিত। কালক্রমে ধর্ম শিব-ঠাকুরের সঙ্গে একীভূত। তাই ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রকারান্তরে একই। যদিও অঞ্চল ভেদে দুই গাজনের ভিন্ন আচার ও ক্রিয়ারীতি চোখে পড়ে। সিউড়ির ধর্মঠাকুরের উৎসবে ভক্তেরা পুষ্পশোভিত ভাঁড় মাথায় করে দাঁড়ায়। ভাঁড়ের ভিতর পিটুলি গোলা থাকে। বিনয় ঘোষের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পূর্বে ঐ ভাণ্ডে মদ্য রাখা হত। বর্তমানে সেই মদ্য পরিণত হয়েছে পিটুলি গোলায়। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে— ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিতে আর্য ও অনার্য, বৈদিক এবং পৌরাণিক এই উভয় পদ্ধতির এক সমন্বয় হয়েছিল। একসময়ে এই ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর কালে এই পূজা রাঢ়

অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সুকুমার সেন স্বীকার করেছেন যে—একাধিক 'আর্য' ও অনার্য দেবতা মিলে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব। আদিতে ধর্মঠাকুর ছিলেন ডোম জাতির দেবতা। সেইজন্যে ডোমেরা ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ছিল। সুকুমার সেনের এই অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে বীরভূম অঞ্চলের সিউড়ী, তাঁতিপাড়া, ঈশ্বরপুর, বড় সাংড়া, বেলে প্রভৃতি স্থানে পূর্বে ধর্মপূজায় অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের প্রধান অধিকার ছিল। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণেরা আপন অধিকারে পূজারী নিযুক্ত হয়েছে। সুকুমার সেন বলছেন ঃ

"...যেখানে ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণু হয়ে গেছেন সেখানে পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করেছে। ধর্মঠাকুরের আদিম পূজায় মদ্য মাংস পিষ্টক ইত্যাদি রাশীকৃত নৈবেদ্য (মদ্যের পুষ্কর্ণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল)' এবং শূকর বলি দেওয়া হত। এখন সচরাচর হাঁস, পায়রা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। ক্বচিৎ গাজনের সময় ধর্মঠাকুরকে মদে স্নান করায় এবং শূকর বলি দেয়। নৈবেদ্যে গুড়পিঠাও দেওয়া হয়। ধর্মের গাজনে দেয়াসীরা মুখোস পরে মৃতদেহ ও মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য-গীত করত। উত্তর রাঢ়ের কোন কোন স্থানে এ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। এই নাচকে বলত "পাতা-নাচ" অর্থাৎ পাত্র-নৃত্য। ধর্মঠাকুরের এইরকম পূজাকে লক্ষ্য করেই বোধহয় বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন 'মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে'।..."[১১৫]

ধর্মঠাকুর ঃ ঐতিহাসিক তথ্য

এই আলোচনা থেকে আমাদের অনুমান হয় যে গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুরকে ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজের শিবঠাকুর কেমন করে আত্মসাৎ করেছেন তার প্রমাণ জামালপুরের বুড়ো-রাজ। অনেকে মনে করেন যে এই উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমাতেই ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই এই দিনটা বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র দিন। তাহলে কি একথা অনুমান করা চলে যে প্রাচীন কালের আর্য-বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আশ্রয় করে রাঢ় বাংলায় ধর্ম ও শিবের পূজায় উভয় পদ্ধতির কোন সমন্বয় ঘটেছিল। সুকুমার সেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[১১৬] মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে ধর্মঠাকুর হল বৌদ্ধমতের ধর্ম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করতেন যে ধর্মঠাকুরের প্রতীক হল বৌদ্ধ চৈত্যেরই রূপান্তর। তাই ধর্মপূজা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি। সুকুমার সেনের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি মনে করেন যে ধর্ম নামটি বৌদ্ধধর্ম থেকে গৃহীত হতে পারে, কারণ বাংলাদেশে মহাযান-মতে লোকনাথ ও ধর্ম একীভূত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীসেনের মতে ধর্ম শব্দটা কোন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপও হতে পারে। ধর্মঠাকুরের ধ্যানে ধর্ম শূন্য মূর্তি রূপে কল্পিত। এই শূন্য বৌদ্ধ মহাযান-মতের শূন্য নয়। এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক এবং শুভ্র। শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'Obscure

Religious Cults'[১১৭] গ্রন্থে শূন্যপুরাণের যে বিবরণ আছে সেই বিবরণের সঙ্গে ধর্ম পূজাবিধানের বেশ মিল দেখা যায়। শুধু পার্থক্য হল যে ধর্ম নিরঞ্জন, নিরাকার পরমব্রহ্মের ভিতর থেকে আলোকময় দেহরূপে সেই মহাশূন্যে নিরঞ্জন প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই তিন গুণকে নিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করতে অনুরুদ্ধ হন। এই নিরঞ্জন হল সেই নিরাকারের এক সাকার সত্তা। শূন্যপুরাণে পূর্বোক্ত ঐ তিন গুণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হিসাবে বর্ণিত। গাজনের গানেও আমরা বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। হরিদাস পালিতের 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থের অন্তর্গত একটা গানে আছে যে গোঁসাঈ (Lord) অনন্ত মহাশূন্যে নিরাকার শূন্য রূপে বিরাজমান ছিলেন। সেখানে জল ছিল এবং সেই জলে শূন্যরূপে প্রভু ভাসমান ছিলেন। প্রভু তখন একটা কাঁকড়াকে বললেন ঐ জলে ডুব দিয়ে জলের তলা থেকে মাটি আনতে। কাঁকড়া মাটি নিয়ে এল। এই প্রসঙ্গে দুটো মত আছে। একটা মত হল কাঁকড়ার দ্বারা আনীত মাটি দিয়ে প্রভু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন ও কচ্ছপের পিঠে ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপন করলেন। অন্য মত হল যে কাঁকড়ার দ্বারা তুলে আনা মাটি ছিল স্বর্ণমৃত্তিকা। প্রভু সেই স্বর্ণ-মৃত্তিকা দিয়ে একটা ডিম্ব সৃষ্টি করলেন। অচিরে সেই ডিম্বাকৃতি বস্তুটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, যার একটা ভাগে রইল আকাশ অন্যভাগে মৃত্তিকা প্রদেশ। এর পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এই দ্বিতীয় তথ্যটি আমরা পাই শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থে। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলা থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক কিছু ছড়া ও গান সংগ্রহ করেন। চৈত্রের শেষে নীল পূজা উপলক্ষে ঐ সব অঞ্চলে এই ছড়া ও গান গীত হয়। শূন্যপুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি-তত্ত্ববিষয়ক কাহিনীর সঙ্গে এইসব ছড়া ও গানের কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন একটা ছড়ায় আছে যে নিঃসঙ্গ প্রভু একবার ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েন। তখন চারিদিক ছিল মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত। স্রষ্টার ঘর্ম থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হল।...ছড়াটি এইরূপ—

"হেতু বুদ্ধি না ছিল গগন মণ্ডল
নাহি জল নাহি স্থল বাহিরে স্থাপন
ভিতর বাহির নাহি কেবল একেশ্বর
... ... কর্ম ঘর্মে ভিজিলা
চিতাইয়া নক্ষত্র
এইরূপ সৃষ্টি হইল বিশ্বম্ভর..."[১১৮]

নীল গাজনের আর-একটা গানে আছে যে ধর্মরাজ তাঁর বাহন উলুকে চড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েন। সেই ঘর্ম থেকে একটা ছায়ার সৃষ্টি হল। সেই ছায়া জাদুমন্ত্রের দ্বারা এক যুবতীতে রূপান্তরিত হল। সম্মুখে দণ্ডায়মান যুবতীকে দেখে প্রভু তার প্রতি আসক্ত হয়ে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তরুণী যখন দেখল যে তাকে যে সৃষ্টি করেছেন

অর্থাৎ সেই স্রষ্টা বা পিতা লজ্জাহীন ভাবে অবৈধ প্রেমে অস্থির ও বিচলিত চিত্ত, তখন কন্যা পশ্চিম দিকে ধাবিতা হল। কারণ কন্যার কাছে পিতার এই চিত্ত বৈকল্য অত্যন্ত অবৈধ ও অস্বাভাবিক ঠেকল। কিন্তু তরুণী কন্যাকে বরণ করার জন্যে উন্মত্ত পিতা তার প্রতি পুনরায় অতি বেগে ধাবিত হলেন। প্রাসঙ্গিক গানটি এইরূপ—

"আইলা রে ধর্মরাজ উলাসে (উলুকে ?) চড়িয়া
উলাসে বসে শুঙ্গ ঘামিলা
ছায়ায় আছিলা কন্যা মায়াতে জন্মিলা
পিছে আছিলা কন্যা সুমুখে দণ্ডালা
তাহা দেখিয়া ধর্ম চিত্ত ধরণ না যায়
পশ্চিম দিকে কন্যা ধাওয়াইয়া যায়
এতেক শুনিয়া দেবী বলিলা উত্তর
বাপ হইয়া ঝিরে করতে চায় বর।"[১১৯]

বিভিন্ন পণ্ডিতগণের আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয় যে বৌদ্ধধর্ম এদেশে নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়ে বিকৃত ও অরুচিকর অবস্থায় পর্যবসিত হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধরাজা ও সাধুসন্তগণের মহিমা কীর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু হিন্দুর দেব-দেবীর প্রভাবে পড়ে পরবর্তী কালে বৌদ্ধ প্রভাব ও ধ্যানধারণা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণের দ্বারা বৌদ্ধ শ্রমণগণ শুধু প্রভাবিত হন নি, পরাভূতও হন। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতায় এসে দেবলীলা জ্ঞাপক হয়ে উঠল। আমাদের অনুমান যে ধর্মপূজা ও গাজনোৎসবে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধধর্মের অপসৃয়মান ছায়া যেন আজও আমরা দেখতে পাই। সেইজন্যে বাঙালী সমাজের নীলপূজা, চড়ক ও ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান হল নিম্ন সমাজের বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান। সেসকল অনুষ্ঠানের মধ্যে অপৌরাণিক এবং অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাব আছে বলে আমাদের অনুমান। অনেকের মতে আবার পৌরাণিক ও বৈদিক দেব-দেবীর ধারণা থেকে যে দেবতার উদ্ভব হল তার নাম ধর্মঠাকুর। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর Obscure Religious Cults গ্রন্থে শূন্যপুরাণে বর্ণিত বিশ্বের উৎপত্তি ও সৃষ্টিতত্ত্ব-মূলক যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত বিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদের যথেষ্ট মিল আছে। শূন্যপুরাণে এই নিরঞ্জন অথবা ধর্ম একই। যার বাহন হল উল্লুকা পাখি। মহাশূন্যে স্থিত প্রভুর দুঃখবোধ থেকে যে শক্তির সৃষ্টি হল তিনিই নিরঞ্জন বা ধর্ম। এই ধর্ম নিঃসঙ্গ একক এবং স্বয়ম্ভূ। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে ধর্ম এক অর্থে বুদ্ধ আবার হিন্দুপুরাণের মতে যম। "তখন ধর্ম নামটিকে বৌদ্ধসমাজ বুদ্ধ এবং হিন্দুসমাজ যম পরিকল্পনা করিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল তখন ধর্মঠাকুরের বুদ্ধ পরিকল্পনাও হিন্দু পরিকল্পনার মধ্যে আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল ; সেইজন্য

ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক বিষ্ণু কিংবা যম বলিয়া কল্পিত হইয়া নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত হন।"[১২০]

ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজন এবং চৈত্র মাসের নীল ও চড়ক পূজাকে নীহাররঞ্জন রায় বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরের বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান বলে মনে করেন। তাঁর মতে এগুলো হল অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক এবং অব্রাহ্মণ্য সূচক ধর্মানুষ্ঠান। তাঁর মতে মালদহের গম্ভীরার পূজা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের শিবের গাজন চড়ক পূজারই বিভিন্ন রূপ ও প্রকারভেদ। ধর্মঠাকুর সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলছেন ঃ

"কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ মতের 'ধর্ম' বলিয়া মনে করিতাম এবং এই পূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সম্প্রতি নানা গবেষণার ফলে আমরা জানিয়াছি ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।[১২১]

'বাঙ্গলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত হল যে রাঢ় অঞ্চলের ডোম সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত দেবতাটিকে রাঢ়ের নবাগত বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং হিন্দু বসতিস্থাপনকারীগণ ডোমরায় বলে অভিহিত করেছিল। ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণ নিয়মানুসারে 'ডোমরায়' ধর্মতে পরিণত হয়েছে। তাই—

"ধর্মপূজা হল সূর্য পূজারই প্রকারান্তর এবং ধর্মঠাকুর হিন্দু পৌরাণিক প্রভাবে আসার পর কূর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন; অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার কূর্ম—..."[১২২]

রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ডোম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই সূর্য দেবতার আর্যেতর নামটির বদলে 'ধর্ম' নামটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়। ধর্মপূজার মন্ত্রে সূর্যকে তাই বলা হয়েছে 'শূন্যদেহ'। রাঢ় বাংলায় ধর্মঠাকুরের প্রতীক হিসেবে কোন প্রস্তর নির্মিত কূর্ম-বিগ্রহ কিংবা কূর্মাকৃতি পাষাণ মূর্তিকে পূজা করা হত। এই কূর্ম-বিগ্রহের পিঠে যে পাদুকা চিহ্ন আঁকা থাকত তার দ্বারা অনুমান করা হত যে এ পাদুকা স্বয়ং ধর্মঠাকুরের। অতএব সাধারণের ধারণা হত যে ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক ঐ পাদুকাচিহ্ন।

ধর্মঠাকুরের গাজন-উৎসবে নাচ-গান, ছড়া কাটাকাটি চলে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল "কালিকা-পাতা" বা "কালী-কাচ" নাচ অর্থাৎ কালী-বেশে নৃ-মুণ্ড হাতে নিয়ে নৃত্য। রাত্রিতে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। মন্ত্রপূত কালীর মুখোশ নৃত্যশিল্পীর মুখে বেঁধে দেওয়া হয়। ঢাকের বাজনার তালে তালে নৃত্য চলে। কালী এই সময়ে আসরে নেমে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহ চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য প্রদর্শন করে। এই কালীনৃত্যকে "কালীকাচ"-নৃত্য বলা হয়। সুকুমার সেনের মতে এই "কালিকা-পাতা" নাচ-ই হল "কালীকাচ" নাচ। এই নাচের মধ্যে হয়ত প্রতিফলিত হয়ে ওঠে প্রাক্-আর্য যুগের কোম আদিবাসীদের লুপ্তপ্রায় কোন প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন।

(গ) বাংলার আঞ্চলিক লোক উৎসব ও গীতানুষ্ঠান

ভাদু উৎসব

মানভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান (পশ্চিম) ও বীরভূম অঞ্চলের মেয়েরা ভাদু গান গেয়ে এই উৎসব পালন করে। একটি কিংবদন্তী এই উৎসবের নেপথ্যে প্রচলিত আছে। সেই কাহিনী হল ভাদু গানের মূল বিষয়। এই কাহিনীর প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

ভাদ্র মাসে নিশি জাগরণ করে কুমারী মেয়েরা ভাদু প্রতিমার সামনে ভাদু গান করে। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে ভাদু প্রতিষ্ঠা এবং সংক্রান্তির দিন ভাদু প্রতিমার বিসর্জন হয়। ভাদু উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল গান। এই গান আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন আগমনী গান, বন্দনা গান, জাগরণ গান, বিবাহ, বাসর, মানভঞ্জন প্রভৃতি। কখনও কখনও গান রচিত হয় মুখে মুখে। গানের মাধ্যমে চলে বাদ-প্রতিবাদ। সামাজিক রঙ্গ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও দুর্নীতি প্রসঙ্গেও গান রচিত হয়। এ পাড়ার ভাদুকে নিয়ে ও পাড়ার ভাদুর মধ্যে চলে রূপ বর্ণনার প্রতিযোগিতা। যেমন—

"তোদের ভাদু অন্যমুখী লো ভেবে দেখ মনে মনে
তোপড়া গাল, চ্যাপটা মুখ পান্তাখাকী তার সনে ॥"[১২৩]

কুমারী এবং সদ্য বিবাহিতা রমণীরা ভাদু গানে অংশ গ্রহণ করে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ভাদু গান রাঢ় অঞ্চলের বর্ষাকালীন সঙ্গীত। তিনি মনে করেন যে যদিও ভাদু অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটা জনশ্রুতি মূলক কাহিনী-মিশ্রিত আছে, কিন্তু এই কাহিনী যুক্ত হবার পূর্ব থেকেই ভাদু গান মানভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে প্রচলিত ছিল। ভাদু গানে ব্যক্তি জীবনের নানা সুখ দুঃখ প্রতিফলিত হয়। কুমারী জীবনের আবেগ-অনুভূতি এই গানের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একদিকে ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষা অন্য দিকে কুমারী মনের কোন ব্যথা-বেদনার এক তীব্র বহিঃপ্রকাশ। ভাদ্রের মুখর বর্ষাকে কেন্দ্র করেই কুমারী মনের এক দুর্নিবার আবেগানুভূতির প্রকাশ ঘটে ভাদু গানের মধ্যে। আসন্ন শাশুড়ী-ননদী সম্পর্কে আশঙ্কার প্রকাশ করে ভাদু গানে বলা হচ্ছে ঃ

"হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখ না,
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।
কলঙ্গাতে চাবি ছিল, হলুদ বল্যে মেখেছি
ও শাশুড়ী গাল দিও না পাশা খেলতে বসেছি।"[১২৪]

কুমারীরা সমবেতভাবে ভাদু গান করে। ভাদু প্রতিমার সামনে থাকে পূজার সামান্য আয়োজন। সেই প্রতিমাকে ঘিরে কুমারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা-

প্রসূত বাস্তব সত্যটা কখনও ব্যথা-বেদনায় অধীর আবার কখনও বা আনন্দের আতিশয্যে উদ্বেলিত।

ভাদু উৎসব (মানভূম)

ভাদু উৎসবের সঙ্গে যে কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে তা এইরূপ ঃ

আনুমানিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মানভূম জেলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক প্রতাপশালী রাজার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। কিন্তু সেই কন্যাটি যৌবনপ্রাপ্তা হবার পূর্বেই আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভাদুরাণীর অকাল বিয়োগে রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিমর্ষ নীলমণি শোকে, দুঃখে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েন। তিনি তখন ঘোষণা করেন যে ভাদুরাণীকে পূজা-উৎসবের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা হোক। "...উৎসবের মধ্যে দেবী করা হোক ভাদুকে। সমস্ত রাজ্যের দেবী-কন্যা হয়ে সকলের বুক জুড়ে সে থাকুক।...ভাদু আজ রাজপ্রাসাদের ভদ্রেশ্বরী নয় ; সে আজ ভাদুরাণী, ভাদু মণি, প্রত্যেক ঘরের আদরিণী কন্যা।"[১২৫] এই কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য[১২৬] বলেছেন যে রাজা নীলমণি সিংহ তাঁর রাজ্যে প্রচার করেছিলেন যে ভাদু-রাণীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে ভাদ্র মাসে পল্লীতে পল্লীতে ভাদু মণির নামে পূজা ও উৎসব পালিত হবে। প্রজাগণ সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত রাজার আদেশ শিরোধার্য করে রেখেছে। এমনি করেই ক্রমে ক্রমে মানভূম থেকে বাঁকুড়া, বর্ধমান থেকে বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ভাদু উৎসবের প্রচলন হল। শ্রীভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন যে কাশীপুর রাজপরিবারের এই বিবরণটি ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু—"...যে মৃৎ প্রতিমা কেন্দ্র করিয়া কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাস ব্যাপিয়া স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহার জড়রূপ যে কবে ঘুচিয়া গিয়া তাহা অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কেহ অনুভবও করিতে পারে নাই ; সেইজন্য তাহার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কুমারী-হৃদয়ে আজ রিক্ততার হাহাকার দেখা দিয়াছে—

ভাদু, বিধুমুখী।
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি ॥
বিদায় কথা শুনে তোমার গো, অবিরল ঝরে আঁখি ॥
... ..."[১২৭]

এইভাবে ভাদুরাণীর কাহিনী থেকে এল ভাদু-উৎসব। পল্লীর লোক-কবিরা ভাদু-উৎসবকে নিয়ে গান লিখতে সুরু করল। সৃষ্টি হল ভাদু গান। লোক-কবিদের দ্বারা ভাদু-লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হবার পর পূজা ও উৎসবের মাধ্যমে তা প্রচার লাভ করল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে ভাদু বিষয়ক লোক সঙ্গীত সৃষ্টি হল ব্যাষ্টিমনের দ্বারা। তারপর সেই গান প্রচারিত হল পূজা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে (medium)। অনূঢ়া কন্যারাই হল এখানে

শিল্পী। তারাই প্রচারকারিণী (communicator)। সমবেতভাবে সমষ্টি মনের ভেতর দিয়ে ভাদু গান লোক সমাজের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যষ্টি মন থেকে সৃষ্টি হয়ে তা ধীরে ধীরে সমষ্টির সৃষ্টিতে (Group Product) পরিণত হল। এইভাবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের মধ্যে উৎসবের এই গান নদীর মত প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে চলে।

ভাদু (বীরভূম ও বাঁকুড়া)

বীরভূমের ভাদু উৎসব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাদ্র মাসের ভাদু উৎসবের সাড়া পড়ে যায় বীরভূমের গ্রামে গ্রামে। আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগের একটা বর্ণনা থেকে বীরভূমের ভাদু উৎসবের একটি চিত্র পাওয়া যায়ঃ

"নানা রঙ্গে ও রেখায় আঁকা, রঙ্গীন কাপড় ও জামায় সাজানো মাটির একটি সুন্দর-স্ত্রী-মূর্তি নিয়ে দল বেঁধে পুরুষেরা ভাদু নাম দিয়ে নানাপ্রকার গান শোনায়। গানের বিষয়বস্তু হল ভাদু নামে এক রাজকুমারী। মাটির স্ত্রী মূর্তিটি হল সেই ভাদুরই প্রতীক। গানের দলে একজন থাকে নেতা। সে মুখে গান বানায় কিম্বা পুরানো জানা গান গায়। গানের এক লাইন গেয়ে শেষ করলেই দোঁহাররা সেই লাইনটি পুনরুক্তি করে। সঙ্গে বাজে এ দেশী ঢোল ও কাঁসি। একটি ছেলেকে ঘাগরা পরিয়ে মেয়ে সাজায়। তার কাজ হল এ অঞ্চলের ঝুমুরীদের ঢং-এ কোমর দুলিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গিতে গানের ও ঢোলের তালে নেচে যাওয়া। এ কিন্তু অভিনয়ের নাচ নয়। সম্পূর্ণরূপে তালের নাচ।...[১২৮]

বাঁকুড়া জেলার ভাদু উৎসবের যে পরিচয়[১২৯] পাই তাতে দেখি যে—বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থ ঘরের কুমারী মেয়েরা এবং গণিকারা কেবলমাত্র এই উৎসব পালন করে। শহরের ছুতোর-শিল্পীরা ভাদু উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকারের অসংখ্য ভাদুমণির মূর্তি গড়ে বাজারের দোকানে দোকানে বিক্রয় করে থাকে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভাদু উৎসব উপলক্ষে যেমন ভাদু গান রচিত, গীত ও প্রচারিত হচ্ছে তেমনি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্প-সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটেছে। সন্ধ্যার পর বাঁকুড়া জেলার অনেক গ্রামে বাজনা-বাদ্যি সহকারে শহরের গণিকারা নাচতে নাচতে ভাদুর জল সইতে যায় এবং 'ভাদু জাগরণ' উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহ নিশি জাগরণ করে। এ-ছাড়া ভাদুমণিকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়াকাটার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানটিও বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ভাদুকে নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি এক তীব্র উত্তেজনাকর অবস্থায় পর্যবসিত হয়। প্রতি বছর বাজারে নূতন নূতন 'ভাদু সঙ্গীতে'র ছোট ছোট পুস্তিকা বিক্রয় হয়। ছেলেরা সঙ সেজে অথবা ছেলেরা মেয়ে সেজে পল্লীতে পল্লীতে ভাদু গান গেয়ে বেড়ায়। সালে রচিত বাঁকুড়ার একটি ভাদু গানের নমুনাতে দেখতে পাই যে এক ভাদুকে নিয়ে আর এক প্রতিবেশিনী কর্তৃক ভাদুর নিন্দা—

"ছি, ছি, তোদের ভাদুটা কাল।
মনে হয় যে আড়াচে তোলা ছিল ॥
যেমন আশী বছরের বুড়ি লো, জাতিতে বাগদী মাল।
দরাঘাটা, খেয়ে বুঝি কাপড় হয়েছে অসামাল।"[১৩০]

একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাংলার গ্রাম স্বকীয় ঐতিহ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাদু উৎসবকে মাধ্যম করে অনুষ্ঠান নির্ভর লোক-সঙ্গীত, কিংবদন্তীমূলক কাহিনী প্রচার লাভ করে। এই শ্রেণীর লোক-সাহিত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীর লোক-সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্য যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি নানা জাতি, উপজাতি সমূহের ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটে এইসব পূজা, অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে—ছোট নাগপুরের আরণ্যক অঞ্চলে আদিবাসীরা যখন বর্ষা উৎসবের 'করম'-সঙ্গীতে মুখরিত হয় ঠিক তখনই মানভূমের কুমারী কন্যারা ভাদু গানে মেতে ওঠে। ভাদ্র মাসের এই গীতোৎসব হিন্দু প্রভাব-বশতঃ ইদানীংকালে ভাদু পূজায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু আসলে এই ভাদু অনুষ্ঠান আদিবাসীদের করম-উৎসবেরই একটা হিন্দু সংস্করণ। আদিবাসীদের করম হল বর্ষাকালীন উৎসব। ভাদু উৎসবেরও সূচনা হয় ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে। শ্রীভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"...আদিবাসীর 'করম' বৃক্ষের শাখাই হিন্দু প্রভাববশতঃ পশ্চিমবঙ্গের কুমারীদিগের ভাদু প্রতিমার রূপ লাভ করিয়াছে। হিন্দু ধর্মের প্রভাববশতঃ বাংলার পল্লীর যুবক-যুবতীদিগের সমবেত নৃত্য-গীত লুপ্ত হইয়া গেলেও, বাংলার কুমারীগণ সেই সঙ্গীতের ধারা নিজেদের মধ্যে আজও যে অব্যাহত রাখিয়াছে, ভাদু গান তাহার অন্যতম প্রমাণ।..."[১৩১]

তুষু বা টুসু উৎসব

পুরুলিয়া জেলা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পৌষ মাসে একটা বিশেষ গীতানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় যার নাম হল টুসু। ঋতুগত প্রভাব বা প্রকৃতিগত তাৎপর্য টুসু অনুষ্ঠানকেও ভাদু উৎসবের মত একটা বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। টুসু অনুষ্ঠানে রমণীরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ও টুসু গানে অংশ নেয়। ভাদু উৎসবের মত টুসু উৎসবে গানই মুখ্য বিষয়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে শুরু হয়ে সারা পৌষ মাস অবধি চলে এই অনুষ্ঠান। টুসু উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে মকর অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে টুসু উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোথাও গানের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত হয়। মানভূম অঞ্চলে কুর্মী মাহাতো এবং ভূমিজদের মধ্যে টুসু উৎসব পালনের রেওয়াজ দেখা যায়। বাংলাদেশে টুসুকে নিয়ে যেমন উৎসব হয় তেমনি টুসুকে নিয়ে ব্রত পালনও করা হয়। টুসু সেখানে তুষু।

আশ্বতোষ ভট্টাচার্যের[১৩২] মতে টুস্ব রাঢ় অঞ্চলের একটা বিশেষ লৌকিক শস্যোৎসব। ধান পেকে ওঠার সন্ধিক্ষণেই টুস্ব উৎসব পালিত হয়। এই সন্ধিক্ষণ হল অঘ্রাণ-পৌষ মাস। শ্রীভট্টাচার্যের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে মাঘ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত হল টুস্ব উৎসবের উপযুক্ত সময়। যদিও কোথাও কোথাও অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত টুস্ব উৎসব পালিত হয়। বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশ এবং পুরুলিয়া জেলায় এই অনুষ্ঠানকে বলে টুস্ব উৎসব। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুস্ব উৎসবে ছড়া কাটা হয়, কিন্তু মানভূমের টুস্ব উৎসবে এই ছড়া কাটার পরিবর্তে মেয়েরা গান গেয়ে টুস্বকে বন্দনা করে। মানভূমে এই গানকে বলা হয় টুস্ব গান। আর একথাও সত্য যে মানভূম অঞ্চলেই এই টুস্ব উৎসবের ব্যাপক প্রচলন চোখে পড়ে। আমাদের মনে হয় যে মানভূম থেকেই এই টুস্ব উৎসবের প্রচলন বাঁকুড়া প্রভৃতি অন্যান্য জেলায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আশ্বতোষ ভট্টাচার্যের মতে সরাতে তুষ দেওয়া হয় বলে সম্ভবতঃ টুস্ব, তুষ্ব নামে পরিচিত। বাঁকুড়ায় এই তুষ্ব পুজার বিশেষ বিবরণ পাই বাংলার লোক-সাহিত্য গ্রন্থে।[১৩৩]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তুষ্ব বা টুস্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মানভূম জেলার টুস্ব বাঁকুড়ায় তুষ্বতে পর্যবসিত। "ভাষাতত্ত্বের আইনে দন্ত বর্ণের মূর্ধণ্য বর্ণে পরিণত হওয়ার নজীর আছে। এই আইন অনুসারে তুষ্ব নিশ্চয়ই টুস্ব হতে পারে।"[১৩৪] অনেকে মনে করেন যে টুস্ব হল পৌষ লক্ষ্মীর প্রতীক এবং টুস্ব উৎসব হল আদিম শস্যোৎসব। সুকুমার সেনের মতে টুস্ব বা তুষ্ব (তোষলা) পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিষ্যা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত শস্যোৎসবেরই এক প্রবহমান ধারা। (সুকুমার সেনের মন্তব্য উদ্ধৃত ঃ সুধীর করণ ঃ সীমান্ত বাংলার লোকযান ঃ পৃ ১৮৬-১৮৭)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের[১৩৫] মতে কোথাও এই অনুষ্ঠান তুঁষ-তুষলী নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে এই তুঁষ-তুষলী বা তোষলা ব্রতের প্রচলন আছে। এই তোষলা ব্রত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত হল যে এই জাতীয় ছোট, অপ্রধান ব্রতগুলি শাস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আজও তারা স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। আঙ্গিকগত তাৎপর্যে ও বৈশিষ্ট্যে এই সব ব্রত খাঁটি এবং অকৃত্রিম ভাবে বাঙালী নারী সমাজে প্রচলিত। প্রাচীন অনুষ্ঠানের ধারা এই সব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে নিখুঁত ভাবে আজও আমাদের মধ্যে টিঁকে আছে। একদিকে আছে এইসব অনুষ্ঠানের বহু বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান এবং অন্য দিকে এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গান ও নৃত্যের প্রচলন। তুঁষ-তুষলী ব্রত সম্পর্কে আরও কিছু বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে বাংলার ব্রত উৎসবে।

টুসু (মানভূম)

টুসুকে ঘিরে মানভূম অঞ্চলে একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এইরূপ ঃ

কুর্মী সমাজে ছিল এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। যার নাম টুসু। তার ভাল নাম হল রুক্মিণী। টুসুর বিবাহ ঠিক হয়েছিল এক কুর্মী তরুণের সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। কিন্তু বিবাহের ঠিক আগে এরা এক ডাকাত দলের দ্বারা অপহৃত হয়। এই ডাকাতেরা ছিল জাতিতে মুসলমান। তারা যখন জানতে পারল যে—কুর্মী সম্প্রদায়ের ঐ দুই তরুণ তরুণী শুকরের মাংস খায় তখন মুসলমান ডাকাতরা তাদের ছেড়ে দেয়। টুসু তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে যখন স্বগ্রামে ফিরে এল তখন যুবকের অভিভাবকেরা এই বিয়েতে আপত্তি জানাল। কারণ টুসু এখন অস্পৃশ্যা। মুসলমান ডাকাতদের স্পর্শে সে হয়েছে অশুচি। যখন তাদের বিবাহ হল না, তখন কুর্মী যুবকটি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকে জানল সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। টুসু কিন্তু তার অবদমিত প্রেম-ভালবাসা নিয়ে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তারপর একদিন সবাই শুনল যে—প্রতীক্ষারতা টুসুও নিরুদ্দেশ হয়েছে। টুসুর সেই গৃহত্যাগের কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। অবশেষে দীর্ঘ-অনুসন্ধানের পর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে টুসু তার বহু বাঞ্ছিত সন্ন্যাসী-বরকে খুঁজে পেল। ততদিনে টুসুর রূপ শ্রীহীন এবং তার স্বাস্থ্য হয়েছে ভগ্ন। তবু সে তার ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হল বটে কিন্তু মিলনের পর টুসুর মৃত্যু হল। বাঞ্ছিতের জন্যে টুসুর এই আত্ম-বিসর্জনের করুণ কাহিনীকে মনে করে কুর্মী ও মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা টুসু-উৎসব পালন করে। সিংভূম জেলার ইচাগড় থানার অন্তর্গত সতীঘাটায় আজও সাড়ম্বরে টুসু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের বিবরণ ও টুসু সংক্রান্ত লোককাহিনীর পরিচয় সুধীর করণের গ্রন্থ[১৩৬] পাঠে বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

ভাদু মূর্তির অনুকরণেই মানভূমে টুসু মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রচলন হয়েছে। এই উৎসব মানভূমে জাতীয় উৎসবের আকার গ্রহণ করেছে। হলুদবর্ণা টুসু দেবীর কোন বাহন নেই। সালংকারা মূর্তিটিতে কিশোরীর রূপ প্রতিভাত। উচ্চতা প্রায় এক হাত। মানভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই টুসুর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। মানভূমের কোন কোন স্থানে ওই বাহনহীনা হলুদবর্ণা টুসুর মাটির প্রতিমা নির্মাণের রেওয়াজ আছে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলছেন—

"…টুসু গৃহস্থের পরিবারভুক্ত মানবী মাত্র, কোনও দেবী চরিত্র নহেন। তিনি তেলের বাটি লইয়া স্নান করেন, মাথার চুল ঝাড়েন এবং গলায় সোনার হার পরিয়া থাকেন—

টুসু সিন্যাছেন গা হিল্যাছেন
হাতে তেলের বাটি
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাটি ॥

টুসু মুড়িও ভাজেন,

আমার টুসু মুড়্হি ভাজে
কি বা খইড়কা লড়ে গ !"[১৩৭]

টুসু (মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম, কেঁসিয়ারি, দাঁতন এবং খড়্গপুরে টুসু উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয়। উৎসবের বেশ কিছুদিন আগে থেকে গ্রামের মেয়েরা দরজায় দরজায় ঘুরে চাঁদা আদায় ক'রে বিভিন্ন দল গঠন করে। উৎসবের ব্যয়-নির্বাহের জন্যেই এই চাঁদা আদায়। একটা জমকালো টুসু প্রতিমা কেনার জন্যে সকলের মধ্যে আলোচনা হয়। বিবাহিতারা পিতৃগৃহে চলে আসে এই উৎসবের সময়। স্বামীগৃহের কর্মক্লান্ত দিনগুলো থেকে সাময়িকভাবে কিছু-দিনের জন্যে তারা চলে আসে পিতৃগৃহে। ফেলে আসা সেই অতীত কুমারী জীবনকে তারা ফিরে পাবার চেষ্টা করে। তারা সুযোগ পায় বাল্য সহচরীদের সঙ্গে মেলামেশার। কিন্তু পতিগৃহের দৈনন্দিন জীবনের গ্লানিময় অবসরকে তারা কখনই ভুলতে পারে না। তাই তাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকে জ্বালা-যন্ত্রণার কালো মেঘের ছায়া। এরপর টুসু উৎসব সুরু হলে সেই গানের মধ্যে থাকে তাদেরই সুখদুঃখে ভরা জীবনের কথা ও কাহিনী, স্বামীগৃহের নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ও বিষয়। যেমন অসাক্ষাতে অন্ধকারে না বুঝে ঘোমটা না টেনে ভাসুরের ঘরে প্রবেশ করে অবলা বধূ বলে ফেলে—

"আঁধার ঘরে ছুঁচ গুলিইছি
ভাশুর বলে জানিই নাই,
ও ভাশুর তোর পায়ে পড়ি
দিদি যেন জানেই নাই।"[১৩৮]

উৎসবের প্রথম দিন "বাউরি বাঁধা" নামে পরিচিত। বাউরি বাঁধা অনুষ্ঠান না করে কেউই চালের গুঁড়োয় পুলি-পিঠা প্রস্তুত করতে পারে না। এই দিন পুরুষেরাও একটা সংস্কার পালন করে। তারা মাছ ধরতে গিয়ে মাছের কামড় খেয়ে পবিত্র হয়। মেয়েরা তাদের চরণ যুগলকে আলতায় রঞ্জিত করে টুসু গান করে।

দ্বিতীয় দিনে মেয়েরা টুসুকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমায় বার হয়। এক গ্রামের টুসু পুতুলের সঙ্গে অন্য গ্রামের পুরুষ পুতুলের বিবাহ দেওয়া হয়।

"...These dolls are carried on platters. This marriage is

generally the outcome of a successful negotiation carried on by a certain woman so authorised..."[১৩৯]

বররূপী পুতুলকে নিয়ে বরযাত্রীরা গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলে। তারপর কনে-টুসুর বাড়িতে বরকে রেখে আসে।

টুসুর পতিগৃহে যাত্রার করুণ বিদায়ের মর্মস্পর্শী ছবি গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। পতিগৃহে পাঠাবার জন্যে টুসু-মাতার কান্না যেন স্বাভাবিক ভাবে বাঙালী গৃহস্থ ঘরের কন্যাবিদায়ে শোকাকুলা জননীর কথা মনে করিয়ে দেয়। টুসু শাশুড়ীর কাছে চলে যাবে। তাকে মা বলে ডাকবে। কিন্তু টুসু-মাতার অহরহ ভাবনা যে টুসু কি শাশুড়ীকে মা বলে ডেকে প্রকৃত মাতৃস্নেহ লাভ করতে পারবে?

"বড়তল কে গেইছিল টুসু
বড়তলে কি দুধ পড়ে?
পরের মা কে মা বলিলে
অন্তর কেমন করে?"[১৪০]

এরপর কন্যা ও জামাতার দুই বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কাল্পনিক ভাবে গানের মাধ্যমে বাদ-প্রতিবাদ চলে। দুই পক্ষের মধ্যে ছড়াকাটাকাটি ও গান এক এক সময়ে চরম পর্যায়ে গিয়ে পেঁছয়।

তৃতীয় দিন গ্রাম পরিক্রমা শেষে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর নিজ নিজ গৃহে সকলে ফিরে গিয়ে একে অপরকে পুলি-পিঠে ও পরমান্ন দিয়ে আদর আপ্যায়ন করে। এই দিনে 'মাহাতো' এবং 'কোরা' সম্প্রদায়ের লোকেরা একটা অনুষ্ঠান পালন করে। এই অনুষ্ঠানের আড়ালে সম্ভবতঃ তাদের একটা বিশ্বাস বা সংস্কার কাজ করে। এই অনুষ্ঠানে তারা তাদের গরু-মহিষগুলোকে বিপদমুক্ত করার জন্যে একটা তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে গরু মহিষের পেটের অধোদেশে চিহ্নিত করে দেয়। তাদের বিশ্বাস এর দ্বারা সেই গবাদি পশুগুলো সমস্ত আধি-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ ও মেদিনীপুরের টুসু-উৎসবের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় "Tusu Festivel of Midnapur"[১৪১] বইয়ে। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে যে টুসু গান সংগ্রহ করেছেন তার মধ্য দিয়ে বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের একটা আটপৌরে ছবি ফুটে ওঠে।

ইন্দ্রধ্বজ উৎসব বা ইঁদপরব

অতীতে ইন্দ্রধ্বজ বা ইঁদপরব ছিল ঝাড়গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। এখন এই উৎসবের প্রাচীন ঐতিহ্য লুপ্তপ্রায়। প্রাচীন ভারতে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নানাপ্রকার ধ্বজ উৎসব প্রচলিত ছিল। যেমন গরুড় ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি পূজা ও উৎসবানুষ্ঠান। অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন রাজারা বৃষ্টি প্রার্থনা অথবা শস্যোৎসবের প্রাক্কালে এই জাতীয় ধ্বজা

পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ভূত কিংবা অপদেবতার হাত থেকে রাজা ও রাজ্যকে রক্ষাকল্পেও এই জাতীয় ধ্বজা পূজার আয়োজন করা হত। তবে—"...সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশীয়, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোনো ধর্ম-কর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজা পূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে[১৪২] আমাদের মনে হয় এই ধ্বজা ও কেতন পূজা প্রাচীন ভারতের এক ঐতিহ্যময় ধর্মানুষ্ঠান—যা আজও আমাদের সমাজে চালু রয়েছে ইঁদ পরব হিসেবে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে ইঁদকে ইন্দ্র-ধ্বজের পূজা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এটাই হল শক্রোত্থান।

ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে উন্মুক্ত প্রান্তরে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ একটা শালগাছ মাটিতে পুঁতে তার মাথায় ইন্দ্রছত্র নামে একটা বাঁশের ছাতা নূতন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। প্রজারা নাগরা, মাদল প্রভৃতি বাজিয়ে নৃত্য গীতে মেতে ওঠে। যেখানে শাল গাছ মাটিতে পোঁতা হয়, সে স্থানকে বলা হয় ইঁদতলা। এই ইঁদতলায় যে নৃত্যোৎসব হয় সেখানে সাঁওতাল ভূমিরাজগণ পূর্বে অংশ গ্রহণ করত। এই উৎসবের নেপথ্যে বিনয় ঘোষ[১৪৩] তাঁর গ্রন্থে একটা পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান দিয়েছেন। যেখানে ইন্দ্রদেব ধ্বজ নিয়ে অসুর-যুদ্ধে জয়লাভ করেন। বিনয় ঘোষ মনে করেন যে—আর্যরা যুদ্ধে অনার্যদের পরাজিত করে ধ্বজা পূজার দ্বারা বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন। অসুরদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের বিজয়কে স্মরণ করেই হয়ত ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলন হয়। তাই অতীতে মর্তের রাজগণ ইন্দ্রধ্বজরূপী ইন্দ্রের সেই প্রতীককেই পূজা করতেন। ঘাটশীলায় প্রতি বছর ইন্দ্র দ্বাদশীর দিনে সাড়ম্বরে ইন্দ্রাভিষেক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে সেখানে ছাগ বলিও দেওয়া হয়। ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমীর পর যে দ্বাদশী হয়, তা ইন্দ্র দ্বাদশী নামে পরিচিত। ঘাটশীলার এই উৎসব ইন্দ্র-দ্বাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলার 'খাতড়া'-নামক স্থানে ভাদ্র মাসে ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে ইঁদপরব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের স্থানে শালবৃক্ষরূপী ইন্দ্ কাঠকে পূজা করা হয়।

বাঁধনা উৎসব

কালীপূজার পরদিন থেকে সাধারণতঃ তিন-চারদিনব্যাপী বাঁধনা উৎসব পালিত হয়। কখনও কখনও আবার পৌষ মাসে সাঁওতাল অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল অথবা মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত। তবে এই উৎসবের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। গ্রামের লোকেরা সুবিধেমত পৌষ মাসের যে কোনদিন একটা সময় নির্বাচন করে এই উৎসব পালন করে। প্রথম দিন একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গ্রাম ও গ্রামান্তরের গরুর সমাবেশ হয়। এই সমাবেশের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে গোঠ পূজা সম্পন্ন হয়। বিনয় ঘোষ তাঁর

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে এই পূজা উপলক্ষে মাহাতো সম্প্রদায়ের লোকেরা একটা বিশেষ সংস্কার পালন করে। তারা গরুর গায়ে ডিম ভাঙে। তাদের বিশ্বাস যে গরুর গায়ে ডিম ভাঙলে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হ্রাস পায় এবং গো-ধন বৃদ্ধি পায়। এই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই তারা এই বিচিত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করে।

পথের ওপর ডিম ভাঙার প্রথা ধলভূম ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ধর্মের গাজনেও দেখতে পাওয়া যায়। ডিম-ভাঙা পথের ওপর দিয়ে গাজনের ভক্তরা হেঁটে যায়। এই প্রথা ধর্মঠাকুরের শক্তিরূপিনী-কামিনার নিকট বলিপ্রথার পূর্ব স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঁধনা পরবে গরুর গায়ে ডিম ভাঙা অনুষ্ঠান হয়ত কোন প্রাচীন বলিদান প্রথার এক বিস্মৃত স্মৃতি-চিহ্ন।

বাঁধনার তৃতীয় দিনে গরু খেলানো অনুষ্ঠান হয়। দু-দলের লোকেরা বাজনা বাজিয়ে গরুকে উত্তেজিত করে তোলে অন্য দলের গরুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। বাঁকুড়ার জামখোলা গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায় মহা সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান পালন করে। উৎসবের তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানটি এই অঞ্চলে 'গরু খুঁটা' নামে পরিচিত। এই 'গরু খুঁটা'-অনুষ্ঠানে কোন গরু বা মহিষকে সাজগোজ করিয়ে একটা খুঁটার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে সেই গবাদি পশুটাকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণ সোল্লাসে নৃত্য-গীতে মেতে ওঠে।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গো-পূজা অনুষ্ঠান পালিত হয় প্রতি বছর দীপালী উৎসবের ঠিক পরে। হলুদ জল দিয়ে গরুর গা ধুইয়ে শিঙে তেল এবং কপালে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়। গরুকে সাজিয়ে বরণডালা দিয়ে বরণ করা হয়। গো-পূজা সূচক এই অনুষ্ঠানকে সেখানকার লোকেরা বলে গরুর চাঁদবদনী অনুষ্ঠান। "হাওড়া জেলার লোক উৎসব"[১৪৪] গ্রন্থে এই সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রকারান্তরে ঝাড়গ্রামের বাঁধনা পরবই হল হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের গরুর চাঁদবদনী অনুষ্ঠান।

করম উৎসব

ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীরা এই উৎসব পালন করে। ভাদ্র মাসের একাদশী তিথিতে শুক্লপক্ষে আদিবাসীরা করম পূজার নৃত্য-গীতোৎসবে মেতে ওঠে। করম গাছ নামে এক শ্রেণীর গাছের দুটো ডাল কেটে এনে তাকে পূজা করা হয় এবং সেই ডাল দুটোকে কাঁধে তুলে নিয়ে আদিবাসীর দল বিভিন্ন বাজনা-বাদ্য সহকারে গান করে। এই করম উৎসব অনেকের মতে শস্যোৎসব কিংবা বর্ষার উৎসব অথবা প্রকৃতি-উৎসব। আশুতোষ ভট্টাচার্য[১৪৫] মনে করেন যে করম গাছ প্রকারান্তরে 'কেলিকদম্ব'। কিন্তু অনেকের মতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে কেলিকদম্ব নেই। ভাদ্র মাসের একাদশীর আগের দিন স্থানীয় বন-জঙ্গল থেকে করম গাছ খুঁজে তাতে হলুদ সুতো বেঁধে বরণ করা হয়। পরদিন ঐ গাছ কেটে দুটো ডাল নিয়ে আসা হয়। লোকেদের বিশ্বাস

একটা ডাল করম আর অন্যটা হল ধরম। করম উৎসবে করম রাজা ও করম রাণীর বিবাহ দেওয়া হয়। করম রাজা ও করম রাণী যথাক্রমে সূর্য ও পৃথিবীর প্রতীক। করম উৎসব প্রধানত মেয়েদের উৎসব। করম উৎসবে অবিবাহিতা মেয়েরা প্রধানতঃ অংশ নিলেও বিবাহিতা রমণীরাও করম ব্রত পালন করে। তাই করম হল একাধারে উৎসব এবং ব্রত। ভাদ্র মাসের একাদশী তিথিতে গৃহ প্রাঙ্গণে করম ঠাকুরের প্রতীক হিসেবে দুটো করম গাছের ডাল কেটে পুঁতে দিয়ে সেই ডালকেই পুজো করা হয়। করম গাছের ডাল দুটোকে পাশাপাশি পুঁতে এবং একত্র করে লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। উত্তর বিহারের সারণ জেলায় ব্রতচারিণীগণ ভায়েদের মঙ্গল কামনায় করম ব্রতানুষ্ঠান পালন করে।

'বাংলার লোক সাহিত্য'[১৪৬] গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের এই করম উৎসবকে বাংলার সীমান্তবর্তী স্থানের ভাদু পুজোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে মানভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষের কুমারীরা ভাদ্র মাসে যে গীতোৎসবের আয়োজন করে থাকে, সেই অনুষ্ঠান হিন্দু প্রভাবের ফলে ভাদু পুজোয় পর্যবসিত। কিন্তু আসলে এই ভাদু পুজো আদিবাসীদের করম উৎসবেরই একটা হিন্দু সংস্করণ বিশেষ। নাচ ও গানই করম উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ভাদু পুজানুষ্ঠানেও আছে নাচ ও গানের প্রচলন। করম পুজোকে কেন্দ্র করে সাঁওতালী উপকথায় যে কাহিনী প্রচলিত আছে তার পরিচয় পাওয়া যায় "সীমান্ত বাঙলার লোকযান"[১৪৭] গ্রন্থে। করম উৎসবের নাচ কিংবা স্ত্রী-পুরুষের যুগ্ম নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের মর্মর ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

ঝাঁপান উৎসব

সর্প পুজো ও উৎসব ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের ঝাঁপান উৎসব সর্পোৎসবেরই এক অঙ্গ বিশেষ। বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থলে মনসা দেবীর পুজোর স্থান চোখে পড়ে। শ্রাবণ মাসে মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্পবিশারদ এবং ওঝাদের যে সমাবেশ ঘটে সাধারণতঃ তাকেই ঝাঁপান বলা হয়। এই ঝাঁপানে অর্থাৎ মনুষ্যবাহিত যানে চাপিয়ে সর্পবিশারদ বা গুণীকে নিয়ে পূর্বে শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল। এই শোভাযাত্রায় বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওঝারা তাদের নানা সর্পের ঝাঁপি নিয়ে এসে হাজির হত। ওঝারা একটা সুউচ্চ মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে জনসমাবেশে বিষধর সাপেদের নিয়ে নানা প্রকারের খেলা দেখাতো। সর্পবিশারদ ও গুণীদের এই বিপুল সমাবেশে শিষ্যগণ তাঁদের সম্বর্ধনা দিয়ে সর্পগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করত। জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা থেকে সুরু করে ভাদ্র সংক্রান্তি, কিংবা আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পুজোর দিনে সাড়ম্বরে

ওঝাদের সমাগম হত। সাথে সাথে তাদের মধ্যে সাপ খেলানোর ধুম পড়ে যেত। জনসাধারণের উৎসাহে ওঝা ও সর্পবিশারদগণ প্রকাশ্যে ঝাড়ফুঁক এবং মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা কৌশলে বিষধর সর্পকে বশীভূত করে ফেলত। এই ঝাঁপান উৎসবে মনসা ও চাঁদ বেনের গল্প ও গান শুনতে পাওয়া যায়। ঝাঁপান গানে অনেক সময় দুটো দল থাকে। গানে বাদ-প্রতিবাদ চলে তরজা গানের মত। একথা আমরা জানি যে ধর্মঠাকুরের পূজায় জাগুলী অর্থাৎ মনসা পূজার বিধান আছে। প্রাচীন কালের রাজসভায় বিষ-বৈদ্য অথবা সর্পবিশারদ বা গুণীর সমাদর ছিল।

উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য প্রমুখের শ্লোকে সাপ-খেলানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সময় লোকেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সাপ-খেলানো দেখত। সাধারণের মধ্যে সাপ-খেলানো সূচক একটা শ্লোকানুবাদে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"ভাই সাপুড়ে, তোমার এই সাপগুলি ছোট, তোমার মুখের ফুঁ-দেওয়া ধূলি এদের মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। এই ফণাধারী সাপটি বোধ হয় প্রবীণ, কেননা তোমার মত গুণিনদের দ্বারা পূর্ণ মাটিতে দ্রুত ধাবন ক'রেও এর মাথা নত হচ্ছে না।"[১৪৮]

পূর্বে বিষ্ণুপুরে সর্প পূজার উৎসব উপলক্ষে ঝাঁপানের খেলায় সাপুড়িয়া ও বেদেরা এসে জড়ো হত। এই প্রসঙ্গে তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা বিজয়ের উল্লেখ করে বলছেন—

"এক শত শিষ্য সদা সঙ্কের জোগান।
বান্ধিয়া ছত্রিশ বানা নাগের ঝাঁপান॥
তথির উপর চড়ে নাগ-আভরণ।
বিষম শব্দ আর ঢাকের বাজন॥

চাঁদ বেনের বন্ধু বিখ্যাত ওঝা শঙ্খ ধন্বন্তরির একশত শিষ্য নিয়ে ছত্রিশ রঙের নিশান উড়িয়ে নাগভূষিত হয়ে ঝাঁপানে চড়ে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে চলেছেন। বিষ্ণুপুরেও ঝাঁপানের খেলায় যে সমস্ত বেদে আগে আসতো, তারা বিপ্রদাসের শঙ্খ ধন্বন্তরির মত সুসজ্জিত চতুর্দোলায় চেপে আসত। চতুর্দোলার মাথায় রঙিন চাঁদোয়া থাকত। চার পাশে থাকত রঙিন নিশান, আর দোলার ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, জ্যান্ত ঝোলান সাপ। তাদের কেউ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে, কেউ চলন্ত চতুর্দোলার নড়াচড়ার সঙ্গে হেলছে দুলছে। আর চতুর্দোলার ভিতর বসে থাকত বিষ বেদের সর্দার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে...।"[১৪৯]

সাম্প্রতিককালে সর্পবিশারদ ও বেদের দলের এই সমাবেশ ও শোভাযাত্রা আর নেই; অবশ্য সীমান্ত বাংলার কোন কোন অঞ্চলে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ঝাঁপান উৎসবের মধ্যে আংশিকভাবে আজও বেঁচে আছে। ঝাঁপান উৎসবে মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনীমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে দুটি দলের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে একথা আগেই বলা হয়েছে। গানের মধ্যেও নানা-

প্রকার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন মন্ত্র গান অর্থাৎ গানের মধ্যে স্তব ও স্তুতি। যথা মনসা-বন্দনা, মনসা-আহ্বান প্রভৃতি। এ ছাড়া থাকে বিষ নামানো বা বিষঝাড়া মন্ত্র। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সাধারণতঃ মনসা পূজা ও ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবার আশ্বিন সংক্রান্তিতেও ধলভূম ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ঝাঁপান উৎসব পালিত হয়। দুটো লম্বা বংশদণ্ডের ওপর একটা মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় যা ঝাঁপান নামে খ্যাত। ঝাড়গ্রাম ও ধলভূম অঞ্চলের ঝাঁপান উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে সুধীর করণ বলছেন ঃ

"...ঝাঁপানে চড়ে গুণী এবার সশিষ্য শোভাযাত্রায় বিজয়ী বীরের মত অগ্রসর হবে। দুটো লম্বা বাঁশের ওপর একটি মঞ্চ ; এরই নাম ঝাঁপান। ঝাঁপানের ওপর ঘোড়-সওয়ারের মতো চেপে বসবে গুণী। খোলা হবে সাপের ঝাঁপি। ফোঁস করে গর্জন করে উঠবে বিষধর গোক্ষুর খরিস আর কালনাগিনী। মাথা উঁচু করে লক্‌লকে জিভ বার করবে শংখচিতি, উৎসুক জনতা যথাসম্ভব দূর থেকে প্রত্যক্ষ করবে এদের লীলা চঞ্চল ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য।...

ঝাঁপান আরোহীকে পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করে তার সর্বাংগে জড়িয়ে দেওয়া হয় সর্পকুল। সর্পের বলয়, সর্প মাল্য সর্পশীর্ষ হয়ে গুণী সমস্ত সাপের পুচ্ছদেশ ধরে থাকে হাতে ; না হয় সেগুলি মানুষের সান্নিধ্য এমনভাবে পছন্দ করতে নাও পারে। বারে বারে তারা গুণীর দেহ বিচ্যুত হয়ে মাটির বুকে আশ্রয় নিতে চায় ;...কোন কোন সাপ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ফণা তুলে দংশন করবার চেষ্টাও করে।..."[১৫০]

এই মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে 'সয়লা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সয়লা উৎসবের একটা অঙ্গ হল মনসা মঙ্গল ও মনসা ভাসানের গান। অনেকে মনে করেন যে সয়লা উৎসবের সয়লা-ব্রতীরা সই পাতায়। এই সই পাতানো গানও শুনতে পাওয়া যায়। যেমন ঃ

... ...

আম গাছে জাম রে তেঁতুল গাছে লতা
দুই সইয়েতে দেখা হলে কইছে মনের কথা
সইয়ের হল একটি ছেলে, তায় হয়েছে কানা
দুই সইয়েতে ছেলে লয়ে করছে হানা পানা
সইয়ের কপালে উল্‌কি, সইকে ভালো সাজে
দু সইয়েতে কোল দিতে সয়া (স্বামী) মল লাজে।...[১৫১]

সয়লা উৎসবের ব্যাপকতা দেখা যায় হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া জেলার বহু গ্রামে সয়লা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল ভেদে এই অনুষ্ঠানের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য চোখে পড়ে।

ঘেঁটু ঠাকুরের পূজানুষ্ঠান

ঘেঁটু ঠাকুর বাঙালীর এক নিজস্ব দেবতা। বাংলাদেশের বাইরে ঘেঁটু সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত। 'ঘেঁটু' শব্দটিও দেশজ শব্দ। পশ্চিমবঙ্গে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজা এক সময় কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেমন হাওড়া, বালি, উত্তরপাড়া ও চব্বিশ পরগণার কোন কোন স্থানে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এখনও বীরভূম, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ঘেঁটুর পূজা প্রচলিত আছে। ঘেঁটুর পূজার ছড়া এবং গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘেঁটু ঠাকুর বাঙালীর এক লৌকিক দেবতা। লোকেদের ধারণা যে ঘেঁটু ঠাকুরকে পূজা করলে মানুষ কঠিন চর্ম রোগের ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে ঘেঁটু পূজা সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের রাখাল বালকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে কৃষক বালকেরা ঘেঁটুর নামে ছড়া কাটে ও গান গেয়ে মাগন সংগ্রহ করে।

ফাল্গুন-সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজাব সূচনা হয়। শনি ঠাকুরের মত পূজার যা কিছু আয়োজন তা করা হয় বাড়ির বাইরে। গোবর মাটি দিয়ে পূজার স্থানটা পরিচ্ছন্ন করে সেখানে স্থাপন করা হয় ঘেঁটুর আসন। সিন্দুর চর্চিত ঘট সেখানে পাতা হয়। একতাল শুকনো গোময়-এর ওপর সদ্যফোটা ভেটের ফুল পুঁতে দেওয়া হয়। এই হল ঘেঁটুর চেহারা। হলুদ বর্ণ কাপড় জড়িয়ে মুড়ি ভাজা খোলায় ঐ গো-ময় পিণ্ডকে একটা হাঁড়ির ভেতর বসিয়ে রাখা হয়। এর পর ঘেঁটু ঠাকুরকে বন্দনা করা হয়। বন্দনার পর ঘেঁটুর জন্ম বিববণ, চর্মরোগ থেকে মুক্তিভিক্ষা এবং ঘেঁটুর বিরহের বর্ণনামূলক ছড়া ও গান গাওয়া হয়। এইসব ছড়া ও গান বিশেষভাবে কৌতুকাবহ। হাসি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজানুষ্ঠানের শেষে ঘেঁটুব আসনকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভক্তেরা ঘুরে বেড়ায়। ঘেঁটুর ছড়া ও গানের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এইসব ছড়া ও গান সাহিত্যগুণ বর্জিত সন্দেহ নেই, কিন্তু ছড়া ও গানের মধ্যে লৌকিক ভাবটা বিশেষভাবে পরিস্ফুট যা সাধারণ গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আকৃষ্ট করে।

চর্মরোগের ঠাকুর ঘেঁটুর হতশ্রীরূপ ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়—

... ...

আ মরি কি রূপের গঠন, (দেখে) গাটা করছে কেমন।
গলা সরু মাজা মোটা টাক ধরেছে মাথাতে।
কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হয়েছে বুকের ছাতি।
দাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে ॥[১৫২]

ঘেঁটু পূজার উপকরণের মধ্যে আছে মুড়ি ভাজা খোলা, খেচ কড়ি,

ভেট গাছের ফুল, কচুপাতা, আতপ চাল, ডাল, ধান, দূর্বা, হলুদ কানি প্রভৃতি। এইসব উপকরণের তালিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের অঙ্গের লাবণ্য বৃদ্ধিতে পূর্বে কাঁচা হলুদ, হলুদ জল প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ঘেঁটু ঠাকুর চর্মরোগের দেবতা। তাই হলুদ কানি তাঁকে দেওয়ার মধ্যে এই তাৎপর্যটা খুঁজে পাওয়া যায়। আতপ চাল, ডাল, ধান-দূর্বা হল শস্যের প্রতীক। অনেকে মনে করেন যে ঘেঁটুর মধ্য দিয়ে সূর্যকে বন্দনা করা হয়। শস্য উৎপাদনে সূর্যের রশ্মি এবং উত্তাপ প্রয়োজন। সূর্যের আলো যেমন শস্যোৎপাদনে প্রয়োজন তেমনি মানুষের শরীরের সতেজতা আনতেও প্রয়োজন সূর্যের রশ্মি। নানা আধি-ব্যাধির নিরাময়ের জন্যে সূর্যের আলো আহার ও ঔষধের কাজ করে। প্রাচীন লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে সর্ব রোগের প্রকোপ থেকে সূর্যের আলো মানুষকে উদ্ধার করে। তাই সর্ব রোগ হরণের ক্ষমতা সূর্যের তেজে বর্তমান। বসন্ত কালে ঘেঁটু পূজার সূচনা হয়, তাই একথাও অনুমান করা হয় যে হলুদ কানি অর্থাৎ বাসন্তী রঙ দিয়ে ঘেঁটুকে বন্দনা করা হয়। বসন্তকালেই বসন্ত রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়; তাই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ঘেঁটু ঠাকুরকে এই সময়ে পূজো করা হয়। এই পূজা ও উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই নিরক্ষর মানুষদের কাছে আনন্দ ও শিক্ষা যৌথভাবে প্রচারিত হয়ে চলেছে। এইসব লৌকিক পূজানুষ্ঠান তাই গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও আনন্দবিস্তারে অবিরামভাবে লোক-মাধ্যমের কাজ করে চলেছে। রোগ ও রোগমুক্তির সঙ্গে দেবতা ও উৎসবানুষ্ঠানকেও যুক্ত করা হয়েছে বাংলার লোক-সাহিত্যে।

(ঘ) বাংলার ব্রত উৎসব ও ব্রতানুষ্ঠান

কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নারী সমাজ আন্তরিকভাবে কামনা ক'রে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে সাধারণতঃ তাকেই আমরা ব্রতানুষ্ঠান বলে থাকি। কুমারী ও বিবাহিতারাই হল এই অনুষ্ঠানের ব্রতী বা ব্রতচারিণী। বাঙালীর নারী সমাজে এই উৎসবানুষ্ঠানের প্রচলন দীর্ঘকাল থেকে। এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের কোন বিশেষ মন্ত্র নাই। কাহিনী পাঠ ও ছড়া বলাই হল ব্রত-ধারার মন্ত্র। এখানে কোন দর্শক, শ্রোতা বা জনতা নেই। নেই কোন পুরোহিত। ব্রতচারিণীরাই এখানে গায়িকা, পাঠিকা ও শ্রোতা। ব্রতানুষ্ঠানে একের কামনা দশের কামনায় সাঙ্গীকৃত হয়ে যায়। এই সাঙ্গীকরণ-ই হল ব্রতধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সাঙ্গীকরণ কিভাবে হয় দেখা যাক। শস্যের কামনায় মানুষ মাটি কর্ষণ করে বীজ বুনত। কিন্তু সেই শস্য ফলে ওঠা ও ফসল ঘরে তোলার মধ্যে রয়েছে এক দুস্তর ব্যবধান। আছে গভীর অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা। বিপদ আপদ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কাও বড় কম নয়। তাই সুরু হয় কামনা ও প্রার্থনা। ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে কামনা সফল হওয়ার

ছবিটাকে বাস্তবে পাওয়ার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্রতীর হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার সমগ্র কল্পনায় শস্যপূর্ণ সবুজ মাঠ ঝলমল করে ওঠে। ব্রতচারিণীর সেই কামনা তখন শুধুমাত্র একজনের নয় তা সমষ্টির মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যায়। ব্রতীরাই ফলকামী সন্দেহ নেই কিন্তু সেই ফল কামনা দশের জন্যই। ইচ্ছা একক মনের কিন্তু সেই ইচ্ছা দশক, শতক ও সহস্রের ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। তাই ব্রত শুধু অনুষ্ঠান নয় ব্রত হল কামনা সফল করার সাধনায় রমণী মনের এক নীরব তপস্যা। এই তপস্যার উৎসব হল ব্রতানুষ্ঠান। মেয়েরা যখন পুণি পুকুর ব্রত করে তখন সেখানেও সুপ্ত থাকে কামনা। সেই কামনা হল বৈশাখের তাপে পুকুরের জল যেন শুকিয়ে না যায়। এই কামনাকে প্রতিফলিত করার জন্য ব্রতীরা মাটিতে পুকুর কাটে। তার মাঝখানে বেলের ডাল পুঁতে কৃত্রিম পুকুরটিকে পূর্ণ করে তোলে জল ঢেলে। বেলের ডালে ফুলের মালা জড়িয়ে দেয়। পুকুরের চারপাশটি ফুলে ফুলে সুসজ্জিত করে তোলে। 'বসুধারা ব্রত'তেও দেখা যায় ব্রতচারিণী মাটির ঘটে ছিদ্র করে নকল বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে গাছের মাথায় জল ঢেলে দেয়। এমনি করেই ব্রতকামীরা আসল বিষয়টিকে ফললাভের আশায় অনেক আগে থেকেই সত্যে পরিণত করতে চায়। ব্রতের কামনা তাই শিল্প-কর্মে, গানে, কথায় ও আলপনায় এক অপরিসীম সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করে। এইসব ব্রতধারার অন্তর্লোকে প্রাচীন আদিম সমাজের কোন সূত্র কালক্রমে আর্যীকৃত হয়ে বাঙালী সমাজে হয়ত বেঁচে আছে।

নীহাররঞ্জন রায়ের[১৫৩] আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে ধ্বজাপূজা, কেতন পূজা প্রভৃতির মত প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান এবং রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব বাংলার আদিবাসী কোম সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব বলে গণ্য করা হত। পরবর্তী কালে এইসব অনুষ্ঠানের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রাগার্য সমাজে এইসব ধর্মানুষ্ঠান নৃত্য-গীত সহ পালিত হত। এইসব অনুষ্ঠানের প্রচলন আজও আমাদের সমাজে স্বীকৃত। বাঙালীর সমাজজীবনে স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং ব্রত উৎসবগুলি শুধু যে বাঙালীর দৈনন্দিন সমাজজীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তাই নয়, এই উৎসবানুষ্ঠান যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোম সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের স্মৃতি বাহক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এইসব অনুষ্ঠান আর্যেতর সম্প্রদায়ের যুগ থেকে প্রচলিত ছিল। মেয়েলী ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন—যে ব্রতগুলি বিশেষভাবে নারীদের ভিতর প্রচলিত তা অধিকাংশই "অবৈদিক", "অস্মার্ত", "অপৌরাণিক" এবং "অব্রাহ্মণ্য"। তাই শ্রীরায়ের মতে ঋগ্বেদের কাল থেকে সুরু করে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্র প্রভৃতিতে কোথাও কোন প্রচলিত ব্রতের কোন প্রকার উল্লেখ নেই। এই অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় যে প্রাগার্য সংস্কৃতি সম্পন্ন এইসব লৌকিক বা নারীব্রতকে বাঙালী সমাজ আপন ধ্যান-ধারণার দ্বারা আত্মস্থ করে নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। লোককথার বিশিষ্ট

অঙ্গস্বরূপ এই ব্রত সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতামতটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে সব ব্রতই যে বাংলা দেশেই উদ্ভূত এবং বিকশিত হয়ে উঠেছে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বাংলার বাইরে থেকেও একাধিক ব্রতকথা এ দেশে প্রচলিত আছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। শ্রীভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"…যদিও ইহাদের অধিকাংশই বাংলা দেশেরই জলবায়ু দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মৌলিক প্রেরণা পৌরাণিক কিংবা লৌকিক হিন্দু-ধর্ম অবলম্বন করিয়া বাংলা দেশের বাহির হইতে আসিয়া এ-দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ক্রমে বাঙ্গালীর জাতীয় রসোপকরণ দ্বারা ইহা এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর ইহা হইতে বহির্বাংলার কোনও উপাদান উদ্ধার করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।…"[১৫৪]

এই কার্য-প্রণালীকেই আমরা ইতিপূর্বে বাঙালী সমাজ কর্তৃক আত্মস্থ করার ঘটনা বলে স্বীকার করেছি।

বাংলার লৌকিক দেব-দেবীকে অবলম্বন করে ব্রতকথাগুলি রচিত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে এইসব দেব-দেবীরা কেউই পুরাণোক্ত দেব-দেবী নহেন। উপরন্তু এইসব দেব-দেবীর মধ্যে শুভাশুভ শক্তির সমন্বয় ঘটেছে। আর্য এবং প্রাগার্য সমাজের সম্মিলনের ফলে যে নূতন সমাজ গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজের মধ্যেই দেব-দেবীদের ভিতর এই ইষ্ট-অনিষ্ট দুই বিপরীতধর্মী গুণের সমন্বয় দেখা যায়। সেই সূত্রেই একদিকে যেমন দেবতা মঙ্গলকারী, অন্যদিকে সেই দেব-চরিত্র অশুভকারী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এইসব দেব-দেবী তাঁদের পূজার ব্যাঘাত সৃষ্টিতে যেমন কুপিত হন, তেমনি আবার সেই দেব-চরিত্রকে যদি কোনভাবে সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে সেই দেবশক্তি ভক্তের কাছে কল্যাণকারী হিসাবে আবির্ভূত হন। আমাদের ব্রতকথাতে আছে এই সকল দেব-দেবীর প্রশস্তি ও মাহাত্ম্য। এই ব্রতানুষ্ঠানগুলি ত্রিস্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে আছে ব্রতের ক্রিয়া এবং আচার-অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় স্তরে কথা, কাহিনী, ছড়া-পাঠ বা আবৃত্তি। তৃতীয় স্তরে ব্রতের শিল্প নিদর্শন বা আলপনা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন ঃ

"…ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে ; এক কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সকল জীবন্ত কামনা।…"[১৫৫]

আমাদের দেশের এইসব ব্রতকে মোটামুটিভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীতে শাস্ত্রীয় ব্রত আর অন্যটিতে মেয়েলী ব্রত। এই মেয়েলী ব্রতের মধ্যে কিছু কিছু ব্রত আছে যেগুলি বাঙালী ঘরের কুমারীরা পালন করে। এই প্রসঙ্গে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর "হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান" গ্রন্থে আলোচনা সূত্রে বলছেন ঃ

"ব্রতের অনুষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক নিয়ম পালন এখন মহিলাদের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ। প্রচলিত ব্রতের মধ্যে কোনটিই পুরুষদের পালন করিতে দেখা যায় না। কুমারী মেয়েরা পূর্বে অনেক ব্রতের অনুষ্ঠান করিত—এখন সেগুলির তেমন প্রচলন নাই।...এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রতগুলির বিশেষ করিয়া লৌকিক ব্রতগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্য অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। ইহাদের খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান, আনুষঙ্গিক কাহিনী ও আঞ্চলিক রূপভেদ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে এই অস্পষ্টতা দূর হইতে পারে ও অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা।...[১৫৬]

আচমন, ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা, সংকল্প, ঘট স্থাপন, সরাতে চাল-ফল আনাজ প্রভৃতি সাজিয়ে ভূজ্‌জি উৎসর্গ এবং কথা শ্রবণ প্রভৃতি হল পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় ব্রতানুষ্ঠানের উপাদান। শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত আজ প্রায় লুপ্ত। অপরদিকে লৌকিক ব্রতগুলি আজও নারীসমাজে প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীর ব্রতানুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায়নি। এই ব্রতগুলি আড়ম্বরহীন এবং পালন করা কঠিন নয়। এইসব লৌকিক মেয়েলী ব্রতগুলির কথা-কাহিনী ও ক্রিয়াচার প্রভৃতি অনুষ্ঠান যুগ পরম্পরাক্রমে নারীদের মধ্যেই প্রচলিত। ব্রতানুষ্ঠানে কিছু 'পালনী' থাকে। এই 'পালনী'র মধ্য দিয়ে সংযমের অভ্যাস হয়। 'পালনী'-অর্থে পালনীয়, আচরণীয় কিছু নিয়ম ও নীতি। এই নিয়মানুষ্ঠানগুলি 'পালনী' রূপে যুগাদিক্রমে নারীদের মধ্যে প্রচলিত। তবে এইসব ব্রতানুষ্ঠানের ক্রিয়াচার ও 'পালনী' ও আনুষঙ্গিক কাহিনীতে অঞ্চল ভেদে তারতম্য দেখা যায়।

প্রায় বারো মাসে নানা ব্রত নানা রূপে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসে যেমন পূর্ণি পুকুর ব্রত, শিব পুজো ব্রত, পৃথ্বী পুজো ব্রত, হরিচরণ ব্রত, মধু সংক্রান্তি ব্রত, ধান গোছানো ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত প্রভৃতি। জ্যৈষ্ঠে জয়-মঙ্গলের ব্রত, ভাদ্রে ভাদুরি বা ভাদুলী ব্রত, কার্তিক মাসে ইতু ব্রত, অগ্রহায়ণে যমপুকুর ব্রত সেঁজুতি ব্রত ও তুঁষ-তুষলী ব্রত, মাঘে তারণ ব্রত ও মাঘমণ্ডল ব্রত, ফাল্গুন মাসে ইতুকুমার ব্রত, শস্‌ পাতার ব্রত ইত্যাদি। 'বাঙালীর ইতিহাস'[১৫৭] গ্রন্থে মাস ভেদে ব্রতানুষ্ঠানের একটা দীর্ঘ তালিকা লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এইসব ব্রতের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে এর মধ্যে কোনটা বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাজনিত জাদু শক্তির পুজো (পূর্ণি পুকুর ব্রত), কোনটা প্রজনন শক্তির পুজো (শিবপুজো ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, জয় মঙ্গলের ব্রত প্রভৃতি) আবার কোনটা কৃষি সংক্রান্ত গুহ্য জাদু শক্তি ও প্রজনন শক্তির পুজো (গোকাল ব্রত, ভাদুরি ব্রত, তিলকুজারি ব্রত, ইতু পুজো ব্রত, যমপুকুর ব্রত, তারণ ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত প্রভৃতি)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রতানুষ্ঠানগুলি প্রকৃতি, কৃষি ও মানব সমাজের কল্যাণের জন্যেই অনুষ্ঠিত হয়। কল্পনায় বৃষ্টির কামনা, প্রকৃতিকে জয় করার আনন্দ এবং পরিবার ও মানব সমাজের মধ্য থেকে পাপ ও অমঙ্গলকে অপসারিত করে শুভ-শক্তির সূচনা করাই ব্রতানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ব্রতের মধ্যেই ব্রতীরা বিশ্বাস করে যে তাদের কামনা সফল হয়েছে। একেই আমরা ইতিপূর্বে জাদুবিশ্বাস

বা magic বলে অভিহিত করেছি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[১৫৮] মনে করেন যে প্রাক্ পুরাণ আমলের ব্রতানুষ্ঠানে রমণীগণ সেই জাদু শক্তিকেই আহ্বান জানিয়েছে। ব্রতধারায় আজও রমণী সমাজের ভূমিকা তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রত পালন হল নারীমনের এক সহজাত প্রকাশ। সংসার সীমান্তে এই ব্রত হল এক অভিনব রমণী উৎসব।

ব্রতধারার মধ্যে বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন ষষ্ঠীর নামগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৈশাখে চান্দনীষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী, আষাঢ়ে কার্দমী, শ্রাবণে লুণ্ঠন, ভাদ্র মাসে চাপড়া বা মন্থন ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকে নাড়ী, অগ্রহায়ণে মুলাষষ্ঠী, পৌষে, মাঘে, ফাল্গুনে ও চৈত্রে যথাক্রমে অন্ন, শীতলা, গো এবং অশোকষষ্ঠী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া মঙ্গলচণ্ডীকে অবলম্বন করে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠান পালিত হয়। এইসব মঙ্গলচণ্ডী ব্রততে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। এই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"...ব্রত কথার কাহিনীকে ভিত্তি করিয়াই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্রতকথা হিসাবে পড়া ও শোনা হয়।"[১৫৯]

মেয়েলী ব্রত

বাঙালী সমাজে মেয়েলী ব্রতগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। একদিকে কুমারী ব্রত—ছয় থেকে নয়-দশ বছরের কুমারীরা পালন করে। আর অন্যগুলি নারী ব্রত—যা সাধারণতঃ বিবাহিতা রমণীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

তুঁষ-তুষলী ব্রত

পশ্চিমবঙ্গে তুঁষ-তুষলী নামে একটি মেয়েলী ব্রত চালু আছে। সারা পৌষ মাস ধরে চলে এই ব্রতানুষ্ঠান। এই ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে টুসুর পূজাপদ্ধতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের তুঁষ-তুষলী বা তোষলা সীমান্ত বাংলার টুসু। তুঁষ-তুষলী ব্রতানুষ্ঠানের যে পরিচয় তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর "বাংলার উৎসব"[১৬০] গ্রন্থে লিপিবন্ধ করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ব্রতের উপচার হল নতুন আলোচালের তুঁষ, কালো গরুর গোবর, সরিষা ফুল, মুলার ফুল ও দুর্বা। গোময়ের সঙ্গে তুঁষ মিশিয়ে নাড়ু প্রস্তুত করা হয়। এই নাড়ুর সংখ্যার মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। সেই নাড়ুর শীর্ষে পাঁচটি করে দুর্বা ঘাস রাখা হয়। এইভাবে কখনও একটা, দুটো অথবা চারটে নাড়ু নিয়ে প্রত্যহ পূজা করা হয়। নাড়ু হাতে নিয়ে সরিষা কিংবা মুলার ফুল সহ ব্রতচারিণীরা বলে ঃ

"তুঁষ-তুষলী কাঁধে ছাতি
বাপ মার ধন যাচাযাচি
স্বামীর ধন নিজপতি
বাপের ধন কান্না হাটি
পুত্রের ধন পরিপাটি।"[১৬১]

এই ভাবে সারা পৌষ মাস পূজা করে পৌষ মাসের শেষ দিনে শতাধিক ময়দা অথবা চালের নাড়ু আনকোরা হাঁড়ি বা বড় সরাতে দুধ সহ সিদ্ধ করে ব্রতচারিণীরা খেতে বসে। খাবার আগে পূজা-করা তুঁষ ও গোময়পূর্ণ নাড়ুয় পাত্রে আগুন দেওয়া হয়। খাওয়া শেষে সেই অগ্নিশুদ্ধ পাত্র মাথায় নিয়ে মেয়েরা পুকুরে তাকে ভাসিয়ে দেয়। ভাসাবার আগে মেয়েরা কামনা করে—

"তুষলী গো রাই
তুষলী গো মাই
তোমার ব্রত করে কিবা ফল পাই ?
তোমার কল্যাণে খাই
ছ বুড়ি ছ গণ্ডা ক্ষীরের লাড়ু
আমার যেন হয় সবার আগে সুবর্ণের খাড়ু।"[১৬২]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্রত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে—প্রথমে ব্রতচারিণীরা তোষলার স্তব করে :

"তুঁষ-তুষলি, তুমি কে,
তোমার পূজা করে যে,
ধনে ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত ॥
তোযলো লো তুঁষ কুন্তি।
ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি—"[১৬৩]

এরপর থাকে অনুষ্ঠানের উপকরণের বর্ণনা। তারপর সুরু হয় তোষলা ব্রতের কামনা। যে কামনার স্তবে মেয়েরা আকাঙ্ক্ষা করে 'কোদাল কাটা ধন', 'গোয়ালঘর আলো করা গাই' এবং 'দরবার আলো করা' পুত্র, 'সভা আলো করা' জামাই ও স্বামীপুত্র সহ এক সুখী সংসার। এই কামনার মধ্যে বাঙালী নারী হৃদয়ের চিরন্তন গার্হস্থ্য জীবনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই অবনীন্দ্রনাথ তোষলা ব্রতটিকে একটা জীবন্ত দৃশ্যকাব্য বলে মনে করেছেন।

নদীতে তোষলার সরা ভাসানোর মধ্যে দিয়ে ব্রতকামীরা তোষলার প্রধান দুই উপাদানকে কৃতজ্ঞতা জানায়। সেই দুই উপাদান হল সার-মাটি এবং সূর্য। যেগুলি হল কৃষিকার্যের দুই প্রধান সম্পদ। কৃষিক্ষেত্রে প্রাচুর্য ডেকে আনে সূর্য রশ্মি, সার এবং মাটি। সেইজন্যে মনে হয় এই ব্রতানুষ্ঠানটি যেন কামনা-বাসনার সম্ভাবনাপূর্ণ এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ব্রতকামীদের বিশ্বাস যে, এর দ্বারা ওদের ঐ অন্তর্নিহিত কামনা বাসনার স্বপ্নময় বস্তু-

গুলো সম্পদে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস আদিম মানুষদের মধ্যেও ছিল। এই অভিমত প্রকাশ করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।[১৬৪]

হরিচরণ ব্রত

সংসারে রমণীর কামনার অন্ত নেই। বছরের প্রথম মাসে কুমারীরা তামার টাটে চন্দন মাখিয়ে হরির শ্রীপাদপদ্ম এঁকে এই ব্রত করে। কুমারীরা 'গিরিরাজে'র মত পিতা চায়, 'মেনকা'র মত মা চায়, 'রাজা'র মত স্বামী চায়, 'সভা-আলো করা' জামাই চায়, 'গুণবতী বউ', 'রূপবতী দাসী' এবং লক্ষ্মণের মত দেবর প্রার্থনা করে।

"দাস চান, দাসী চান
রূপার খাটে পা মেল্‌তে চান,
সিঁতেয় সিঁদুর মুখে পান,
বছর বছর পুত্র চান
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয় এক গলা গঙ্গাজলে…"[১৬৫]

নীহাররঞ্জন রায় এই ব্রতকে গুহ্য জাদু শক্তির পূজার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দশ পুতুল ব্রত

এখানেও সেই কামনা। কুমারীরা চৈত্র সংক্রান্তি থেকে এই ব্রত পালন করে। পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল এঁকে ফুল দূর্বা সহ তারা কামনা জানায় যে মৃত্যুর পর আবার যেন তারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে। তাদের কামনা হল রামের মত পতি, সীতার মত সতী, দশরথের মত শ্বশুর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী এবং সবশেষে—

"…এবার মরে মানুষ হব পৃথিবীর মত ভার সব
এবার মরে মানুষ হব, ষষ্ঠীর মত জেওঁজ হব।"[১৬৬]

গোকাল ব্রত

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই ব্রত হল কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা। গাই-গরুর শিঙে ভাল করে তেল মাখিয়ে প্রথমে তাকে জল দিয়ে সিক্ত করে কপালে হলুদ, সিঁদুর এবং চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সেই গরুর চতুষ্পদ তেল-হলুদ সহ জলে ধুতে হবে। তারপর সেই গরুর গা-গুলোকে আঁচলে মুছে গরুর মুখ দর্পণে গরুকেই দেখাতে হবে। এরপর এক গুচ্ছ দূর্বা ঘাসের মধ্যে ঢেকে একটা কলা গরুকে খেতে দিয়ে কুমারীরা স্বর্গবাসের কামনা করে।

গরুকে তিন বার দূর্বা ঘাসের আঁটি দিয়ে ব্রতিনীরা তাকে পাখার বাতাস করতে করতে বলে—

"রোগ-শোক দূর হোক
কীটপতঙ্গ দূর হোক
মশা-মাছি দূর হোক
তোমাকে ঘুরায়ে পাখা
আমার হোক সোনার শাঁখা।
তোমাকে বাতাস করি,
সতীন মেরে ঘর করি।"[১৬৭]

গোকাল ব্রতের এই ছড়ার মধ্যে গো-পূজার কথা যেমন আছে তেমনি সতীন সম্পর্কে কুমারী মনে জেগে থাকে এক দারুণ বিভীষিকা। কারণ স্বামীর সুখ ও সম্পদকে নারী চায় একলা ভোগ করতে। স্বামীর অংশে অপর কেউ ভাগ বসাক, এটা নারীর পক্ষে দুঃসহ। তাই গোকাল ব্রততে সতীনকে অপসারিত করার কামনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই সতীন প্রথা আজ আর নেই, কিন্তু অতীতে এই সতীন প্রথার বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। তাই ব্রতিনীরা সেই বিভীষিকার হাত থেকে নিস্তার পাবার কামনা করেছে। ব্যষ্টি মনের কামনা হলেও অতীতে এটা সমষ্টিগতভাবে নারী সমাজের কামনা।

গোকাল ব্রতের অপর বিষয় গরু। আমরা জানি এই গরু কৃষিসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উপরন্তু গোয়ালভরা গরু যদি নীরোগ হয়, তাহলে গৃহস্থের সুখের বাড় বাড়ন্ত। 'গোলা ভরা ধান, আর গোয়াল ভরা গরু'র কামনা করত গৃহস্থ। সমষ্টির সেই কল্যাণ ও সদিচ্ছাকে ব্রতচারিণীরা ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করত। তাদের কামনা এমনি করে সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হত। কৃষি সংক্রান্ত প্রজনন শক্তি হল গাই বা গরু। তাই গোকাল ব্রতে ব্রতকামীরা গরুকে পূজা করে। মেদিনীপুরের টুসু উৎসবের শেষে মাহাতো ও কোরা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের গবাদি পশুগুলোকে আধি-ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্যে তাদের পেটের অধোদেশে তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা চিহ্নিত করে দেয় এ কথা আমরা পূর্বে বিবৃত করেছি। গোকাল ব্রতের মধ্যে সতীন প্রসঙ্গটি কেন এল তা সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও, একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে স্বামীকে কেন্দ্র করে রমণীর সুখ-শান্তি ও ভালবাসা এবং সন্তান কামনার স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হতে চায়; সেখানে সতীনের বাধা তার এই সহজ-স্বাভাবিক সরল জীবনযাত্রাকে আবিল করে তুললে তার জীবন কণ্টকিত হবে। ব্রতী তাই সতীনের ঘর করাকে বিভীষিকা ও অকল্যাণকর বলে মনে করেছে। গোকাল ব্রতে ব্রতী "সতীন মেরে ঘর" করার কামনা জানিয়েছে তাই আন্তরিক ভাবে।

হরিষমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

বৈশাখ মাসে বিবাহিতা মেয়েরা হরিষমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে। এই ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে একটা উপাখ্যান যুক্ত আছে। এই উপাখ্যানে মা মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কাহিনীতে দুটি নারী চরিত্র আছে। একজন বামনী অন্যজন গয়লানী। বামনীর কথামত গয়লানী বৈশাখ মাসে হরিষমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হল। কিন্তু গয়লানীর মাথায় এক অদ্ভুত বাতিক চেপে বসল। সুখ-ভোগে তার এতই অরুচি জন্মাল যে সে স্বেচ্ছায় আবার দুঃখকে পেতে চাইল। কিন্তু মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তার সব অশুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। বেনে বাড়িতে লাউ গাছ কাটতে গিয়ে সে গাছ আরও গজিয়ে উঠল। মৃত হাতিকে জড়িয়ে ধরতেই সে আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠল। গয়লানী কর্তৃক মেয়ে-জামায়ের বাড়িতে পাঠানো 'বিষের নাড়ু' 'অমৃত-নাড়ুতে' রূপান্তরিত হল। মঙ্গলচণ্ডীর কৃপাপুষ্ট গয়ালানী শত চেষ্টা করেও স্বেচ্ছায় কোন প্রকার দুঃখ-যাতনাকে কিছুতেই যখন ডেকে আনতে পারল না তখন "মঙ্গলবার" করা ছেড়ে দিল। স্বাভাবিক ভাবে তখনই গয়লানীর সংসারে নেমে এল জ্বালা-যন্ত্রণা ও শোকের ছায়া। তারপর বামনীর কথায় বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করাতে গয়লানীর সংসারে আবার সুখ-ঐশ্বর্য ফিরে এল।

মঙ্গলবার উপবাস করে ভক্তিভরে মা মঙ্গলচণ্ডীর নামে পাতা ঘটে জল দিতে হয়। এই ঘটই হল মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রতীক। যিনি সকল অশুভ শক্তির বিনাশকারিণী। এই মঙ্গল ঘট ছাড়া মঙ্গলচণ্ডীর আর কোন মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। মঙ্গলচণ্ডী নিরাকারা। ব্রতিনীদের কাছে তাই এই ঘটই হল শুভ-শক্তি-দায়িনী মা মঙ্গলচণ্ডী।

জয়মঙ্গলবার ব্রত

মেয়েরা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার ব্রত পালন করে। এই ব্রত সম্পর্কে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানেও দুই নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। একজন হল বেনে-বউ, অপরজন হল সদাগর-বউ। বেনে-বউয়ের মেয়ে ছিল, কিন্তু সে পুত্রহীনা। অপরদিকে সদাগরের স্ত্রীর পুত্র ছিল কিন্তু কোন মেয়ে ছিল না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় পুত্রহীনা পুত্র ও কন্যাহীনা কন্যা লাভ করল। তাদের নাম হল জয়দেব ও জয়াবতী। গ্রামের ছেলে জয়দেব পায়রা উড়িয়ে খেলা করত। একদিন জয়দেবের পায়রা উড়ে গিয়ে যেখানে জয়াবতী ও তার সহচরীরা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছিল সেখানে ঐ পায়রা জয়াবতীর কোলে গিয়ে বসল। জয়দেব পায়রা চাইতে এসে মঙ্গলচণ্ডীর পূজাবিধি ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে অবাক হল। কিন্তু পায়রা

না পেলে সে সব তছনছ করে দেবে এই বলে তাদের শাসালো। কিন্তু যখন জয়দেব জানতে পারল যে এই ব্রতের দ্বারা মানুষের সব দুঃখ দূর হয়। যেমন —জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, হারালে পায়, এমন কি ঘরে গেলেও বেঁচে ওঠে তখন জয়দেব মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝল এবং পায়রা ফেরৎ নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। এরপর জয়দেব-জয়াবতীর বিবাহ হল। মঙ্গলচণ্ডীর প্রতি জয়াবতীর অগাধ ভক্তি দেখে জয়দেব দেবীকে পরীক্ষা করতে সুরু করল। যেমন গয়নার পুঁটুলি জলে নিক্ষেপ করা, বৌভাতের দিন জয়াবতীকে দিয়ে রান্না করানো এবং সব শেষে জয়দেবের ছেলে হলে তাকে কুমোরের পোণে রেখে দিয়ে আসা ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মা মঙ্গল-চণ্ডীর অসীম মাহাত্ম্যে একে একে মাছের পেট থেকে গয়নার পুঁটুলি পাওয়া গেল, মঙ্গলচণ্ডী স্বয়ং জয়াবতীর হয়ে বৌভাতের দিন অত লোকের রান্না করে দিলেন এবং শেষে জয়দেবের পুত্রকে রক্ষা করে মঙ্গলচণ্ডী তাঁর মাহাত্ম্যের কথা ঘোষণা করলেন। এতদিনে জয়দেব তার ভুল বুঝতে পেরে মঙ্গলচণ্ডীর অমিত শক্তি ও মাহাত্ম্যকে স্বীকার করল।

বিপত্তারিণী ব্রত

আষাঢ় মাসে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। সমস্ত অশুভশক্তি ও যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা এই ব্রতানুষ্ঠান করে। এখানে মা মঙ্গলচণ্ডী নেই, কিন্তু দেবী দুর্গাই বিপত্তারিণী রূপে আবির্ভূতা। এই ব্রতের মধ্যেও একটা উপাখ্যান আছে। কাহিনীর গোড়াতে এক রাজ-রাণীর সঙ্গে এক চাষার বৌয়ের বন্ধুত্ব হয়। কৌতূহলবশত রাণী একদিন চাষার-স্ত্রীর কাছে গো-মাংস দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করল। চাষার স্ত্রী লুকিয়ে এক ঝুড়ি গো-মাংস এনে দিল। রাজ-ভৃত্য এটা দেখে রাজাকে এ সম্পর্কে অবহিত করে। ক্রোধান্বিত রাজা ঘরে গিয়ে দেখল গো-মাংস পূর্ণ মাংসের ঝুড়ি ফল-ফুলে ভরে গেছে। এই অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন হল বিপত্তারিণীর অসীম কৃপায়। এইসব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দেব-দেবীকে তুষ্ট করার ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে। কারণ দেবতাকে প্রসন্ন করতে পারলে তিনি কল্যাণ সাধন করেন। এই বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করার জন্যেই ব্রত পালন। দ্বিতীয়তঃ দেব-দেবী সম্পর্কিত চিরন্তন বিশ্বাস ও মতবাদ এই শ্রেণীর ব্রতকথা ও কাহিনীর মধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকে। তাই আমাদের মনে হয় একদিকে ব্রত হল কামনা সফল হওয়ার ভাবী অনুষ্ঠান, অন্যদিকে দৈবী মহিমার এক প্রচার মাধ্যম। মানুষের জীবনে অদৃষ্ট, নিয়তি প্রভৃতি অশুভশক্তিকে দমন করে রাখার জন্যে মানুষ অহরহ দেবতার স্মরণাপন্ন হয়। মানুষের বিশ্বাস দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অতএব মানুষ দৈবী শক্তির ওপর নির্ভরশীল। মানুষের জীবনে একদিকে আছে নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ, অন্যদিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চিরন্তন মহিমা। এই নিয়ে যেমন

মহৎ কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তেমনি হয়েছে লোক-সাহিত্য। ব্রতের কাহিনীর মধ্যেও রয়েছে নিয়তির বিধান এবং দেবতার অভিনব মাহাত্ম্য ও লীলা। এই নিয়েই ব্রতকথা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ও লীলা এবং নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান প্রভৃতি অসংখ্য কথা ও কাহিনী ব্রতকথার মধ্য দিয়ে যুগে যুগে আমাদের কাছে প্রচারিত। তাই মহৎ সাহিত্যের পাশে এই শ্রেণীর ব্রতগুলি দৈবী মহিমার গুণকীর্তন। তবে ব্রতকথার রাজ্যে দেবতার প্রবেশ এর সাহিত্যগুণ ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"...মানবজীবনে অদৃষ্ট বা নিয়তির প্রভাব কেবলমাত্র লোক-সাহিত্যে কেন, উচ্চতর সাহিত্যের ভিতর দিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে ; মানব-জীবনের ইহা এক পরীক্ষিত সত্য ; অতএব এই দেব-দেবীগণ যদি অদৃষ্ট বা নিয়তিরই রূপক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা ব্রতকথার সাহিত্যগুণ হ্রাস পাইতে পারে না।"[১৬৮]

অতএব এই মন্তব্যের দ্বারা আমাদের মনে হয় যে ব্রতের ছড়া ও কাহিনী লোক-সাহিত্য হিসেবে যুগ পরম্পরায় আজও বাঙালীর সমাজে অটুট হয়ে আছে।

ব্রতধারার মধ্যে দেখা যাচ্ছে দুটি প্রবাহ। একটি প্রবাহে রয়েছে সমাজ, পরিবার, কৃষিকর্ম ও শস্যের জন্য প্রার্থনা ও কামনা। অন্য প্রবাহে আছে দৈবীমাহাত্ম্য এবং দেবতাকে সন্তুষ্ট করে ভক্ত তার বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্যে সদা উন্মুখ। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনক্ষেত্রেই মানুষ কিন্তু তার কামনা অথবা বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্যে নিশ্চেষ্টভাবে দেবতার কাছে করজোড়ে 'দাও দাও' করে ফল ভিক্ষা করছে না কিংবা তার মনস্কামনাকে পূর্ণ করার জন্যে দেবতার মন্দিরে গিয়ে নীরবে ধ্যান করছে না। ব্রতিনীরা সকল ক্ষেত্রেই একটা ক্রিয়া করে চলেছে। দেবতা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। এখানে ব্রতচারিণীর ক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রধান। আচার-অনুষ্ঠান, ছড়াকাটা, ঘটে জল ঢালা, ফুল হাতে নিয়ে ব্রতের কাহিনী শোনা প্রভৃতি সবটাই তার একটা ক্রিয়া বা কর্ম। আনন্দ ও মনস্কামনাটাই তার কাছে বড়। গানে, পাঠে, ছড়ায় তার মনের আনন্দটাকে সে অনাবিল ভাবে প্রকাশ করে। যেমন দেখি শসু পাতার ব্রত বা ভাঁজো ব্রততে।

ভাঁজো লো কলকলানী মাটির লো সরা
... ...
এক কলসী গঙ্গা জল এক কলসী ঘী—
বছরান্তে একবার ভাঁজো নাচবো না তো কি ?"[১৬৯]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্রতের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এখানেও সেই ক্রিয়া এবং শস্যের কামনা। তাই শসু-পাতার ব্রতের মূলেও কামনা এবং সেই কামনা চরিতার্থতার জন্যে ক্রিয়ানুষ্ঠান। এই দুয়ের সমন্বয়ে ব্রতের আদর্শটি কত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। "ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা"—ছড়ার মধ্যে ব্রতকামীর আশারূপী শস্য যে ভাঁজোর মতই কলকলিয়ে ফলে উঠবে।

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মী পূজায় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা-গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।"[১৭০]

বসুধারা ব্রত

এই ব্রতানুষ্ঠানে মাটির ঘটে ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হয়। 'গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই'—প্রকৃতির বুকে যখন এই অবস্থা তখনই বসুধারা ব্রতের অনুষ্ঠান। সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস অপেক্ষা করে মানুষেরা বসে থাকে বৃষ্টির কামনায়। জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত দিনগুলোর মধ্যে আষাঢ়ের ছবিকে কামনা করে বসুধারা ব্রতের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বৃষ্টি আসার আগে বৃষ্টির কামনা এবং শস্য ফলে ওঠার আগে শস্যপূর্ণ মাঠের ছবিকে মনের মধ্যে প্রতিফলিত করে তোলাই এই শ্রেণীর ব্রতের উদ্দেশ্য। কামনা করার দিন থেকে, কামনা সফল হওয়ার দিন গোণা পর্যন্ত মানুষ অপেক্ষা করে থাকে। বৃষ্টি পতন কিংবা শস্যের প্রকৃত উদ্গমের আগের দিনগুলো আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় ভরে থাকে। এই উৎকণ্ঠিত মনের আবেগ নিয়েই ব্রতানুষ্ঠান। ব্রতচারিণীর ক্রিয়া ও কামনা যৌথভাবে গানে ও ছড়ায় ঘনীভূত আবেগে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাই ব্রতের উদ্দেশ্যকে সফল করার ক্ষেত্রে ব্রতকামীরা একটা মাধ্যম (media)কে বেছে নেয়। এই মাধ্যম হল ব্রতের ক্রিয়ানুষ্ঠান। যার মধ্যে আছে নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ছড়া কাটা, কথা-পাঠ ও কথা শোনা এবং কখনও কখনও নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান। এই মাধ্যমের দ্বারাই যুগ পরম্পরায় মানুষের ঈপ্সিত কামনা প্রতিফলিত হয়ে আসছে ব্রতের মধ্যে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের[১৭১] আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে উপনিষদের যুগেও বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ লাভের জন্যে মানুষ কামনা করেছে ও গান গেয়েছে। পার্থিব সম্পদ লাভের জন্যে আদিম মানুষদের মত তাঁরাও সাম গানের মধ্য দিয়ে কামনার আবেগকে প্রকাশ করেছে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করবে। যিনি এইভাবে বৃষ্টিতে পঞ্চ প্রকার সামের উপাসনা করেন, তাঁর জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং বর্ষণ করাতেও পারেন।

অতএব এর দ্বারা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে সামগানের উৎসে সেই জাদু বিশ্বাস প্রবল ছিল। অন্ন প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্য সামগ্রী লাভের সঙ্গে গানের তথা সাম গানের সম্পর্ক ছিল একান্ত গভীর। প্রাচীন সাহিত্যের 'কাম গাম' কথাটিকে এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। "...আজো পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ে আটকে পড়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যকে অবলম্বন করে যদি এ জাতীয় উক্তি বোঝাবার চেষ্টা করা যায় তাহলে তার তাৎপর্য উদ্ধার করা এতোটুকুও কঠিন হবে না। কেননা, সমাজ-বিকাশের ওই প্রাচীন

পর্যায়ে পড়ে থাকা মানুষগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় গানের উৎসে যাদু বিশ্বাস। এবং এই যাদু বিশ্বাসের প্রাণ হলো তীব্র কামনার আবেগ।”[১৭২]

বাঙালীর প্রাচীন এবং জনপ্রিয় ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে শিবরাত্রি ব্রত, ইতু ব্রত এবং লক্ষ্মী ব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, শিবচতুর্দশী বা শিবরাত্রি নামে প্রসিদ্ধ। শিবরাত্রি উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎসব পালিত হয় এবং অনেক স্থানে মেলা বসে। বাংলাদেশের ব্রতকথায় এক ব্যাধের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী[১৭৩] অনুমান করেছেন যে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর অমানিশায় আদিদেব শিবলিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন। কথিত আছে যে এই দিনই না কি দেবাদিদেব সমুদ্র মন্থনজাত গরল পান করেন। শক্তির সাহায্য ব্যতীত শিব কর্ম করণে সম্পূর্ণ অসমর্থ, পার্বতীর এইরূপ অহংকারের কথা শিব জানতে পেরে ক্রোধান্বিত-চিত্তে সমস্ত কর্ম থেকে বিরত হন। শিবের এই আকস্মিক কর্মবিরতির ফলে পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন অন্য দেবতাদের সঙ্গে ভীত পার্বতী দেবাদিদেব মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তাঁকে ভক্তিভরে পূজা করেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন ঘটনা থেকেই শিবরাত্রি ব্রত পূজার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ইতু ব্রত

বাংলাদেশের মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ঘট পেতে ইতু ব্রত পালন করে। এই ঘটই হল ইতুর প্রতীক। ইতুর করুণা প্রার্থনা করে মেয়েরা ইতু-ঘটকে পূজা করে ভক্তি-ভরে ইতুর ব্রতকথা শোনে। এই ইতু ব্রতের মধ্যেও কামনা আছে। মেয়েরা এই ব্রত পালন করে ঐহিক সুখ-শান্তি ও পারিবারিক কল্যাণের জন্যে। এই ব্রতের সঙ্গে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনীতে আছে এক গরীব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এবং তাদের দুই কন্যা উমনো ও ঝুমনো। ব্রাহ্মণের পিঠের ভাগ থেকে ব্রাহ্মণী তার দুই মেয়েকে পিঠে খেতে দেওয়ায়, ব্রাহ্মণ কুপিত হয়ে উমনো আর ঝুমনোকে বনবাসে দিয়ে আসে। হিংস্র শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে উমনো আর ঝুমনো অসহায় হয়ে রাত্রির মত বটবৃক্ষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। বটবৃক্ষ দু-ফাঁক হয়ে উমনো-ঝুমনোকে সেই রাতের মত তার কোটরে আশ্রয় দেয়। পর দিন দেবকন্যাদের সঙ্গে ইতু পূজা করে উমনো আর ঝুমনো ভাগ্যবতী হয়ে স্বগৃহে ফিরে আসে। ইতুর করুণায় গরীব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সংসারে দেখা দিল ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। পরে ইতুর মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণী চাঁদের মতন এক পুত্রসন্তান লাভ করল। রাজা ইতুর মাহাত্ম্যে সন্তুষ্ট হয়ে উমনোকে রাজবধূ ও ঝুমনোকে মন্ত্রীবধূ করতে মনস্থ করল। শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় উমনো মাগুর মাছের ঝোল আর ছাঁচি পান খেয়ে যাত্রা করল। কিন্তু ঝুমনো সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার ছিল বলে ইতু ব্রত সাঙ্গ করে ইতু ঘট নিয়ে

পতিগৃহে রওনা হল। ইতু উমনোর প্রতি কুপিতা কিন্তু ঝুমনোর প্রতি সদয়া হলেন। উমনোর জন্যে রাজগৃহে দেখা দিল মড়ক। এদিকে ঝুমনোর জন্যে মন্ত্রীর গৃহে এল সুখের বাড়বাড়ন্ত।

উমনো-ঝুমনোর পিতা ইতু ঘটে লাথি মারায় তার গৃহে সমূহ অকল্যাণ নেমে এল। পরে ঝুমনোর পরামর্শে পিতার সুমতি ফিরে এল। ব্রাহ্মণী আবার ইতু পূজা করে ফিরে পেল তার হারানো ঐশ্বর্য। ছোট বোন ঝুমনোর কথামত উমনো ইতুর পূজা করে পতিগৃহে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনল। গল্পের শেষে অন্ধ হাড়িনীও ইতু ব্রত করে তার চোখ এবং মৃত পুত্র-সন্তানদের জীবিত অবস্থায় ফিরে পেল। ইতুর মাহাত্ম্য অপরিসীম। মেয়েরা তাই বলে—

> "অষ্ট চাল অষ্ট দূর্বা কলস পাত্রে থুয়ে
> শোনরে ইতুর কথা এক মন-প্রাণ হয়ে
> ইতু দেন বর—
> ধনে-ধান্যে দৌত্রে-পৌত্রে বাড়ুক তার ঘর।"[১৭৪]

ইতু ব্রতে কলস পাত্রে অষ্ট দূর্বা এবং অষ্ট চাল রাখার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে হয় পরোক্ষভাবে কৃষিকর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইতু ব্রতটি অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে পালিত হওয়ার মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। কারণ রবিবার সূর্যের বার। কৃষি-কর্মের সঙ্গে সূর্য এবং তার উত্তাপের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সূর্যের আলো উদ্ভিদ বিকাশের সহায়ক। তাই রবিবারে ইতু ঘটে অষ্ট চাল এবং অষ্ট দূর্বা রাখার ইঙ্গিতটা মনে হয় অর্থবহ। অনেকে মনে করেন ইতু পূজা হল উদ্ভিদ দেবতার পূজা। তোষলা ব্রততেও দেখেছি সার ও মাটির আয়োজন এবং সূর্য—চাষের এই দুই প্রধান সম্পদকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নদীতে তোষলার সরা ভাসানো হয়। ইতু ব্রতকে নীহাররঞ্জন রায়[১৭৫] প্রজনন শক্তির পূজা বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য সূর্য-রশ্মি কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির অন্যতম উৎস।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এডোনিসের[১৭৬] পূজা ব্যাবিলন ও সিরিয়ার সেমেটিক নরগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই এডোনিস হল উদ্ভিদের দেবতা কিংবা শস্যের দেবতা। কোন পাত্রে মাটি বিছিয়ে তার উপর বিভিন্ন শস্য (যব, গম, লেটুস) এবং ফুলের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হত। সপ্তাহব্যাপী মেয়েরা সেই শস্য ও ফুলের বীজের উপর জল ঢালত। বীজগুলো থেকে অঙ্কুরোদ্গম হলে এডোনিসের মূর্তির সঙ্গে সেগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হত। বাংলাদেশের ইতু পূজা যে এই জাতীয় উদ্ভিদ-দেবতার পূজা একথা অনেকে অনুমান করেন। "আদিম সমাজের ইতিহাস"[১৭৭] গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে—সুমাত্রার অভ্যন্তরে মেয়েরা ধানের বীজ বোনে। এই সময় তারা এলোচুলে থাকে। তাদের বিশ্বাস যে এলোচুলে ধানের বীজ বুনলে ধানগাছও ঐ গোছা চুলের মত পরিপুষ্ট ও

সুদীর্ঘ হবে। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলে উঠবে। প্রাচীন মেক্সিকোতে ভুট্টা জন্মাবার সময় ভুট্টা দেবীর উৎসব পালিত হত। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল মেয়েদের এলোচুলে নৃত্য। এইভাবে মানুষ প্রকৃতি বা উদ্ভিদ রাজ্যের ওপর আপন প্রভাব ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। উৎসবের মধ্যে দেখা দিল তারই এক সার্থক প্রতিফলন।

লক্ষ্মী ব্রত

লক্ষ্মী ব্রত বাঙালী মেয়েদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়। আশ্বিন পূর্ণিমায় হেমন্তের পাকা ধান যখন ঘরে তোলা হয়, তখনই এই ব্রতের সূচনা। আলপনা দেওয়া এই ব্রতের একটা প্রধান অঙ্গ। এখানে ঘটের বদলে লক্ষ্মীর চৌকি পাতা হয়। চৌকিতে লক্ষ্মীর মুকুট, শ্রীচরণযুগল অথবা পদাঙ্কিত লক্ষ্মীর পা-দুখানি আলপনায় চিত্রিত করা হয়। সরার পিঠেও দেওয়া থাকে নানা রঙের আলপনা। যাকে বলা হয় লক্ষ্মী-সরা। বহু বর্ণে চিত্রিত এই লক্ষ্মী সরাকেও অনেক স্থলে পূজা করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে লক্ষ্মী ব্রত হল শস্য-উৎসব। যদিও মন্ত্রের মধ্যে ধান বা কোন শস্যের উল্লেখ নেই। যেমন—

"লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্ব ব্রত সার
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্ধ্যানারী পুত্র পায় যায় সর্ব দুখ
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ।"[১৭৮]

কার্তিক ব্রত

মৈমনসিংহ অঞ্চলের কার্তিক ব্রত উপলক্ষে সেখানকার পল্লীরমণীগণ কৃষি-বিষয়ক যে গান গেয়ে থাকে তার মধ্যে দিয়ে প্রাগার্য যুগের মাতৃতান্ত্রিক কোন অরণ্যবিহারী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। পশুশিকার এবং কৃষিকর্ম যাদের প্রধান জীবিকা ছিল। কার্তিক ব্রত উপলক্ষে মৈমনসিংহ অঞ্চলের রমণীগণ সারারাত্রিব্যাপী কৃষি-বিষয়ক গান করে। এই ব্রতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাদের একটা গানের বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেখানে সারা রাত্রি গান গাওয়ার পর রমণীরা তীর ধনু নিয়ে শস্যক্ষেত্রে বাঘ শিকার করার অভিনয় করে। সেই উপলক্ষে এই গান পাওয়া হয়—

"সাজিল কামিনীকুল কানে দুলে কন্নফুল,
মারে তীর হুম্‌কা বাঘের গায় রে।
রেবতী আর চন্দ্রকলা এক হাতে ধনু ছিলা
আরে হাতে বাইছা তুলে বাণ রে।।"[১৭৯]

কার্তিক ব্রতের মাধ্যমে প্রাগার্য যুগের মাতৃতান্ত্রিক কোন কৃষিজীবি সমাজের এক আদিম চিত্র এই গানটির মধ্যে বেঁচে আছে বলে মনে হয়। ব্যাঘ্র শিকার অভিনয়টাই ছিল তাদের জাদু বিশ্বাস। কল্পনায় তারা মনে করত অরণ্যের হিংস্র ব্যাঘ্রকে পরাভূত করতে পারবে। সেই জন্যে তাদের অনুপ্রাণিত করত এই জাতীয় কামনা সফল হওয়ার অভিনয়। কিসের কারণে এই জাতীয় মানসিকতা তাদের মধ্যে জেগে উঠত এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয় প্রাচীন যুগের আদিম বা বন্য মানুষ যখন শিকার বৃত্তি আয়ত্ত করল তখন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের উপকরণ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। সেই কারণে আদিম মানুষেরা প্রকৃতি ও বন্য শিকারকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনতে না পেরে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের বাসনায় বাস্তব উপায়ে না গিয়ে কৃত্রিম পথ অবলম্বন করত। এই কৃত্রিম পন্থা থেকেই জাদুর সৃষ্টি। কারণ জাদুর মূল কথা হল যে অনুকরণের দ্বারা যে কেউ তার বাঞ্ছিত বা প্রার্থিত সম্পদ লাভ করতে পারে, অথবা অপরাজেয় কোন বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সেই জন্যে কৃষির উর্বরাশক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে তারা নৃত্য-গীত এবং অভিনয়ের আয়োজন করত বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে। কার্তিক ব্রতে রমণীদের ব্যাঘ্র শিকারের অভিনয়টা আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'হুমকা বাঘের গায়ে' বাস্তবে তীর নিক্ষেপ করতে পারুক বা না পারুক শিকারের অনুকরণে বা অভিনয়ে কাল্পনিক বাঘকে তারা বধ করে জয়ের আনন্দ লাভ করত।

ব্রত পূজা ও ব্রতাচার কেবলমাত্র রমণীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষেরা বাইরের জগত ও কর্মমুখর পৃথিবীতে ব্যস্ত থাকে। ঘরের দিকে তাকাবার অবসর তাদের নেই। তাই নারী সমাজ পুরুষের কর্মজীবনের শ্রীবৃদ্ধি, আপন পরিবারের কল্যাণ এবং সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সংসার-জীবন কামনা করে এই ব্রত ধারার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ ঋতুর পরিবর্তন, শস্য বপন ও শস্য উদ্গম এবং অন্যান্য কৃষি-কর্মের সঙ্গে একাধিক ব্রতের একটা যোগ আছে বলে আমাদের মনে হয়। পৃথিবী, কৃষিক্ষেত্র, সূর্য, সার, গরু প্রভৃতি কৃষি সহায়ক সম্পদ ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে এইসব ব্রতের মাধ্যমে আরাধনা ও বন্দনা করা হয়েছে আবহমান-কাল থেকে।

প্রাচীন মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত, সঙ্কেত এই ব্রতধারার মধ্য দিয়ে আজ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। অতীত বা আদিম মনুষ্য সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কার প্রভৃতি স্মৃতি-সম্পদগুলি এইসব ব্রতাচারকে মাধ্যম করে আমাদের সমাজে আজও বেঁচে আছে। ব্রতোপলক্ষে যে-সব কথা-গান, ছড়া, উপাখ্যান ইত্যাদি রচিত হয়েছে—সেগুলি ব্রতানুষ্ঠানের লোকসাহিত্য।

"…ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যকলা,

গীতিকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্যন্ত পাচ্ছি। কাজেই ব্রতগুলি আমাদের তুচ্ছ জিনিস নয়··· ।"[১৮০]

একথা আগেই বলা হয়েছে যে ব্রতকথা হল লোককথার বিশিষ্ট অঙ্গ। ব্রত কথার পরিবেশ তাই বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশ। যদিও ব্রতের কাহিনীতে রাজা, সওদাগর, বণিক অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তবুও বাঙালীর পারিবারিক জীবনের আচার অনুষ্ঠান এবং নানা সংস্কারের পরিচয় এই সব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে বেঁচে আছে। ব্রত কাহিনীর ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। ব্রতের ছড়া ও গানের ভাষা, ভাব নিতান্ত আটপৌরে ও সাদাসিধে। দেব-দেবীর উপর মানুষের নির্ভরশীলতা ব্রত-কাহিনীগুলির উপাদান গঠনে সাহায্য করেছে। দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ব্রতের উদ্দেশ্য হলেও সেখানে দেবতা হয়েছে উপলক্ষ মাত্র। ব্রত ধারার জগতে নর-নারী মুখ্য, দেবতা সেখানে গৌণ। এ-ছাড়া ব্রতকথায় অলৌকিকত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অলৌকিকত্ব মানুষের মহিমাকে খর্ব করতে পারেনি। ব্রত কথায় মানুষ দেবতার সামনে তার মনের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অকপটে নিবেদন করেছে। তাই মনে হয় যে ব্রত-পূজানুষ্ঠান প্রাচীন ও আধুনিক মানব-জীবন চর্চার এক সহজ সাবলীল সুগম সেতু। যে সেতু গড়ে উঠেছে মানুষের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে। বর্তমান জটিলতা এবং জীবনযন্ত্রণার যুগে ব্রতানুষ্ঠান আমাদের সহজতম ও সরল জীবনধর্মের দিকে যেমন অনাবিলভাবে টেনে নিয়ে যায় তেমনি সুদূর অতীতের সামাজিক জীবনচর্চা ও ধর্মের কথাও এই ব্রতগুলি মনে করিয়ে দেয়। ব্রতগুলিকে মনে হয় প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনের ধর্ম-চর্চা ও সংস্কৃতির এক অবশিষ্টাংশ অথবা খণ্ডিত রূপ।

রথাই ব্রত

মালদহের "রথাই" ব্রতানুষ্ঠান প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। "আদ্যের গম্ভীরা"র লেখক হরিদাস পালিতের মতে "রথাই ব্রত" মালদহের প্রাচীনতম উৎসব। এই উৎসব বৌদ্ধ রথোৎসবের খণ্ডিত রূপ। প্রাচীনকালের সেই বৌদ্ধ রথোৎসবই আজকের রথাই পরব নামে খ্যাত। প্রাচীন রথোৎসবে কুড়িটি রথ বিভিন্ন দেবদেবী এবং ধ্বজ, পতাকা ও মাল্যে ভূষিত হয়ে নগর পরিক্রমা করত। প্রত্যেকটি রথে থাকত সারথীরূপী দণ্ডায়মান বৌদ্ধ মূর্তি। রথের মিছিলে অংশ গ্রহণ করত ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ। সমস্ত রাত ধরে চলত নৃত্য-গীত ও বাদ্য। এই রথোৎসব বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হত। রথাই ব্রতানুষ্ঠান সেই ইতিহাসকে যেন আজ আমাদের নিকট তুলে ধরে। বৌদ্ধরথোৎসব আজ লুপ্তপ্রায়। কিন্তু রথাই ব্রতানুষ্ঠান মালদহের নারীসমাজে আজও বেঁচে আছে। যার মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস।

মেয়েরা বৈশাখ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার স্নান করে গৃহের চতুষ্পথে গোবর নিকিয়ে সেখানে আলপনা দিয়ে রথ আঁকে। অভিমন্যুর সপ্তরথী-ব্যূহের অনুকরণে চতুর্দিকে একাধিক রথ এঁকে মধ্যভাগে একটা বড়ো রথ আঁকে। মেয়েরা এই আলপনা আঁকা রথাইয়ের নিকট 'মানসিক' করে। কেউ আবার সোলার বা চিনির রথ অথবা আকন্দাদিপুষ্পিত রথ তৈরি করে আলপনার ওপর স্থাপন করে। ব্রতীরা আকন্দ ফুল ও ভেজানো মটর ডালের নৈবেদ্য সহ পূজো সম্পাদন করে। এই রথাই ব্রতের অন্য নাম 'রথছরৎ'। রথাই ব্রতানুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট দেবতা নেই। 'রথাই' নিজেই এখানে দেবতা। রথাই ব্রত উপলক্ষে রাজকন্যা ও ব্রাহ্মণ-কন্যার একটা গল্প 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১ম খণ্ড) মেয়েলী ব্রতের ছড়ার ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে অনেক মেয়েলী ব্রত লুপ্ত হয়ে গেলেও ছড়াগুলো বেঁচে থাকে তাদের ঐন্দ্রজালিক শক্তির গুণে। ছড়ার ভাষার মধ্যে সেই ঐন্দ্রজালিক শক্তি বিদ্যমান। ছড়ার ভাষার প্রাচীনত্বের ওপর সমসাময়িক পরিবর্তন এসে সেই ভাষার রূপকে অনেক ক্ষেত্রে বদল করেছে সত্য কিন্তু এদের উপাদানের মধ্যে নূতন বিষয় ও প্রচলিত বিষয় প্রবিষ্ট ও পরিত্যক্ত হতে পারেনি। তাই দেখা যায় ভাষার মধ্যে মানবীয় গুণ, সামাজিক পরিবেশ এবং ভাষা পরিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারাটা ছড়ার ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলেছে অনিবার্য ভাবে। তবে অনেক সময় ভাষা রূপান্তরিত হলেও মাঝে মাঝে তার প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও থেকে গেছে বলে আমাদের মনে হয়। মালদহ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে ভাজো ব্রত নামে একটা অনুষ্ঠান চালু আছে। ভাজো হল শস্যদেবী। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে এই ভাজো ব্রত সুরু হয়। নবম দিবসের অনুষ্ঠানটি হল গন্ধ ছোঁয়া (গায়ে হলুদ) এবং দশম দিবসে অনুষ্ঠিত হয় "ভুট্টা" বরের সঙ্গে "কলাই" কন্যার বিবাহ। পুণ্ড্রক্ষত্রিয়, মালো প্রভৃতি মালদহের আদিবাসীদের মধ্যে এই ব্রতের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। ভুট্টা-কলাই-এর বিবাহের রাত্রে মেয়েরা ছড়া বলে। এই ছড়ার ভাষায় প্রাচীন যুগের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। তাই ভাজো মেয়েলী কৃষি ব্রতেরই অঙ্গস্বরূপ। বীরভূম জেলায় ভাঁজো ব্রতানুষ্ঠানে ভাঁজো সঙ্গীত গীত হয়। মালদহে অনুষ্ঠিত এই ব্রতের একটি ছড়ায় আছে—

> "কাঁঠালের পাত চিকণ চিকণ, মাথাত্ লম্বা টেঁড়ি।
> বৈশাখ মাসে দেখতে যেমন জল ছত্রের হাঁড়ি,
> ভাইজ দিদিটে—ঢুলিত্ আইলাম তাড়াতাড়ি…"

[তারাপদ লাহিড়ী ঃ প্রবন্ধ ঃ মালদহের লোকসংস্কৃতি ঃ 'দেশ' সাহিত্য-সংখ্যা পৃ. ১৬৮]

মানব জীবনে সন্তান উৎপাদনের যুক্তিসম্মত অনুষ্ঠান হল বিবাহ অনুষ্ঠান। তাই ভাজো ব্রতের ব্রতীরাও সেই বিশ্বাসের জোরেই দুই শস্যের

মধ্যে বিবাহ দিয়ে তাদের ধ্যান-ধারণাকে দৃঢ় বা বদ্ধমূল করতে চায়। আমাদের মনে হয় প্রাচীন সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কার যুগবাহিত হয়ে বাঙালীর অনেক ব্রতাচার বা ব্রতানুষ্ঠানের ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। ব্রতানুষ্ঠান বা ব্রত উৎসব এইসব প্রাচীন ও আদিম মানুষের ধর্ম-কর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোন মাধ্যম না থাকলে আমরা এইসব প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারকে সহজে খুঁজে পেতাম না। শাস্ত্র, পুঁথি ও গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন মানুষের ধ্যানধারণা বেঁচে থাকা এক জিনিস এবং অনুষ্ঠান-ক্রিয়া-কর্ম ও উৎসবের মধ্যে সচল ভাবে বেঁচে থাকা নিঃসন্দেহে আর এক স্বতন্ত্র কথা। এই প্রসঙ্গে "An introduction to the Study of Indian Folklore" গ্রন্থের লেখক বলছেন ঃ

"Folklore is the vintage point of nation's civilization. It reflects the beliefs and prejudices, the attitudes and values of the millions. It can be ugly, cruel, vulgar or beautiful, kind and virtuous, as the people creating it have been…" [P. R. Subramanian, p. 5]

এই মন্তব্যের সূত্রে আমরা জানতে পারি বিহারের ওরাঁওরা মৃত্তিকাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে। শালতরুতে ফুল ফোটবার সময় প্রতি বছর সূর্য দেবতা ধর্মের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। পুরুষ-রমণীরা স্নান সারে। সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানে মোরগ বলি দেওয়া হয়। তারপর নানা অনুষ্ঠান শেষে পানাহার ও উম্মত্ত নৃত্য-গীতে সকলে মেতে ওঠে। শেষে পুরুষ ও রমণীরা কদর্য রতিক্রিয়ার মগ্ন হয়। মাটিকে ফলবতী করার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে সূর্যের ভূমিকা গ্রহণ করে পুরোহিত এবং বসুন্ধরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পুরোহিতের স্ত্রী। মনোরঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে ওরাঁওদের এই উৎসবের কথা বিবৃত করেছেন। শ্রীরায়ের গ্রন্থে আছে যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা শস্য ও মৃত্তিকা দেবীর নিকট গর্ভবতী স্ত্রী বলি দিত। তাদের বিশ্বাস যে এই মৃত সন্তান-সম্ভবা রমণী মাটিকে উর্বরাশক্তিসম্পন্ন করে তুলবে। যার ফলে মৃত্তিকার গর্ভ থেকে প্রচুর শস্য ফলে উঠবে। এই সকল তথ্য মনোরঞ্জন রায়ের 'আদিম সমাজের ইতিহাস' গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। (পৃ ১১৫ এবং পৃ ১৫০-১৫১ দ্রষ্টব্য)

উৎসসূচী

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র
কলিকাতা-১ পৃ ৪৯৬-৫৭৪ দ্রষ্টব্য

Ibid : Op. cit. ৩য় খণ্ড, ভাববাদ, পৃ ৫৮৮

Ibid : বাংলার বাউল ও বাউল গান প্রথম প্রকাশ : কলি ১৩৬৪ (১ম খণ্ড) : ১ম অধ্যায় : পৃ ৪৭-৪৮

Ibid : (১ম খণ্ড) : ১ম অধ্যায় পৃ ৫০ দ্রষ্টব্য

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: লোকায়ত দর্শন: ২য় খণ্ড: ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃ ৪৫৬ দ্রষ্টব্য

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান : পৃ ৮১-৮২

Shashi Bhusan Dasgupta : Obscure Religious Cults, Chapt VII. p. 173

Ibid : Obscure Religious Cults, Chapt VII. p. 173

Ibid : Op. cit. Chapt V. p. 141-142

Ibid : Op. cit. p. 160-161

[৪৫ থেকে ৫৯ নম্বরের বাউল গানগুলি জয়দেবের মেলা থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত]

মঞ্জরী দাসী (শিল্পী) গ্রাম ঃ মালিয়া পাড়া (বাঁকুড়া) জয়দেব মেলার আসর

সুবল বাউল (রচয়িতা)	ঃ	ঐ
মঞ্জুরী দাসী (শিল্পী)	ঃ	ঐ
অজ্ঞাত	ঃ	ঐ
নদাই গুড় গুড় বাবাজী (রচয়িতা)	ঃ	ঐ

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ঃ বাংলার বাউল ঃ পৃ ৫১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম ঃ পৃ ৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য

Shashi Bhusan Dasgupta : Obscure Religious Cults, Chapt VII. p. 181-182

Ibid : Op. cit. Chapt VII. p. 187

পদ্মলোচন (রচনা) :   জয়দেব কেন্দুবিল্বের বাউল মেলার আসর
শুকদেব দাস বাউল (গায়ক) :   ঐ
আরামঘাটা, নদীয়া
ভবানন্দ বাউল (রচনা)
পদ্মলোচন (রচনা) :   ঐ
নিতাই ক্ষেপা (গায়ক)
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান : প্রথম খণ্ড : ১ম অধ্যায় : পৃ ৬২
নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : মন মধুকর ১৩৭০ কলিকাতা, 'সতী মা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ ৬২ দ্রষ্টব্য
মণি বর্ধন : বাঙ্‌লার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, কলিকাতা :

পূর্ববঙ্গের রেলপথের প্রকাশ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত : বাংলায় ভ্রমণ-১ম খণ্ড
পৃ ২৯১-২৯৪ দ্রষ্টব্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোক-সাহিত্য (৩য় খণ্ড) কলিকাতা :
গীত ও নৃত্য : পৃ ২৪৩
আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড) পৃ ৩২২ দ্রষ্টব্য
হরিদাস পালিত : আদ্যের গম্ভীরা : ৩য় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ : 'বড় তামাসা'

'ময়ূরভট্টে বন্দিব সংগীতের আদি কবি'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : পৃ ২৬৮ দ্রষ্টব্য

অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ময়ূরভট্ট একাদশ শতাব্দীর লোক—ঐ : পৃ ২৭২ (পাদটীকা)

Ibid ঃ Op. cit. পৃ ২১ দ্রষ্টব্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড) ঃ পৃ ৪৬ দ্রষ্টব্য
Ibid ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য (৩য় খণ্ড) পৃ ৮৭-৮৮
আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য ঃ ১ম খণ্ড পৃ ২৯৭-২৯৮
সুধীর করণ ঃ সীমান্ত বাঙলার লোকযান ঃ পৃ ১৮৮ দ্রষ্টব্য
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলার ব্রত—প্রকাশক ঃ প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত ঃ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ঃ কলি পৃ ২২ দ্রষ্টব্য
সুধীর করণ ঃ সীমান্ত বাঙলার লোকযান পৃ ১৯২-১৯৪ ‘টুসু’-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড) ‘আঞ্চলিক’ পৃ ২৯৮ দ্রষ্টব্য

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান : পৃ ৮৬ দ্রষ্টব্য
তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী : বাংলার উৎসব : ভাদ্র : ১৩৬৯ কলিকাতা
'তুষ-তুষলী ব্রত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য পৃ ৭২-৭৪
Ibid : Op. cit. পৃ ৭২ দ্রষ্টব্য
Ibid : Op. cit. পৃ ৭৪ দ্রষ্টব্য
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত : পৃ ২৩ দ্রষ্টব্য

তৃতীয় অধ্যায়

লোকমাধ্যম (Folk Media) ঃ মেলা ও উৎসব

আমরা এ কথা পূর্বেই বলেছি যে—আমাদের দেশে চিরকাল মেলা ও উৎসবের সূত্রে শিল্পী ও লোককবিরা গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষকে সাহিত্যরস ও ধর্ম-শিক্ষা দান করে এসেছে। মেলা এবং উৎসবানুষ্ঠান পল্লীর দ্বারে দ্বারে লোকসাহিত্যের ধারা ও আনন্দের স্রোতকে অবিচলিত রাখার ক্ষেত্রে তাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই হিসেবে আমাদের মনে হয় দেশীয় মেলা ও উৎসবের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। সে তাৎপর্য হল লোকমাধ্যমরূপে মেলা ও উৎসবের ভূমিকা। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে পল্লীর সাধারণ মানুষ লোকশিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করে। শিল্প-সাহিত্যের ভেতর দিয়ে এই আনন্দকে প্রচার করে লোককবি, শিল্পী, গায়ক ও কথকেরা। তাই একথা মনে করা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসব পল্লীর সাধারণ লোকসমাজের কাছে সুদীর্ঘ কাল থেকে লোক মাধ্যম (Folk media) হিসেবে কাজ করে চলেছে। অখ্যাত ও নিরক্ষর লোক-কবিরা তাই মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করে পল্লীজনপদের জনতার কাছে তাদের অফুরন্ত লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। সেই লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার বলতে আমরা মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান নির্ভর লোকসঙ্গীত, ছড়া-গান, পাঠ কিংবা কথা ও কাহিনীকেই বোঝাতে চাইছি। লোকসাহিত্যের সেই অনুষ্ঠানভিত্তিক গেয় ও পাঠ্য সম্পদগুলি মেলার মধ্যে লোককবি ও শিল্পী কর্তৃক প্রচারিত হয় মুখে মুখে। প্রচার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই মৌখিক প্রাণশক্তির অবদান বিশেষ করে গ্রামের নিরক্ষর সমাজের কাছে বিশেষ মূল্যবান। যেমন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম-পুরাণাদির নানা বিষয় ও কাহিনী এবং ছড়া ও গান সাক্ষাৎ মেলা ও উৎসবের সূত্রে গীত ও পঠিত হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অচিরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লোক-কবি ও শিল্পীরা সহজ-সরল ভাষায় গ্রাম্য ঢঙে ও বিচিত্র কলাকৌশলে সেইসব বিষয়কে নিরক্ষর মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলে। তাই মেলা ও উৎসব হল সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্ম-শিক্ষার এক যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যম (Traditional folk media)।

মেলা, উৎসব এবং পল্লীর আসর-সমাবেশের মাধ্যমে লোককবি এবং জনতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাই পল্লীর উৎসব ও মেলার প্রাঙ্গণে কবি, শিল্পী, কথক ও গায়ক হল যোগাযোগকারী। এই যোগাযোগ হল শিল্প ও সাহিত্যগত যোগাযোগ (Communication in art form)।

আবার এই যোগাযোগের ভেতর দিয়েই লোকশিল্পীর সঙ্গে জনতার একটি মানসিক ঐক্য গড়ে ওঠে। এই মানসিক ঐক্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কাজ করে লোককবি ও জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগ (Face to face communication)। আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই সুযোগ বা সুবিধার অবকাশ নেই। মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের সূত্রে ব্যষ্টির কল্পনা, শিল্পভাবনা এবং নির্মাণকৌশল জনতার ভাবনা ও রসবোধের মধ্যে প্রবেশ করে সার্থক হয়ে ওঠে। কালক্রমে পল্লীর সাহিত্য-শিল্প-সম্পদ নিরক্ষর-জনতার স্মৃতিপথ ধরে বাহিত হতে হতে বৃহত্তর লোকসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। তাই মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে শিল্পী ও জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগে লোকসাহিত্যের প্রচার সুসম্পন্ন হয়।

বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে দেখলে মেলা ও উৎসবকে মনে হতে পারে যে এইসব উৎসবানুষ্ঠান নিছক আঞ্চলিক আমোদ-প্রমোদের বিতরণের কেন্দ্র এবং পণ্যসামগ্রী ও বাণিজ্যিক প্রসারের কতকগুলো তাৎক্ষণিক অনুষ্ঠান। কিন্তু আমাদের মনে হয় মেলা ও উৎসব শুধুমাত্র কোন একটা অঞ্চলের ক্ষণিক বা সাময়িক অনুষ্ঠান নয়। মেলা ও উৎসব হল আমাদের দেশের শিল্পসম্মত প্রাচীন লোকমাধ্যম যা যুগাদিক্রমে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তার চেহারায় নব্য ভাবনার রঙ্ ও আধুনিকতার প্রলেপ পড়েছে সন্দেহ নেই—তবু দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্মৃতি-সম্পদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় স্বদেশের এই সকল মেলা ও উৎসবগুলিই। এই অনুষ্ঠানগুলি তাই চলমান গ্রামীণ-জীবনের বাহন হয়ে আজও বেঁচে আছে।

গ্রামের মেলা ও উৎসবকে ঘিরে জড়ো হয় লোককবি, শিল্পী ও গায়ক। যারা পল্লী-সাহিত্য-শিল্প-সম্পদের প্রচারক। মেলা ও উৎসবের জনতাকে সমমনোভাবাপন্ন জনতা (common interest crowd) বলা যেতে পারে। এই জনতা নিঃসন্দেহে সঙ্ঘবদ্ধ এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। এই জনতাই হল লোকসাহিত্য-শিল্পানুষ্ঠানের শ্রোতা বা দর্শক। যাকে আমরা রসাস্বাদন-কারী বা ভাবসম্পদ গ্রহণকারী (Communicant অথবা recipient) নামে অভিহিত করতে পারি। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে লোককবি ও সহৃদয় জনতার যোগাযোগের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠান নির্ভর লোকসাহিত্যের প্রচার পর্বটি নির্মিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয় দুটি হল ঃ

১। যোগাযোগ (Communication)।

২। মাধ্যম (Media)।

লোক-মাধ্যম হিসেবে মেলা ও উৎসবের গুরুত্ব নির্ণয়ে যোগাযোগ ও মাধ্যম বলতে আমরা কি বুঝি তা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

১। যোগাযোগ (Communication)

আমাদের আলোচনায় 'যোগাযোগ' এবং 'মাধ্যম' শব্দ দুটির অর্থ যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। 'যোগাযোগ' এবং 'মাধ্যম' শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। কারণ কোন 'যোগাযোগ' শূন্যের ওপর ভর করে গড়ে উঠতে পারে না। তাকে একটি বাহন বা মাধ্যমকে বেছে নিতেই হয়। সেই মাধ্যম অথবা বাহনের দ্বারাই যোগাযোগ ব্যবস্থাটি কার্যকরী হয়ে ওঠে। তাই কোন কিছু প্রচারের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও মাধ্যম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার সুবিধের জন্যে 'যোগাযোগ' ও 'মাধ্যম'কে পৃথক দুটি বিষয় হিসেবে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যোগাযোগকে কোথাও কোথাও আমরা এই আলোচনায় সমাযোজন বলে অভিহিত করেছি। কারণ যোগাযোগ হল এক অর্থে সমাযোজন। আর এই সমাযোজনের মধ্যে প্রচারকারী ও গ্রহণকারীর দূরত্ব হ্রাস পেয়ে উভয়ের মধ্যে একটি নৈকট্য স্থাপিত হয়। এই নৈকট্যের আর এক নাম—যোগাযোগ।

ভাষা সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভাষাই হল পৃথিবীতে মানুষের কাছে ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগের সর্বপ্রথম স্তর। ভাষা সৃষ্টির আগে আদিম বন্যমানুষ শব্দ, ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র এবং ভাব-ব্যঞ্জনা ও নানা সংকেতের সাহায্যে সে তার মনের ভাবকে প্রকাশ ক'রে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করত। এইসব সংকেত, ব্যঞ্জনা, ধ্বনিও বিভিন্ন শব্দ (Gestures, tone, facial expression, different sounds, drum beats etc.) প্রভৃতির সাহায্যে আদিম বন্য মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে তারা তাদের সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখত। ভাষা সৃষ্টির আগে শব্দ ও ধ্বনিই ছিল যোগাযোগের প্রথম সোপান। এরপর সৃষ্টি হল ভাষা। ভাষাই হল মানব সমাজের অর্থবোধক যোগাযোগের এক সরল মাধ্যম। আবার কেউ বলেছেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা হল একটি মৌলিক যন্ত্র স্বরূপ—

"...The basic tool of communication is language..."[১]

"Communication" (যোগাযোগ) শব্দটি লাতিন শব্দ 'cmmunis' থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হল সাধারণ (common)।[২] এই যোগাযোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে এডুইনএমারি তাঁর 'Introduction to Mass Communication' গ্রন্থের এক জায়গায় বলছেন ঃ

"...Simply defined, cmmunication is the art of transmitting information, ideas, and attitudes from one person to another..."[৩]

অর্থাৎ ব্যাষ্টিমনের ভাবানুভূতি, আবেগপ্রবণতা, বিশ্বাসবোধ ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি কোন সৃজনধর্মী মনোভাব বা মানসিক বৃত্তি যখন শিল্পসম্মত

উপায়ে (in art form) ব্যষ্টি বা সমষ্টির মনে প্রেরিত হয় তখন সেই প্রেরণ ব্যবস্থাকেই সমাযোজন (communication) বা যোগাযোগ বলে। এইভাবে একজনের মনের ভাব আর একজনের মনোভূমিতে রোপিত হয়। শিল্পচেতনা এক মন থেকে উৎসারিত হয়ে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়।

অর্থাৎ—Transplanting of ideas by communication.

আমরা এ-কথা ধরে নিতে পারি যে যোগাযোগ হল একটি সামাজিক পন্থা (communication is a social process)। এই সামাজিক পন্থা মানুষকে এই সমাজে সমাজবদ্ধ করে রেখেছে। এই সামাজিক পন্থা বা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে সামাজিক কল্যাণ, আত্মিক কল্যাণ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির প্রসার ঘটে। মানুষের শুভ বোধ, সৎ বৃত্তি এবং সামাজিক চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে সার্থক মাধ্যমের (Media) দ্বারা। এই মাধ্যমের প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন মানুষ তার প্রয়োজনে লাগায় এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। অন্তরের সুপ্তভাবকে সকলের মাঝখানে ব্যাপ্ত করে দিতে চায়। দশজনের মাঝখানে মানুষ নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। কারণ নিজের হৃদয়কে অপরের কাছে উন্মুক্ত করাই হল মানুষের ধর্ম। থিওডোর পিটারসন[৪] তাঁর 'The Mass Media And Modern Society' গ্রন্থে যোগাযোগ ও মাধ্যমের কথা বলতে গিয়ে দুটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পিটারসনের মতে মানুষের মুখের ভাষা এবং উন্মীলিত চোখের পাতাই হল সাধারণভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জনমাধ্যমের সহজ ও স্বাভাবিক সূত্র। এই দুটি উপাদানের মাধ্যমে মানুষ আপন মনোভাবকে সমাজের কাছে ব্যক্ত করে। তাই সমাজবিস্তারের ক্ষেত্রে সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে এই মুখের ভাষা ও খোলা চোখের পাতাই হল যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থার প্রাচীন ও স্বাভাবিক মাধ্যম।

সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্যে মানুষের জৈবিক প্রয়োজন হল আহার ও বাসস্থান। কিন্তু শুধুমাত্র এই জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বসবাস করে না। মানুষ সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চায় এবং সমাজবন্ধ উন্নত জীব হিসেবে মানুষের সঙ্গে স্থাপন করতে চায় ভাবের আদান-প্রদান। একা একা নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের দ্বারা মানুষ তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না। খেলার জন্যে যেমন সঙ্গী দরকার, তেমনি ভাব-প্রকাশের জন্যেও দরকার যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের আধার। এই আধার হল আর একটি মন। জীবিকার প্রয়োজনে আহার ও বাসস্থান যেমন অপরিহার্য মানসিক উন্নয়নের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন হয় একজনের সঙ্গে আর একজনের যোগাযোগ স্থাপন। অতএব এই মানসিক যোগাযোগের মধ্যেই

মানুষের সামাজিক ব্যাপ্তি ও বিকাশ ঘটে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসাধন ব্যতীত এই ব্যাপ্তি ও বিকাশ সম্ভবপর হয় না। এডুইন এমারি[৫] বলছেন ঃ

"Man has another fundamental need beyond the physical requirements of food and shelter : the need to communicate with his follow human beings. This urge for communication is a primal one and, in our contemporary civilization, a necessity for survival..."

Charles S. Steinberg তাঁর 'Mass Media And Communication' গ্রন্থে সমাযোজন প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে যথার্থই বলেছেন যে, মানুষ তার নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সমাযোজনের (communication) মধ্যেই খুঁজে পায় প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর এক পরিতৃপ্ত এবং কল্যাণকর পথ। অতএব সমাযোজন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা সমাজ শুধুমাত্র বহমান নয়, যুগাদিক্রমে সমাজের মূল অস্তিত্ব বজায় রয়েছে এই যোগাযোগের মাধ্যমে। সামাজিক রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা প্রাচীনকাল থেকে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এক জীবনধারা থেকে অন্য আর এক জীবনধারায় বহমান। থিওডোর পিটারসন তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন ঃ

"...By communication man maintains his social institutions, each with its values and ways of behaving, not just from day to day but from generation to generation......

Society also uses its communication system as a teacher to pass the social heritage from one generation to the next..."[৬]

যোগাযোগ ব্যবস্থার পাঁচটি উপাদান থাকে। এই উপাদানগুলি হল ঃ

(ক) যোগাযোগকারী অথবা ভাব সরবরাহকারী বা বার্তা প্রেরণকারী
 (communicator বা sender)

(খ) ভাবগ্রহণকারী বা শিল্পরসাস্বাদনকারী
 (communicant, recipient বা receiver)

(গ) যোগাযোগের তথ্য এবং ভাবগতবিষয়
 (content or message of communication)

(ঘ) মাধ্যম বা বাহন (Media অথবা vehicle)

(ঙ) যোগাযোগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (effect of communication)

এই উপাদান-উপকরণ নিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি দু-রকমের হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

কোন ব্যক্তি যখন বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয়ে মুখে মুখে লোককে জিনিসপত্র কেনা থেকে বিরত করে এবং বক্তৃতা দেয়, অথবা শিল্পী যেখানে দশজনের সামনে দাঁড়িয়ে গান করে কিংবা শিক্ষক মহাশয় স্কুল-ঘরে দাঁড়িয়ে যখন ছাত্রদের পড়ান তখন সে-সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ

যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ বাজারদরে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ক্রেতা-সাধারণের, শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতার এবং শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে ছাত্রসমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু যখন দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সেই ব্যক্তির অসন্তোষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয় কিংবা শিল্পীর গান যখন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে অসংখ্য শ্রোতার কাছে গিয়ে পৌঁছয় অথবা শিক্ষক মহাশয়ের অধ্যাপনার রীতি দূরদর্শনের ভেতর দিয়ে যখন অসংখ্য ছাত্র সমাজের কাছে চক্ষের পলকে ব্যাপ্ত হয়ে যায় তখন প্রতিক্ষেত্রে তা হয় পরোক্ষ যোগাযোগ। কোন ব্যক্তি বা শিল্পীর কথা, গান বা বক্তৃতা যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অসংখ্য জনসমাজের মধ্যে এসে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই ব্যক্তির সঙ্গে যখন অগণিত মানুষের যোগাযোগ ঘটে তখন তাকে আমরা বলি জনযোগাযোগ (mass communication)। এই জনযোগাযোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ও শিল্পী মুহূর্তের মধ্যে অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাদের নিজ নিজ মনোভাব জানাতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন শিল্পী বা ব্যক্তির দৈহিক উপস্থিতির ভেতর দিয়ে সমষ্টির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু একথা সত্য যে বেতার, সংবাদপত্র, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্র প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে জনতার মাঝখানে সেই ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটে পরোক্ষ ভাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তা প্রেরণকারী রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বার্তা গ্রহণকারীর (জনসাধারণ) কাছে স্বয়ং উপস্থিত থাকে। তাই তার পক্ষে যোগাযোগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াটি জনতার মুখচ্ছবি থেকে বুঝে নেওয়া সহজ হয়। পরোক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিল্পী বা ব্যক্তি নিজে জনতার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করলেও তার বার্তা বা বিষয় যন্ত্র-মাধ্যমের সাহায্যে অসংখ্য জনতার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে সন্দেহ নেই কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগের দ্বারা কোন ব্যক্তি জনতার প্রভাব ও সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়াকে সেই মুহূর্তে জানতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পরোক্ষ যোগাযোগের ভেতর দিয়ে যোগাযোগের বিষয়, ভাব ও বার্তাকে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যে বুঝতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই যদিও শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য অথবা বক্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা কিংবা আলোচনা বেতার বা দূরদর্শনের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সেই যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরণকারী ও বার্তা গ্রহণকারীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটা উভয় পক্ষের কাছে অজানা ও অজ্ঞাত থেকেই যায়। গ্রামীন জনসমাজে অথবা পল্লীজনপদে আধুনিক যন্ত্রমাধ্যমের দ্বারা (Electronic Media) যোগাযোগকারীর (communicator) কোন বিশেষ বার্তা নিরক্ষর মানুষের মনের গভীরে কতখানি কার্যকরী হয় অথবা সেই জনতাকে কতটুকু প্রভাবিত করে সে ব্যাপারে ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যোগাযোগ ক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হয় পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে। কারণ যোগাযোগের উদ্দেশ্যটা সার্থক হয়ে ওঠে 'দেওয়া' এবং 'গ্রহণ' করার মাধ্যমে।

যাকে আমরা পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান (Feed back) বলে থাকি। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্রিয়াটা অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষ যোগাযোগের থেকেও অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। প্রখ্যাত সমালোচক চার্লস্ স্টেইনবার্গ এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"...If the communicator is face-to-face with the communicant, it is possible for him to judge the success of the communication by the later's reaction."[৭]

এখন মাধ্যম (Media) সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা দরকার। কারণ কোন একটা মাধ্যমকে অবলম্বন করেই যোগাযোগ ব্যবস্থা তার পক্ষ বিস্তারিত করে। তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। মাধ্যম (Media)

'মিডিয়া' ইংরেজী শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে লাতিন শব্দ 'Medius' থেকে ইংরেজী 'Medium' শব্দটা এসেছে। 'মিডিয়া' হল ইংরেজী 'মিডিয়াম' শব্দের বহুবচনের রূপ।[৮] বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়—মাধ্যম। এই মাধ্যম বলতে আমরা বুঝি নির্ভর বা নির্ভরতা। যা এক অর্থে হল অবলম্বন। অর্থাৎ মাধ্যম, নির্ভর এবং অবলম্বন শব্দগুলো মোটামুটি ভাবে একে অপরের পরিপূরক। এই মিডিয়া শব্দটার তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে ফাঙ্ক এণ্ড ওয়াগন্যালস্[৯] কৃত সুবিশাল অভিধানে বলা হয়েছে যে—

"...Anything that acts or serves intermediately, a secondary or Proximate agency by or through which a primary agent acts or moves ; a Channel ; an intervening instrumentality ;..."

এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রভাতী সংবাদপত্রকে অবলম্বন বা নির্ভর করেই খবর প্রচারিত হয়। এখানে ঐ প্রভাতী পত্র বা কাগজটা হল সংবাদ বা খবরের মাধ্যম। তেমনি টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে যখন কোন সংবাদ বা বার্তা প্রেরিত হয় তখন যন্ত্রটা হল ঐ বার্তা বা সংবাদের মাধ্যম। যার মাধ্যমে যোগাযোগের ক্রিয়াটি অর্থকরী হয়।

যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাধ্যম হল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শূন্যের ওপর ভর করে দরজার খিলান যেমন থাকতে পারে না, তেমনি কোন যোগাযোগকে সক্রিয় করে তুলতে হলে একটা মাধ্যমকে উপায় বা অবলম্বন হিসেবে বেছে নিতে হয়। অর্থাৎ—

"...every communication uses some medium, is committed to some channel for transmission."[১০]

যুগপরম্পরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে মাধ্যমের (media) পথ বা আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ যখন পর্বত-কন্দরে

অথবা গিরিগুহায় বসবাস করত তখন অঙ্গভঙ্গি, ইশারা এবং মুখ ব্যাদান, ধ্বনি-সংকেত ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে সে তার মনের ভাবকে প্রকাশ করত। সমাজের প্রগতি ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা এবং রুচি ও সংস্কারের পরিবর্তন হল। মানুষ তার ভাব প্রকাশের মাধ্যমের আঙ্গিক হিসেবে মুখের ভাষাকেই পছন্দ করল বেশি। মুখে মুখে কথা-গান, ছড়া-কাহিনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে মানুষ তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে চাইল। যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থার এটা ছিল একটা মৌখিক রূপ বা মৌখিক মাধ্যম (oral media in communication)।

চর্যাপদ রচনার যুগে লোককবি বা চারণ কবিগণ পথে-প্রান্তরে, মেলা ও উৎসবে মুখে মুখে গান গেয়ে, ছড়া বলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। এইভাবে কালক্রমে মুখের ভাষা থেকে মানুষ আবিষ্কার করল লিপি ও অক্ষরকে। আর রূপ, রঙ ও রেখা থেকে মানুষ সৃষ্টি করল শিল্প-সুষমাকে।

বৌদ্ধযুগে পাহাড়ে, পর্বতগাত্রে, শিলাখণ্ডে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করে দেওয়া হত। সেদিন পর্বতগাত্র, শিলাখণ্ড ও বৌদ্ধস্তূপের প্রাচীরগুলি ছিল বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম। এইসব মাধ্যমের দ্বারাই জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হত। এ-ছাড়া ছিল বৌদ্ধ সংঘটু, সম্মেলন, সভা ও সমাবেশ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম প্রচার মাধ্যমের উপযুক্ত স্থল। বিভিন্ন বৌদ্ধ উৎসবের মাধ্যমেও গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত মত ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে অবাধে প্রচার করা হত। এই জাতীয় মাধ্যমই ছিল সে-যুগের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন। যাকে বলা হয় কথামাধ্যম (Talk Media)।

ইউরোপের ইতিহাস পাঠেও আমরা জানতে পারি যে প্রথম শতাব্দীতে স্বয়ং যীশু মানুষের বোধশক্তি ও অনুভূতির বিকাশের জন্যে এমন কয়েকটি সহজসাধ্য বিষয়কে মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, যেগুলো অতি সহজেই সাধারণের বোধগম্য হয়। এর দ্বারা আমাদের মনে হয় যে মাধ্যমকে সর্বাগ্রে হতে হবে সহজ ও সাবলীল। যাতে অনায়াসে সাধারণ মানুষ সেই মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে। যীশু তাই মানুষের চিত্তবৃত্তি এবং জ্ঞান-গরিমাকে প্রস্ফুটিত করে তোলার জন্যে তাঁর বাণী ও আদর্শকে এমনভাবে প্রচার করতে লাগলেন যাতে সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারেনি। ইউরোপের প্রাচীন ধর্মযাজকগণের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারায়ণ বসু [১১] তাঁর Process of Communication গ্রন্থের এক জায়গায় বলছেন ঃ

"...During the dark ages monks made their writings more interesting through carefully made illustrations and some years later inscribed perchments and sand stone and plans for great cathdrals etc...."

ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, রেঁনেশাস প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতে নতুন চেতনার সৃষ্টি হল। কারিগরি বিদ্যার সাথে সাথে যন্ত্র-বিজ্ঞান-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হল। এর প্রভাব পড়ল সমগ্র পৃথিবীতে। যার ফলে দেখা দিল মানব সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক অগ্রগতি। এই সময় থেকেই মানুষ তার নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থার প্রসারের জন্যে প্রাচীন আঙ্গিকগুলোকে ভেঙে ফেলে কালক্রমে নানা রকমের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মাধ্যমের প্রবর্তন করল। এইসব আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর মাধ্যমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) মুদ্রণ শিল্পমাধ্যম (**Print media**)
(খ) বৈদ্যুতিক শিল্পমাধ্যম (**Electronic media**)
(গ) কথামাধ্যম (**Verbal media**)
(ঘ) দৃশ্যমাধ্যম (**Visual media**)
(ঙ) বেতারমাধ্যম (**Aerial media—Radio, Television etc.**)
(চ) ছবি, বিজ্ঞানপত্র, প্রাচীরপত্র এবং আলোকচিত্র শিল্পমাধ্যম (**Slide, Posters and Photographic media**)

যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication) এবং মাধ্যমের (media) আঙ্গিকগত প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক অগ্রগতির পাশাপাশি রয়েছে আমাদের দেশের যুগ পরম্পরাগত লোকমাধ্যম (Traditional folk media)। এই লোকমাধ্যমের দ্বারা পল্লীজনপদের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম ও আনন্দ বিতরণ করা হয়। যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পল্লীর নিরক্ষর মানুষেরা অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট হয় তাকে আমরা লোক-মাধ্যম বলতে পারি। কথাটা আরও একটু স্বচ্ছ করে বলা দরকার। লোক-মাধ্যম হল যুগবাহিত। পল্লী জীবনের ধর্ম, কর্ম, ভাবনা-অনুভূতি, আচার-ব্যবহারের সঙ্গে যে মাধ্যম যুগাদিক্রমে অন্বিষ্ট হয়ে থাকে এবং সেই মাধ্যমের দ্বারা যখন কোন বিষয় নিরক্ষর মানুষের বোধগম্য হয় তখন তাকে আমরা লোকমাধ্যম বলতে পারি। সেই মাধ্যমের দ্বারা লোক-সাহিত্যের শিল্প-সম্পদ নিরক্ষর মানুষের মনের অববাহিকায় যখন এসে ছড়িয়ে পড়ে তখনই তারা তাদের মানসিক অনুভূতি ও স্বাভাবিক প্রাণাবেগ দিয়ে সেই শিল্প-সম্পদকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। মেলা ও উৎসবে জনতা ও শিল্পীর নৈকট্য এবং মুখোমুখি সাক্ষাৎ লোকমাধ্যমের ক্ষেত্রে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'লোক' শব্দটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা যোগ আছে। এই সাধারণ মানুষেরা পল্লীর জনপদে, মাঠে, জঙ্গলের ধারে কিংবা নদীতীরে বসবাস করে। যাদের জীবনধারার সঙ্গে কৃষিকর্ম যুক্ত হয়ে আছে অথবা যাদের জীবিকা নির্বাহিত হয় হাল, লাঙ্গল, মাঠ এবং গবাদি পশুকে অবলম্বন করে। পল্লীর শ্রমিক, কৃষক, মজুর ও বিভিন্ন পেশার মানুষেরাও এই সাধারণ

লোকের অন্তর্ভুক্ত। তাই লোকমাধ্যম হল পল্লীর সেই সাধারণ নিরক্ষর শ্রমজীবি ও কৃষিজীবি মানুষের মাধ্যম। আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞান বা যন্ত্র-মাধ্যম অপেক্ষা পল্লীর নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে প্রাচীন যুগবাহিত লোকমাধ্যম বিশেষ কার্যকরী হয় বলে আমাদের ধারণা। পল্লীর সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনচর্চার ভেতর দিয়ে অভ্যাসবশত যেসব সংস্কার, অভিজ্ঞতা ও আবেগ-অনুভূতি লাভ করে তারই প্রতিরূপ যখন সে আর কিছুর মধ্যে দেখতে পায় তখন তাকেই সে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পদ বলে গ্রহণ করে। পল্লীর মানুষের কাছে যা অপরিজ্ঞাত, দূরতম এবং বুদ্ধি-বোধ ও অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থান করে তাকে তারা গ্রহণ করে না। পল্লীর মানুষকে লোক-সাহিত্যের ভেতর দিয়ে আনন্দ শিক্ষা ও ধর্মানুভূতি এবং কাব্যরস দান করতে হলে তার বিষয় ও ভাবকে সাধারণ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হতে হবে। তবেই সেই প্রচারিত শিল্প সম্পদ পল্লীর মানুষের কাছে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষেরা তখনই সেইসব শিল্প সম্পদের ভাব ও রসকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ জ্ঞান ও শিল্প মাটির কাছাকাছি মানুষজনকে কতখানি প্রভাবিত করবে সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ আছে।

আজ বৃহত্তর জন-যোগাযোগের (Mass Communication) ক্ষেত্রে জন-মাধ্যমের (Mass Media) ক্ষেত্র ব্যাপকতর হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরই পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাসী লোক মাধ্যমকে (Folk media) সক্রিয় করে তুলতে হবে। কারণ আমাদের সমাজে শতকরা আশী ভাগ লোক নিরক্ষর। এই নিরক্ষর শ্রেণী বৈদ্যুতিক শিল্প মাধ্যমের আওতার বাইরে অবস্থান করে। জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবের জন্যে তারা জন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান-শিল্প মাধ্যম থেকে সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। পল্লীর এই বৃহত্তর শ্রেণীটার মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সংহতি আনতে পারে একমাত্র লোকমাধ্যম। তাই লোক-সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রচার পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে। তাদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা থাকলেও লোক-সাহিত্যের শিল্পরস ও ভাববস্তু অতি সহজেই তাদের কাছে বোধগম্য হয় এবং সাক্ষরহীন এই মানুষগুলোর জীবনে লোকসাহিত্যের শিল্পসম্পদ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের মধ্যে শত-সহস্র বিভিন্নতা থাকলেও তারা লোকসাহিত্যের শিল্প চেতনার সায়রে অবগাহন করে শিল্পীর সঙ্গে অভিন্নহৃদয় ও সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতার, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের এবং কথকঠাকুরের সঙ্গে আসরে বসা মানুষের চেতনাগত ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু কেন জাগ্রত হয়ে ওঠে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। লোকসাহিত্যের শিল্পরস ও আবেদন হঠাৎ সৃষ্টি

হয়ে ওঠা কোন আকস্মিক সম্পদ নয়, তা যুগের দ্বারা স্বীকৃত ও পরীক্ষিত। মৌখিক প্রচারের মধ্য দিয়ে এই লোকসাহিত্য আবার বৃহত্তর সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মাটির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের শিল্পানুভূতি ও রচনাসম্পদ ব্যক্তিবিশেষের দান হলেও সমষ্টি মনের সঙ্গে তার একটা অকৃত্রিম যোগ রয়েছে। তাই এই যোগ সমসাময়িক বা বিশেষ কালের কিংবা ক্ষণিক নয়, তা যুগবাহিত। এর আবেদন তাই পল্লীর নিরক্ষর আপামর সাধারণ মানুষের কাছে সর্বকালে বা সর্বসময়ে স্বীকৃত। আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুলি পল্লী জনতার কাছে যুগাদিক্রমে লোক-মাধ্যমের কাজ করে চলেছে। এই লোকমাধ্যমের একাধিক পথ-প্রকরণ ও আঙ্গিক চালু থাকলেও সামগ্রিকভাবে মেলা ও উৎসব হল পল্লীর সমাযোজনের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকমাধ্যম। রেডিও, টেলিভিসন, সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি জন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক জনমাধ্যমের একটা বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রণালী বা নূতন পদ্ধতি-শিল্প হিসেবে যেমন কোন বিষয় বা বার্তা প্রচারের সম্পূর্ণ বাহন হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমেও লোকসাহিত্যের রসসম্পদের ভাণ্ডার সদা উন্মুক্ত হয়। পল্লীর মানুষের কাছে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করার ক্ষেত্রে এবং প্রাচীন লোকমাধ্যমের একটা স্বাভাবিক প্রণালী বা পদ্ধতি হিসেবে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুলি লোকসাহিত্য-শিল্প-সম্পদের বাহন (Vehicle) রূপে আবহমান কাল ধরে কাজ করে চলেছে। পল্লীর সমাযোজনের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান কোন্ কোন্ প্রণালী ও পদ্ধতিতে লোকমাধ্যম হিসেবে কাজ করে সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। বিচারের সুবিধের জন্যে এই আলোচনার ধারাকে আমরা বিশেষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছি।

১। মেলা ও উৎসবের উপাদান-উপকরণ।
২। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যোগাযোগ বা সমাযোজন।
৩। লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা ও উৎসবের নানা আঙ্গিক (Form)।
৪। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে জনতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।
৫। শিল্পসম্মত যোগসাধন (Feed back in art form)।

১। মেলা ও উৎসবের উপাদান-উপকরণ

ইতিপূর্বে আমরা মেলা ও উৎসবের তাৎপর্য এবং পরিচয় প্রসঙ্গে তাদের উপাদান-উপকরণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে এসেছি। এখানে সমাযোজন ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে সেইসব উপাদান-উপকরণ কিভাবে কাজ করে তা বিচার করে দেখা দরকার।

মেলা ও উৎসবের প্রধান উপাদান হল শিল্পী, লোককবি, গায়ক, কথক এবং জনতা বা জনমণ্ডলী। মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের নানা ক্রিয়াকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যবসাগত পণ্যসামগ্রী প্রভৃতিও মেলা ও উৎসবের

উপাদানের অন্তর্গত। আবহমানকাল ধরে লোককবি, গায়ক ও কথক পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষকে শিল্প, সাহিত্য, কাব্য ও লোকশিক্ষা দান করে আসছে। সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা হল লোকসাহিত্যের শিল্প-সম্পদ যা লোককবি ও শিল্পীগণের দ্বারা মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গীত ও প্রচারিত হয়। তাই শিল্পী ও লোককবিরা হল মেলা ও উৎসবের শিল্প-সম্পদের প্রচারকারী। এই প্রচারকারীরা কি করে? উৎসব উপলক্ষে ছড়া-গান করে, কথকতার আসরে বসে কথকঠাকুর মুখে মুখে কথা ও গান শোনায়। এইভাবে লোকসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্যের প্রচার ঘটে। এই প্রচারের ভেতর দিয়ে তাদের সঙ্গে পল্লীর নিরক্ষর জনতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হল মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান। আর সেই মাধ্যমের বিষয় হল অনুষ্ঠানভিত্তিক লোকসাহিত্য। অতএব মেলা ও উৎসবের লোককবি ও শিল্পীরা হল যোগাযোগকারী (Communicator বা Sender)। আর এই প্রচার ও যোগাযোগ যাদের উদ্দেশ্য করে গড়ে ওঠে তারা হল লোকসাহিত্যের ভাব-শিল্প রস গ্রহণকারী বা রসাস্বাদনকারী জনতা (communicant বা recipient)। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে ছড়া-গান, কথকতা, হরিকথা, ভাগবত কথা, রামায়ণ গান, কবিগান, লোক-নৃত্য, পুতুলনাচ প্রভৃতি প্রাচীন লোকমাধ্যমগত আঙ্গিকের সাহায্যে পল্লীর নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে লোকশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ও ক্যব্যরস দান করা হয়। লোককবি ও শিল্পী সহজ সরল উপায়ে নানা কাব্য ও শিল্পের বিষয়কে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই যোগাযোগ স্থাপন কিসের জন্যে এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। তাই এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

একই উদ্দেশ্যে মেলা ও উৎসবকে ঘিরে যে জনতা একই বৃত্তে এসে জড়ো হয় তারা সমমনোভাবাপন্ন জনতা (common interest crowd)। সেই জনতা হল এক অর্থে সমষ্টি মন। আর লোককবি ও শিল্পীরা হল ব্যষ্টি মন। এই ব্যষ্টি মন ও সমষ্টি মনের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যেমন যোগাযোগ স্থাপিত হয় তেমনি উভয়ের ভেতর গড়ে ওঠে একটা মানসিক ঐক্য। উৎসবে পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং শ্রবণীয় ও পঠনীয় লোক-সাহিত্য প্রচারের ভেতর দিয়ে প্রাচীন সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং দেশের অতীত স্মৃতি সম্পদের সঙ্গে পল্লী জনতার যে নিবিড় পরিচয় হয় সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করে বলেছি যে এই পরিচয় এক অর্থে প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগ। এই যোগাযোগের সেতু রচিত হয় মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে।

মেলা ও উৎসবের সূত্রে লোককবি ও শিল্পীগণের দ্বারা অনুষ্ঠানভিত্তিক লোকসাহিত্য পল্লীসমাজে প্রচার লাভ করে। এই প্রচার হল যোগাযোগ স্থাপনের আর এক উদ্দেশ্য। ব্যষ্টির অবদান সমষ্টির স্বীকৃতি লাভের জন্যে মেলা ও উৎসবের মত যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যমকে নির্ভর করে বৃহত্তর লোকসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। মেলা ও উৎসবের ভেতর দিয়ে

নিরক্ষর পল্লী মানুষের কাছে লোকসাহিত্যের প্রচার ও প্রবেশ যেমন সম্ভব হয় তেমনি কবি ও শিল্পী স্বতস্ফূর্তভাবে গান, ছড়া এবং কথা ও কাহিনীর সূত্রে আনন্দ ও শিক্ষাকে পল্লীর আপামর জনতার কাছে বিতরণ করে।

মেলা ও উৎসবের উপাদান ও উপকরণ গঠনে লোককবি, শিল্পী এবং কথক ও গায়কের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তেমনি উৎসবের সমমনোভাবাপন্ন জনতারও অবদান কোন অংশে কম নয়। কারণ ব্যষ্টির রচনাসম্পদ আস্বাদিত হয় সমষ্টির প্রাণাবেগের দ্বারা। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে মেলা ও উৎসবের একই মঞ্চে। তাই উভয়ের পক্ষেই সহজ হয় একে অপরকে জানার ও বোঝার। কবি শিল্পী ও জনতা বা জনমণ্ডলীর সাক্ষাৎ দর্শনে তাই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থাটি স্বাভাবিক উপায়েই স্থাপিত হয়। যাকে বলা হয় উভয়ের মুখোমুখি সাক্ষাৎ দর্শন বা face to face communication।

সমমনোভাবাপন্ন রসিক জনমণ্ডলীকে মেলা ও উৎসবের প্রধান উপাদান বলে আমাদের মনে হয়। কারণ এই জনতাই উৎসব নির্ভর লোকসাহিত্যকে সজীব করে তোলে। মৌখিক ভাবে এই জনতার সামনেই লোকসাহিত্যের নানা বিষয় প্রচারিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শাস্ত্র-পুরাণ এবং মঙ্গল কাব্যের মত উচ্চভাববিশিষ্ট মহৎ কাব্য-সাহিত্যের বিষয়কে নিয়েও সহজ সরল ও সাবলীলভাবে মেলা ও উৎসবের আসরে জনতার সামনে লোককবি ছড়া কাটে, কথা ও কাহিনী পাঠ করে ও গান করে। কথক, কবি ও গায়েনের দল পল্লীর নিরক্ষর মানুষের উপযোগী করে এই সব বিষয়কে তাদের কাছে তুলে ধরে। পল্লীর আপামর শ্রেণীর দ্বারা আস্বাদিত হতে হতে আবহমান কাল ধরে এইসব পল্লী-সাহিত্য প্রচারিত হয়ে আসছে। এইভাবে লোককবি ও শিল্পী পল্লীজনতার সঙ্গে মহৎ শিল্প-সাহিত্যের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। মেলা ও উৎসব সেই যোগাযোগের সহজতম লোকমাধ্যম। এই লোকমাধ্যমকে অবলম্বন করেই মহৎ সাহিত্যের বিকাশ ও প্রচার সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে জনমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করার।

মনোমোহন ঘোষ[১২] তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"...The recitation of epic poems such as the Ramāyana, the Mahābhārata, the Bhāgavata and other Purānas, which generally takes place on the occasion of religious festivals has some kind of abhinaya associated with it. For Kathakas just like good orators, are required to make a liberal use of gestures for impressing the audience with what they deliver. The theory of the origin of Hindu plays from epic recitation which is otherwise justified, receives an additional support from this fact too"......

"Kathakas or those who read before an audience episodes from original epics (Mbh. or R.) or the Puranās, and explain

them with the art of a good story-teller interspersing their narration with songs, or musical recitation of original Sanskrit passages." এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা এবং উৎসবের গুরুত্ব ও ভূমিকা যে কতখানি সক্রিয় ও সুদূরপ্রসারী তা সহজেই অনুমেয়।

২। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যোগাযোগ বা সমাযোজন

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছি। যেমন—

(ক) ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির যোগাযোগ

(খ) দেশের স্মৃতি সম্পদ ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যোগাযোগ

(গ) কাব্য-সাহিত্য ও ধর্ম-শাস্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ

(ক) ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির যোগাযোগ

একথা আমরা আগেই বলেছি যে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির যোগাযোগ ঘটে মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে। ব্যষ্টি তার মনের ভাবকে প্রকাশ করার নানা পথ খোঁজে। কখনও ভাষায় কখনও ইঙ্গিতে, আবার কখনও সংকেত বা ইশারায় কিংবা প্রতীক চিহ্ন দিয়ে সে তার মনের ভাবকে শিল্পসম্মত উপায়ে (In art form) প্রকাশ করে। এইসব সংকেত ও চিহ্ন শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে ব্যষ্টি মনের ভাব ও আবেগপ্রবণতা সমষ্টি মনের কাছে প্রকাশিত হয়। বাউলের একতারা সম্বলিত নৃত্য, গাজন-নৃত্য, মুখোস-নৃত্য এবং ছৌ-নাচের নৃত্যের ভেতর দিয়ে নীরব অভিব্যক্তি সমষ্টির মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে। কারণ লোককবি ও শিল্পীর সাক্ষাৎ উপস্থিতি ঘটে মেলা ও উৎসবের আসরে। ব্যষ্টি এখানে সমষ্টির মুখোমুখি হয়। উভয়ের এই মুখোমুখি যোগাযোগ (face to face communication) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসাহিত্যের শিল্প-সম্পদের রসাত্মক আবেদন সমষ্টির মনে অতি সহজেই পৌঁছে যায়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ (direct communication) মেলা ও উৎসবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। উৎসবের একই মঞ্চে এসে দাঁড়ায় রসাস্বাদনকারী জনতা এবং শিল্প-সাহিত্য-সম্পদ প্রেরণকারী লোককবি ও শিল্পী। অর্থাৎ—

"...both the communicator and the communicanl stood on the same platform..."[১৩]

মেলা ও উৎসবে শিল্পী বা ব্যষ্টির মৌখিক প্রচারের দ্বারা সমষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন হয় উভয়ের সাক্ষাৎ দর্শনে। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে আছে 'প্রত্যক্ষদর্শী লোকানাং সর্বদর্শী ভবেন্নবঃ।' জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

যোগ মানুষকে সর্বদর্শী করে তোলে। মহাভারতের এই কথাটি উদ্ধৃত করে শ্যাম পারমার[১৪] তাঁর Traditional Folk Media in India গ্রন্থে বলছেন ঃ

"A direct touch with the people makes a person Omniscient".

একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে পল্লীবাংলার মেলা ও উৎসবে জনতা ও শিল্পীর মুখোমুখি যোগাযোগের ভেতর দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক স্থাপনের পথ হল অনুষ্ঠান নির্ভর বাংলার লোকসাহিত্য। ব্যষ্টির শিল্পপ্রতিভায় সমষ্টিমন প্রভাবিত হয়ে ওঠে। আধুনিক যন্ত্র শিল্প ও বিজ্ঞান মাধ্যমের দ্বারা শিল্পী, কবি প্রভৃতির সঙ্গে সমষ্টির সাক্ষাৎ বা মুখোমুখি যোগাযোগ অবশ্য স্থাপিত হয় এবং শিল্প-সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপক প্রচারও সম্ভব হয়, কিন্তু সেই প্রচারে সবসময়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি মুখোমুখি অবস্থান করে না। মুখোমুখি যোগাযোগ ও প্রচারের একটা মূল্য আছে তা হল যোগাযোগ বা সমাযোজনকারী তার প্রচার ও যোগাযোগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াটা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করে। সাক্ষাৎ ও মুখোমুখি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি মন ও সমষ্টি মনের মধ্যে ভাবের যোগসাধন সম্পন্ন হয়। এই যোগসাধন সম্পন্নের মূলে রয়েছে মেলা ও উৎসবের জনতা এবং লোক-শিল্পীর নৈকট্য স্থাপন। এডুইন এমারি[১৫] সাক্ষাৎ বা মুখোমুখি যোগাযোগ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন ঃ

"...there is much more discernible feed back in person to person communication than in mass media communication, and thus a better opportunity to deliver a convincing message face to face..."

কথক ঠাকুর যখন মেলা ও উৎসবের আসরে বসে রামায়ণ থেকে হনুমানের লঙ্কা কাণ্ড পাঠ করে অথবা গম্ভীরার লোককবি যখন দেশের কোন সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয়কে নিয়ে ছড়া কাটে বা গান করে কিংবা বাউল-মেলার আসরে বাউল যখন জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাউল গান শোনায় অথবা নৃত্য করে তখন সাধারণ মানুষের মনে এইসব গেয় সম্পদের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্প সুষমার প্রভাব পড়ে গভীরভাবে। কথক ঠাকুরের মুখে সাগর লঙ্ঘনের জন্য হনুমানের লম্ফ প্রদানের কথা শুনে শ্রোতার মনও লাফ দেয়। গম্ভীরার লোককবি দেশের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে যখন ছড়া কাটে এবং শিবের কাছে তার প্রতিকার ভিক্ষা করে তখন নিরক্ষর মানুষ সান্ত্বনাবোধ করে এবং শিবের সাহায্য লাভের জন্যে সেও যেন মরীয়া হয়ে ওঠে। নৃত্যসমৃদ্ধ এবং সুর-লয় যুক্ত বাউল গান শুনে সমষ্টি মনের মধ্যেও নাচনের দোলা লাগে। বাউল গানের মর্মবাণী না বুঝেও জনতা বাউলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। কখনও আবার মেলা ও উৎসবের মঞ্চে এসে সেইসব শিল্পীরা জনতার মধ্যে লোকশিক্ষা দান করে। যোগাযোগকারী তখন শিল্পী না হয়ে নিরক্ষর

সমাজের কাছে শিক্ষক ও নীতিবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ শিল্পী ও লোককবি বুঝতে বা জানতে চায় যে তাদের নিজ নিজ প্রচার-শিল্প জনতার কাছে কতখানি কার্যকরী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ—

"Person or agency who is the source or originator of message transfers ideas to the audience and recognises that his message must get through."[১৬]

(খ) দেশের স্মৃতিসম্পদ ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যোগাযোগ

মেলা ও উৎসবের অনুষ্ঠানগত বিভিন্ন ক্রিয়াচারের ভেতর দিয়ে প্রাচীন সমাজ ও মানুষের নানা সংস্কার এবং ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যুগপরম্পরায় প্রাচীন মানুষের বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত ধর্ম ও সংস্কারগুলি মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত আচার-আচরণের মধ্যে মনে হয় আজও সজীব হয়ে আছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মানুষ যখন বিশেষ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করে তখন সেইসব ক্রিয়ানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রাচীন সমাজের জাদু বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ইঁদপরবে ইঁদতলায় ইঁদকাঠ পূজা, ইতুব্রতে ঘট স্থাপন এবং ইতুঘটকে পূজা করা, তোষলা ব্রতের পূজায় মাটির সরায় শস্য ও মৃত্তিকা স্থাপন করে শস্যোদ্গমের প্রতীক্ষায় বসে থাকা এবং তুঁষ, দূর্বাঘাস, কালো গরুর গোবর প্রভৃতি যোগে মণ্ড তৈরী করে সরায় স্থাপন এবং ব্রত উদ্যাপন করা অথবা করম উৎসবে করম ও ধরম নামে বৃক্ষের ডাল পূজা করার মধ্য দিয়ে প্রাচীন মানুষের আরণ্যক প্রীতি, বৃক্ষপূজার প্রবণতা এবং ইতুব্রতের মধ্য দিয়ে সূর্য বন্দনা এবং কৃষিকর্ম ও ভূমিলক্ষ্মীর প্রতি প্রাচীন নর-নারীর আসক্তি প্রভৃতি সংস্কার ও ধর্মবোধ প্রকাশ পায়। এছাড়া বিভিন্ন ব্রতোৎসবের মধ্যে মানুষের মনস্কামনার স্বরূপটাও উপলব্ধি করা যায়। যা ঘটেনি অথবা যা ঘটলে পরিবার ও সমাজের কল্যাণ হয় ব্রতীরা ব্রতোৎসবের মধ্যে কাল্পনিক অনুষ্ঠান এবং আচার-বিচার পালন করে তাকেই মনে মনে কামনা করে। বসুধারা ব্রত, বৃষ্টি কামনার ব্রত, তোষলা ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত এবং ভাদুলী ব্রতাচারের ভেতর দিয়ে সেইসব অতীত মানুষের জাদু বিশ্বাসগত প্রবণতা পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। এখনও প্রস্তররূপী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং পূজার নৈবেদ্যস্বরূপ বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ প্রদানের ভেতর দিয়ে আদিম মানুষের নরবলি প্রথার স্মৃতি জেগে ওঠে। গাজন উৎসবে ডিম ভাঙার প্রথাও নরবলির সেই আদিম স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ-কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে গুণরত্ন[১৭] বর্ণিত লোকায়তিকদের রতি উৎসবের প্রাচীন ধারাটা বাংলাদেশের সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশেষ একটি উৎসবের মধ্যে আজও অব্যাহত আছে। গুণ-রত্নের কথায় আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন লোকায়তিকরা বছরের কোন এক বিশেষ দিনে সকলে একত্রে মিলিত হত এবং যথেচ্ছ রমণীদের সঙ্গে রতিক্রিয়ায়

লিপ্ত হয়ে পাঁচটা দিন তারা এইভাবে কাটিয়ে দিত। বাংলাদেশের সাঁওতালী অঞ্চলে এই জাতীয় উৎসব পৌষমাসে আজও অনুষ্ঠিত হয় বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[১৮] মত প্রকাশ করেছেন। পূর্বে এই উৎসব আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হত। এখন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মাসে। সুধীর করণ[১৯] সাঁওতালদের এই উৎসবকে 'সোহরাই' পরব বলে অভিহিত করেছেন। 'সোহরাই' শব্দের অর্থ হল হিম ঋতু। এই উৎসব সম্ভবতঃ হিমঋতুর উৎসব। সীমান্ত বাংলার সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল প্রমত্তভাবে নৃত্য-গীত, মদ্যপান ও ব্যভিচার। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে গ্রামের মোড়লের বক্তৃতা দানের পর নির্দিষ্ট নারী ব্যতীত মৈথুন ব্যাপারে সাঁওতালেরা রমণীদের সঙ্গে অবাধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। 'সোহরাই' উৎসব উপলক্ষে অবিরাম নাচ ও গান চলে। শোনা যায় গ্রামপ্রধান সকলকে ডেকে নানান কথা বলে অবাধ ও যথেচ্ছ যৌন মিলনের অনুমতি দান করলেও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নারী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। কারণ মনে করা হয় এই সকল রমণীরা অগম্য ক্ষেত্র। মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম, উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম-বাঁকুড়া এবং সীমান্তবর্তী বীরভূমের সাঁওতালী অঞ্চলসমূহে এই 'সোহরাই' উৎসব উপলক্ষে অবাধ ব্যভিচারের কথা সুধীর করণও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই উৎসবে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা গো-অর্চনাও করে।

সাঁওতালদের এই রতি উৎসবের মধ্যে তাদের জাদু বিশ্বাসও কাজ করে। এই রতি উৎসব সাঁওতালদের পক্ষে নিদারুণ কলঙ্কস্বরূপ। তবু তাদের এই উৎসব নিতান্ত ভোগসর্বস্ব নয়। রমণীর ফলপ্রসূতা এবং মৃত্তিকাশক্তির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তির কথা মনে করেই রতি সংক্রান্ত এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সেই প্রজননশীলতাকে সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ আপন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে আসছে। বর্তমানের এই রতি উৎসব যেন তারই ছায়া-প্রচ্ছায়া মাত্র।

হলকর্ষণকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন মানুষের কৃষিসংক্রান্ত ধর্ম ও বিশ্বাস-বোধ একদিন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। জমিকে কর্ষণযোগ্য করে জমির উৎপাদিকা শক্তিকে ভূমিগর্ভ থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যই প্রাচীন মানুষেরা গো-পূজা, কৃষি-সংক্রান্ত পূজা, বিভিন্ন উৎসব ও বার ব্রত পালন করত। কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাসের জন্ম এর থেকেই এসেছে বলে আমাদের অনুমান। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস হল মানবীয় জননশক্তির সাহায্যে ও সংস্পর্শে প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনার এক কাল্পনিক প্রয়াস। প্রকৃতি ও মানুষের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সমজাতীয়। উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। জীব সৃষ্টি ও শস্য সৃষ্টি মূলত অভিন্ন। সন্তান সৃষ্টির রহস্য এবং শস্যোৎপাদনের রহস্য যেন সেই একই মৌলিক রহস্যের এ-পিঠ এবং ও-পিঠ। তাই মানবীয়

ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে পারলে প্রকৃতির প্রজনন রহস্যকেও বুঝতে পারা যাবে। আমাদের সমাজে নারীর উর্বরাশক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির প্রজনন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তাই কৃষিকর্মে মেয়েদের ভূমিকাটি যেমন প্রধান তেমনই জন্ম ব্যবস্থায় নারীই হল প্রধান। কৃষি ব্যবস্থায় মেয়েরা প্রধান এইজন্যে যে মেয়েদের উর্বরাশক্তির মূলে আছে ধাতুরাজ। তাই মেয়েরা প্রধান, প্রকৃতি অপ্রধান। পুরুষ অপ্রধান, উদাসীন। পূর্বোল্লিখিত সাঁওতালদের রতি উৎসবের মধ্যে কৃষিমূলক এই জাদু বিশ্বাসটাই কাজ করে বলে আমাদের মনে হয়। প্রাচীন লোকায়তিকদের দ্বারা প্রচলিত এই আচার ও সংস্কারের ধারাটি যুগাদিক্রমে সাঁওতালদের এই রতি উৎসবের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। প্রাচীন লোকায়তিকরাও ছিল কৃষিজীবি। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় কৃষির সঙ্গে মানুষ তার জীবন ও জীবিকাকে একাত্ম করে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের[২০] মতে কৃষির ভেতর দিয়ে একদিন প্রাচীন মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে পৃথিবীর গর্ভস্থিত প্রজননশক্তির মাহাত্মকে আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল। আমাদের মনে হয় সেই জননশক্তির রহস্যকে অনুধাবন করার জন্যেই প্রাচীন মানুষদের এইসব বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন। সাঁওতালদের 'সোহরাই' উৎসবের ক্রিয়াচারের ভেতর দিয়ে নারীর সেই প্রচ্ছন্ন জননশক্তিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। পুরুষ ও রমণীর যৌনসংসর্গের প্রভাব কৃষিক্ষেত্র বা উদ্ভিদের ওপরও পড়ে। প্রাচীন মানুষের মধ্যে সেদিন এই জাদু বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল। আদিম নরনারী তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে জ্ঞানলাভ করেছে যে পুরুষ ও রমণীর যৌন সংসর্গ থেকেই সন্তান জন্মলাভ করে। 'আদিম সমাজের ইতিহাস'[২১] গ্রন্থে মনোরঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে মধ্য আমেরিকার পিপিলেস ইণ্ডিয়ানরা বীজ বপনের চারদিন আগে স্ত্রী-সংসর্গ থেকে বিরত হয়ে বীজবপনের পূর্বরাত্রে স্ত্রী-মিলনে রত হত। তাদের বিশ্বাস যে এই প্রথাতে কৃষিক্ষেত্রে শস্যবপন করা হলে প্রচুর ফসল ফলে উঠবে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের[২২] আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে জাভা দ্বীপের কোন কোন গ্রামে ধান পাকবার সময়ে কৃষিদম্পতি রাত্রে ক্ষেতে গিয়ে সেই ক্ষেতের ওপরেই রতিকার্যে লিপ্ত হত। তাদের বিশ্বাস এর ফলেই শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এটা তাদের এক ধরনের জাদু বিশ্বাস। আদিম মানুষের এইসব জাদু বিশ্বাসগুলি এক অর্থে দেশের প্রাচীন নরনারীর বিশ্বাসবোধ ও সংস্কারের ফুল ও ফসল। আজ সেগুলি স্মৃতি-সম্পদ হয়ে আছে। কারণ ঃ

"...In festivals there is a scope to observe the primitive behaviour and collective ritual. The tendency of primitive behaviour to rely upon magic involves the participation of the social group, tribe or family in activities which are held to arouse the interests of the whole group."[২৩]

(গ) কাব্য-সাহিত্য ও ধর্ম-শাস্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ

মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল ছড়া ও গান গীত হয় তার উপাদান বা বিষয় অনেক ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয় এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুখে মুখে গীত ও প্রচারিত হয়। এই প্রচারের ভেতর দিয়েই সাধারণ মানুষেরা জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে এবং কাব্য-সাহিত্য ও ধর্ম-শাস্ত্রের অনেক অপরিচিত ও অজানা বিষয় পল্লীর নিরক্ষর মানুষের জানা হয়ে যায়।

চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের স্রোত অব্যাহত ছিল হস্তলিখিত অসংখ্য পুঁথির ভেতর। রাজসভায় সভাকবি বা শিল্পীগণ এইসব কাব্য-কাহিনী পুঁথি থেকেই পাঠ ও গান করত। কিন্তু অপরদিকে লোককবিগণ গ্রামে-গঞ্জে মেলায় ও উৎসবে মুখে মুখে গান গেয়ে, ঘুরে ঘুরে উচ্চ সাহিত্যের বিষয় ও কাহিনীকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়াত। চর্যাপদের যুগেও আমরা দেখেছি যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারা রচিত দোঁহা বা গীত জনসাধারণের কাছে মুখে মুখেই প্রচার করা হত। তত্ত্ব-দর্শন ছাড়াও সাধারণ মানুষকে সাংসারিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান, নীতি-শিক্ষা বা লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিতরণ করা হত এইসব বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মাধ্যমে। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত দেবকাহিনী নিয়ে কাব্য ও কবিতা রচিত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং পুরাণের আখ্যান নিয়ে 'পাঞ্চালী' জাতের কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল। সুকুমার সেনের[২৪] মতে প্রায় হাজার দেড় হাজার বছর আগে "পাঞ্চালিকা" অর্থাৎ পুতুলনাচের মাধ্যমে এই ধরনের কাব্য-সম্পদ গীত হত বলে প্রাচীন বাংলা কাব্যের নামকরণ করা হয় পাঞ্চালী। এই গান ও কাব্য মেয়েলি ব্রতকথার আকারে নিবদ্ধ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ-দিকে কৃষ্ণের বাল্য-কৈশোরলীলা, শিবের ঘরকন্নার কথা, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার গান, রামায়ণ গান প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে লোককবিগণ পূজা ও উৎসব উপলক্ষে গান করত। এইসব গান ও গাথায় আপামর সাধারণ মানুষের হৃদয় বিগলিত হত। বিদেশী মুসলমান জনসাধারণেরাও আগ্রহ সহকারে এইসব দেবদেবী বিষয়ক গান ও গাথা শুনত। পাঞ্চালী জাতীয় কাব্য-কবিতাগুলি রচনা করত অবশ্য সভাকবিগণ। কিন্তু পূজা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে আপামর সাধারণ জনসমাজে সাধারণ লোককবিগণের দ্বারা তা গীত ও প্রচারিত হত। আবার চারণ কবি অথবা গায়ক ভিক্ষুকেরা এইসব কাব্যের ভেতর থেকে গান ও ছড়া সংগ্রহ করে মুখে মুখে গান গেয়ে জনসমাজে সেগুলি প্রচার করে বেড়াত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে[২৫] এই তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুগে যুগে রামায়ণ-মহাভারত, ধর্ম, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কাব্যের

বিষয়বস্তু মৌখিক প্রচারের দ্বারাই জনসমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং কাব্য-সাহিত্যের কত অসংখ্য বিষয় ও উপাদান জনতার মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে কালক্রমে তা বৃহত্তর লোকসমাজে প্রচলিত হয়েছে। কোন কোন দেবতার বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলকাব্য। আবার অনেক দেব-দেবীর গল্প-কথা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ব্রতকথার—যা নারীসমাজে আজও প্রচলিত। এইভাবেই ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বিপত্তারিণীর কথা যেমন অমরা জানতে পারি তেমন আবার ধর্মঠাকুর, শিব-দুহিতা মনসা, দক্ষিণ রায়, শিব-দুর্গা প্রভৃতি নানা দেবতাদের সম্পর্কে অবহিত হই নানা ছড়া ও গানের মাধ্যমে। সেইসব ছড়া ও গান উৎসবে ও অনুষ্ঠানে আজও গীত হয়। পৌরাণিক লক্ষ্মী লোকধর্মের ভেতর দিয়ে কোজাগরীলক্ষ্মী হয়ে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই লক্ষ্মীর পূজা হয় শুধু ঘট অথবা ধান্যশীষ পূর্ণ চিত্রাঙ্কিত একটি ঘটকে অবলম্বন করে। এই ঘটলক্ষ্মী হল শস্য, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। এই ঘটলক্ষ্মী নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ্মীর ব্রতকথা ও পাঁচালী। এইসব ব্রত ও পাঁচালীর ভেতরে অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়িত হয়ে আছে যা আবহমানকাল থেকে পল্লী জনপদে লোককবি, পাঁচালীকার ও গায়েনের দলের মাধ্যমে মেলা ও উৎসবে প্রচারিত হয়। এইভাবে শাস্ত্রপুরাণের দেব-দেবীগণ লৌকিকরূপে লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। কালক্রমে ছড়া, পাঁচালী, গান, কথা ও কাহিনীর ভেতর দিয়ে তাঁদের মাহাত্ম্য সাধারণ জনসমাজের মধ্যে কীর্তিত হল। কথক, গায়ক ও পাঁচালীকারগণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুরাণ ও ধর্ম-শাস্ত্রের অসংখ্য দেব-দেবীর যোগাযোগ ও পরিচয় করিয়ে দিলেন। আজ এটা কি অনুমান করা চলে না যে বরিশালের গৈলা-ফুল্লশ্রীর সীমানা ছাড়িয়ে একদিন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলকে কোনও একটি গায়েনের দল বা একজন গায়ক অথবা কথকঠাকুর মেলা ও উৎসব কিংবা আসর-সমাবেশের মাধ্যমেই বিস্তৃতভাবে দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু মনসামঙ্গল কাব্যের কথাই-বা বলি কেন, মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে নীল গাজনের শিববিষয়ক গান, গম্ভীরার গানে শিবের চাষ-আবাদের অভিনয়, মনসার ভাসান এবং ঝাঁপানের গান ও আচার-অনুষ্ঠানকে লোককবি ও শিল্পীগণ পল্লীর নিরক্ষর জনসমষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। এইসব গীতানুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই শিব, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী পুরাণের জগত ছেড়ে পল্লীবাংলার কুটিরে, আটচালার নিচে, চণ্ডীমণ্ডপে, গৃহপ্রাঙ্গণে, পুকুর পাড়ে, গাছতলায় ঠাঁই নিয়েছেন।

বিষহরার পালাগানে বা পদ্মাবতীর পালাতে মনসাদেবীকে বন্দনা করে গাওয়া হয়ঃ

> "নমো নমো হরসুতা স্বরূপে জগৎমাতা
> নাম ধর তুমি দেবী পদ্মাবতী হে,
> হলাহল মা নাম ধরি বসিলে পাতালপুরী
> রক্ষা করিলে তুমি নাগের বসতি হে।"[২৬]

ভাসান গানে আছে লখীন্দরের ওপর কালীনাগের দংশন ঃ

"আরবার কালীনাগ শিখান দিগে যায়
লখীন্দরের হাত লাগল, নাগের মাথায় ।
ধর্ম তুমি সাক্ষী থাক, আর যত দেবগণ…"[২৭]

ঝাঁপান উৎসবের গানে দেখি মনসাকে আহ্বান করা হচ্ছে ঃ

"আওয়া (আতপ চাল) চাউল আর কাঁচা দুধ কার নামে দিব ।
যদি আসেন মা মনসা তাঁর নামে দিব ।"[২৮]

বাঙালীর কাছে রামায়ণ গান অত্যন্ত জনপ্রিয় । পালাবন্ধভাবে রামায়ণ গান বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত আছে । বিভিন্ন পালা-পার্বণে ও উৎসবানুষ্ঠানে আজও অনেক পল্লী অঞ্চলে রামায়ণ গানের ব্যবস্থা করা হয় । শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবিবরণ থেকে শুরু করে অনেক সময় তাঁর বিবাহকাল পর্যন্ত পালাগান করা হয় । রামায়ণ গানের পালাগুলো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে । যেমন—হনুমানের সীতা অন্বেষণ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অহল্যা উদ্ধার বা রাবণবধ পালা প্রভৃতি আপামর জনসাধারণের সামনে গায়েনের দল অধিক রাত অবধি গান করে । রাক্ষসকুলপতি রাবণের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা গায়কের সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে ঃ

"বাজনা বাজিছে গো সমর সাজে
দ্রিমিকি দ্রিমিকি বাজে, মহাবীর রণে সাজে
মেদিনী কাঁপিছে গো বাজনার তেজে ।"[২৯]

রাবণ যখন রাণী মন্দোদরীকে বলছেন যে কেন তিনি সীতা অপহরণ করলেন, তখন সমষ্টি-মন রাবণের দুঃখে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাবণের হয়ে অনুতাপ করে । রাবণ গাইছেন ঃ

"আমায় কি বুঝবে গো মন্দোদরী রানি
আমি জেনে শুনে এনেছি রামঘরণী
সীতা এনে আশোক বনে রেখেছি পরম যতনে
বংশ উদ্ধারিবার তরে এনেছি রামঘরণী গো ।"[৩০]

পল্লীর উৎসব এবং আসরে অনুষ্ঠিত রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, রামরসায়ন প্রভৃতি গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাদেব, দুর্গা, শ্রীরামচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ, হনুমান, অহল্যা, কুম্ভকর্ণ, সীতা, রাবণ প্রভৃতি কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে নিরক্ষর মানুষের পরিচয় হয়েছে । মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান হল এই যোগাযোগের লোকমাধ্যম । এই লোকমাধ্যমকে অবলম্বন করেই বাঙালীর লোকসঙ্গীত, ছড়াগান, কথা ও কাহিনী পল্লী সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে । সেই প্রচার আটপৌরে ঢঙে, অমার্জিত ভাষায় গ্রাম্য সুর ও কথার ভেতর দিয়ে পল্লীর নিরক্ষর জনসাধারণের প্রাণে তীব্র ঔৎসুক্যবোধ এবং অনুরাগকে জাগিয়ে তুলে পল্লী সমষ্টির হৃদর মন্দিরে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

বোলান গানের মধ্যেও পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণা করা হয়। গাজন উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, ভীম-অর্জুন প্রভৃতি নানা চরিত্রের অবতারণা করে বোলান সঙ্গীত গীত হয়। গাজন উৎসবের মাধ্যমে বোলান গানের প্রচার হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বোলান গানের বিষয় হল রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ। বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদ-নদীয়ায় বোলান গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। বোলান গানে কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গও শোনা যায়ঃ

"নীলমণি-খায় ননী নন্দের ঘরে,
অন্নপ্রাশন নন্দ দিল সেরে।
খেয়েছিল সবে পাতা পেড়ে
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে করে॥"[৩১]

গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে আলকাপ গানের প্রচলন আছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। নিরক্ষর দরিদ্র শিল্পীরা জনতার মাঝখানে আলকাপ গান গেয়ে থাকে। আলকাপ গানের পদ এবং সুর অপেক্ষাকৃত অমার্জিত এবং কথ্যভাষায় রচিত। মুসলমান শিল্পীরা আসরে নেমে কখনও নৃত্য বা অভিনয়ের সাহায্যে আলকাপ গান গেয়ে থাকে। দেশের সমসাময়িক ঘটনাকে নিয়ে আলকাপ গানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হল মুসলমান শিল্পী ও অভিনেতার মুখে নারায়ণ ও শিবস্তুতিও শোনা যায়। বোলান গানের মত আলকাপ গানেও কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে। যেমনঃ

"শুন ওহে চিকন কালা,
তোমার প্রেমের এত জ্বালা,
ব্রজবালা রইতে নারি ঘরে।
ও, নাম ধরিয়া বাজাও বাঁশী
বিজন বিপিনে বসি
মন উদাসী তোমার বাঁশীর সুরে..."[৩২]

কখনও আবার প্রাচীন ইতিহাসের কোন অসামাজিক ঘটনা অথবা সমাজের কোন সংস্কার উৎসবানুষ্ঠানের ক্রিয়াচারের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। বহু পূর্বে বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর গ্রামে গাজনের দিন—রাত্রে আগুন জেলে গাজন ভক্তেরা উৎসবে মেতে উঠে আনন্দ ও কোলাহল করত। অন্ধকার রাত্রে দূর থেকে ভক্তদের এই আগুন জ্বালাকে দেখে মনে হত যেন একটা জ্বলন্ত চিতা। প্রকৃতপক্ষে জ্বলন্ত চিতার মতন আগুন জেলে ভক্তরা যে উৎসব পালন করত তার নাম 'সতীদাহ' উৎসব। বিনয় ঘোষ[৩৩] তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে সতীদাহের প্রচলন একসময়ে বাঁকুড়া অঞ্চলে যে কী ভীষণ আকার ধারণ করেছিল তার প্রভাব গাজন উৎসবের মধ্যেও দেখা দেয়। "সতীদাহ" উৎসবের এই অনুকরণ অভিনয়ই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রাচীন সমাজের সেই কলঙ্কজনক ইতিহাসের মলিন স্মৃতিগুলিকে এইভাবে জনতার সামনে প্রতিফলিত করে তোলা হত গাজনোৎসবের নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানের

মাধ্যমে। সামাজিক ইতিহাস ও উৎসব-সংস্কৃতির এ এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এই দৃষ্টান্ত অনুষ্ঠিত হত মেলা ও উৎসবে জনতার প্রাঙ্গণে।

কখনও আবার শোনা যায় কোন কৃষক ধানক্ষেতে কাজ করতে করতে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের কত অশ্রুসজল কাহিনীকে স্মরণ করে গান গায়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কথা নিরক্ষর গরীব কৃষকের মনে পড়ে। সে তার কাজের অঙ্গ হিসেবে এই গানকেও যুক্ত করে। গান দিয়ে নিরক্ষর চাষী অতীত ইতিহাসকে অনুভব করার চেষ্টা করে। কোন উৎসব অথবা পল্লী-মেলার আসরে এসে সেই কৃষক তার এই গানটা হয়ত শুনেও থাকতে পারে—

"মহারাজ নন্দকুমার রে তোর রাজ্যপাট জমিদারী
কারে দিলি রে···
নন্দকুমার রায় ছিল, বাংলার অধিকারী
হেষ্টিংস সাহেব আইল, জান কারিবারকারী রে ॥
নন্দকুমার মায় কান্দে
গাঙ্গের পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা, জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।"[৩৪]

একজন শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে একটা গান বা ছড়ার সাহায্যে ধর্ম, কাব্য-সাহিত্যের বিষয় ও প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিকে যখন মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেই সাহিত্যরসের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় তখন সেই যোগাযোগ শুধু নিছক আনন্দ উপকরণের উপলক্ষ না হয়ে গ্রামীণ লোকশিক্ষার বাহন (vehicle of folk education) হিসেবে দেখা দেয়। এইভাবেই লোককবি ও শিল্পীরাই এগিয়ে আসে কাব্যরসের ভেতর দিয়ে শিক্ষা ও আনন্দকে আপামর সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। পল্লী সমাজের প্রতিনিধি হয়ে আবহমানকাল থেকে লোককবি ও গায়কেরা এইসব ছড়া-গান ও কথা-কাহিনীর রসধারাকে মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে অবিরামভাবে প্রচার করে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। Theodere Peterson[৩৫]-এর একটা মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি বলছেন ঃ

"Society also uses its communication system as a teacher to pass the social heritage from one generation to the next···"

৩। লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা ও উৎসবের নানা আঙ্গিক (Form)

পল্লীজনপদের মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যে যে সব ক্রিয়াচার ও অনুষ্ঠান পালিত হয়, অর্থাৎ যা আচরণীয় ও পালনীয় রীতি-নীতি—তা হল মেলা ও উৎসবের রূপ বা আঙ্গিক। এখানে আমাদের বিষয় হল মেলা ও উৎসবের আঙ্গিকগত পরিচয় দান করা। মেলা ও উৎসবের এই আঙ্গিকগত ক্রিয়ানুষ্ঠান-গুলি অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছে লোকমাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

মেলা ও উৎসবের এইসব ক্রিয়াচারের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কারের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস-প্রবণতা, অনুভূতিশক্তি, কল্পনানুভূতি এবং অভ্যাস-অভিজ্ঞতা, সংস্কার বা ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠানের ক্রিয়াচারের ভেতর দিয়েই প্রতিফলিত হয়। তাই এইসব ক্রিয়াকর্মগুলি নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠান নয়। প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও সংস্কার এইসব ক্রিয়া-কর্মের ভেতরে মনে হয় আজও সজীব হয়ে আছে।

বাউল মেলা ও উৎসবের আঙ্গিক হল বাউল সমাবেশ ও বাউল গান। মেলা ও উৎসবের আঙিনায় অথবা আখড়ায় দলে দলে বাউলেরা এসে জমায়েত হয়। তাই বাউল মেলা ও উৎসবের শরীর গঠিত হয় বাউলের গানে ও নৃত্যে। বাউল মেলার প্রধান উপাদান হল রসিক জনতা। সাক্ষর ও নিরক্ষর মানুষেরাই হল জনমণ্ডলীর উপাদান। বাউল গান, নৃত্য, ধর্মালোচনা এবং জনতার সহমর্মীতা-ই হল বাউল মেলার প্রধান বিষয়। তাই বাউলেরা সাধারণের সঙ্গে মিশে যায়। বেশভূষায় বাউলেরা কখনও গৈরিক কখনও বা শুভ্র বসন পরিধান করে গানের সাজসরঞ্জাম নিয়ে গান করে। সেই গানকে ঘিরে সাধারণ মানুষের একটা বৃত্ত রচিত হয়। কোথাও কোথাও সারারাত বাউল গান চলে। বাউল মেলায় বাউল গান ছাড়াও মুখে মুখে ধর্ম-তত্ত্বের আলাপ-আলোচনাও হয়। বাউল গানের আসর, ধর্মালোচনা, পংক্তি ভোজন এবং বৈষ্ণবদের সংকীর্তনের যে বিরাট উৎসব বিভিন্ন বাউল মেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় সেটাই হল প্রচলিত কথায় মচ্ছব। পল্লীর নিরক্ষর মানুষ বাউল মেলার মধ্যে এসে বাউল-বৈরাগীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে এবং নৃত্য সম্পদযুক্ত বাউল গান শুনে বিমোহিত হয়। তত্ত্বগান, অনিত্যতার গান, গুরু সম্পর্কিত গান এবং সাধনরহস্যের গানে গ্রামের আপামর মানুষ আকৃষ্ট হয়। যদিও সাধারণ মানুষ সেইসব গানের মর্মোদ্ধার করতে পারে না, তবুও তারা বাউল শিল্পীকে চোখের সামনে দেখে এবং তার গান শুনে এক অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করে।

বাউল মেলা ও উৎসবের প্রাণকেন্দ্রে যে সিদ্ধ পুরুষ অবস্থান করেন তাঁর জীবনকে জানবার জন্যে সাধারণ মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। কবি জয়দেব গোস্বামী, চৈতন্যদেব, সতী-মা, গোপালদাস বাবাজী এবং নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি অনেক ভক্ত, কবি ও বৈষ্ণব মহাজনদের অলৌকিক জীবনের প্রতি গ্রামের মানুষের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বাউল মেলা ও উৎসবের এ ছাড়া আর কোন বিশেষ আঙ্গিকগত পরিচয় নেই। এখানে আচরণীয় বা পালনীয় কোন অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতি সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না।

গম্ভীরা ও গাজন উৎসবের অনুষ্ঠানে আচার পালনের দিকটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গাজন ও গম্ভীরার কথা বলতে গিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। গম্ভীরা, গাজন এবং চড়ক উৎসবের

মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের যে-সব বিচিত্র রীতি-নীতি জড়িয়ে আছে তার ভেতর থেকে প্রাচীন কোম সমাজের নানা ধ্যান-ধারণার স্মৃতি ধ্বনিত হয়। চড়ক-গাজন ও গম্ভীরা উৎসবানুষ্ঠানের রীতি-নীতি বিষয়ক বিভিন্ন আঙ্গিকগুলো পল্লীর সাধারণ মানুষের কাছে গভীর রহস্য ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে।

চড়ক উৎসবে 'শিবের পাট' পূজা হয়। বলা বাহুল্য এই পাট হল তিন-চার হাত লম্বা সিঁদুর-মাখানো একটা কাঠের তক্তাবিশেষ। গম্ভীরা অনুষ্ঠানেও শিবের পাট পূজা হয়। এ ছাড়া গম্ভীরা উৎসবটি বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত থাকে। 'ঘটভরা', 'ছোট তামাসা', 'বড় তামাসা', 'আহারা' প্রভৃতি। গম্ভীরাতে যখন শিবের চাষের অভিনয় হয়—তখন প্রাচীন কৃষি-সমাজ-ব্যবস্থার নানা স্মৃতি আমাদের মনে পড়ে। কৃষক বেশে শিবের অভিনয় পল্লীর কৃষিজীবিদের অনুপ্রাণিত করে। গম্ভীরা উৎসবের এই আঙ্গিক প্রাচীন ভারতবর্ষের কৃষি-ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটা শ্রেষ্ঠ লোকমাধ্যম। প্রিয় দেবতা শিবকে যখন নিরক্ষর কৃষিজীবিরা উৎসবের আসরে বসে চাষ করতে দেখছে কিংবা হাল-লাঙল চালাতে দেখছে, তখন তারা কৃষি-কর্মের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত হয়ে উঠছে।

চড়ক উৎসবে ভক্তেরা কঠোর ব্রত পালন করে। উপবাসী ভক্তেরা চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে খিচুড়ি ও পোড়া গজাল মাছ দিয়ে শিবের পূজা করে। গভীর রাতে ভক্ত সন্ন্যাসীগণ ধুনো পুড়িয়ে মহাদেবের স্তুতি করে। এইসময় কোন কোন সন্ন্যাসীর ভর হয় এবং ভরের মুখে তারা উৎকট পাগলামি দেখায়। প্রবলভাবে মাথা ঘোরায় ও মন্ত্র ব'লে এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করতে করতে কোন একসময়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। লোকে মনে করে দেবতার ভর হয়েছে। সংজ্ঞাহীন ভক্ত সন্ন্যাসী সেই অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দেয়। এছাড়া চড়কের সন্ন্যাসীরা তাদের পবিত্রতা ও ভক্তি-নিষ্ঠা প্রমাণ করার জন্যে জনতার সামনে নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর ঝাঁপ দেয়। তীব্র লোহশলাকা কিংবা ধারালো বঁটির ওপর ঝাঁপ দিতে গিয়ে তাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। এইসব ঝাঁপের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন—কাঁটাঝাঁপ, ঝুলঝাঁপ ও বঁটি-ঝাঁপ। তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে চড়ক উৎসবের আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন :

"এইসঙ্গে বাণ ফোঁড়া ব্রতও অনুষ্ঠিত হয়। একে বাণ-সন্ন্যাস বলা হয়। বাণ-সন্ন্যাস অত্যন্ত বীভৎস ব্যাপার। আড়াই হাত থেকে চার-পাঁচ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ একটা ছুঁচলো বাণ বা লৌহ-শলাকা দিয়ে জিভ বেঁধানো হয় এবং রক্তাক্ত বসনে উন্মত্ত গান বাজনায় বিভোর হয়ে সন্ধ্যার আগে জিভ থেকে বাণটি বের করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। কখনও বা গায়ের উভয় পাশে চামড়া ফুটো করে সুতো বা সরু বেত ভরে দেওয়া হয়। এদের সূত্র-সন্ন্যাসী অথবা বেত্র-সন্ন্যাসী বলা হয়।

কিন্তু সকল সন্ন্যাসের বীভৎসতাকে টেক্কা দেয় বঁড়শি-সন্ন্যাস। বঁড়শি

সন্ন্যাসের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর হয়। বঁড়শি-সন্ন্যাসের জন্য দরকার হয় 'চড়ক গাছ'—অর্থাৎ একটা কাঠের স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় সছিদ্র একটি কাঠের আল। ঐ আল থেকে ঝোলানো একটা দড়িতে সূচীমুখবিশিষ্ট একটা বড় রকমের বঁড়শি বাঁধা থাকে। সন্ন্যাসী ঐ বঁড়শিটিতে আপন পিঠের শিরদাঁড়া বিদ্ধ করে শূন্যে ঝুলে, চরকির মত ঘুরপাক খায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আইন প্রবর্তন করে এই নিষ্ঠুর উৎসব-রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়।"[৩৬]

চড়ক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে কোন কোন অঞ্চলে কুমীরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর দিয়ে দোল খাওয়া, শিবের বিবাহ এবং আগুন-নাচ ও চড়ক গাছ থেকে দোলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দেখা যায়। এর সঙ্গে আছে বাণফোঁড়া এবং কাঁটা ও ছুরির ওপর লাফ দেওয়ার প্রথা। আমাদের অনুমান এ সবই প্রাচীন কৌম সমাজের রীতি-নীতি বা আদিম সমাজের স্মৃতি সম্পদ যা চড়ক-গাজন উৎসবানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আজও অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। এইসব আত্মনিগ্রহ-মূলক অনুষ্ঠানাদির একটা সূত্র পাওয়া যায় ধর্মসংহিতায়।

প্রাচীনকালে বাণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম শৈব। ঘটনাচক্রে বাণকন্যা ঊষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন ভালবাসা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাণ রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ শুরু হয়। শেষে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে বাণরাজার দুটো হাত ছিন্ন হয়। অসহায় বাণ তখন শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রক্তাপ্লুত শরীর নিয়ে দেবতার সামনে নৃত্য শুরু করেন। শিব বাণরাজার একাগ্র ভক্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অমর হবার বর দেন। বাণরাজা এই সুযোগে সকল শিবভক্তের জন্যে বর প্রার্থনা করে বলেন—

"...দেব! আমি যেমন চক্রাঘাতে ছিন্নবাহু হয়ে শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সামনে নৃত্য করলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করতে পারে। শিব বর দিয়ে বললেন—বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থেকে এমনি করে নৃত্য করবে, তারই এরূপ ফললাভ হবে।"[৩৭]

পুরাণোক্ত সূত্রানুসারে চড়ক-গাজন উৎসবের এইসব ক্রিয়াচার ও আঙ্গিকের মাধ্যমে নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার আবার অনেক ক্ষেত্রে সূর্য, বসুন্ধরা, শস্য বপন ও শস্যোদ্গম প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। টুসু, ভাদু, তোষলা ব্রত প্রভৃতি আঞ্চলিক উৎসব ও গীতানুষ্ঠানের আঙ্গিকের ধারা-গুলোকে বিচার করে দেখলেই আমরা এ কথা বুঝতে পারি। মাটি, সরা, ঘট, পঞ্চশস্য, গোময় অথবা গো-বন্দনা কিংবা পুণ্যিপুকুর ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যেও সেই একই প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে বন্দনা করার ইচ্ছা ও প্রবণতা দেখা যায়। এইসব অনুষ্ঠান ও উৎসবভিত্তিক গেয় সম্পদ মৌখিক (oral) ভাবে প্রচারিত হয় এবং অনুষ্ঠানগত ক্রিয়াকর্মের (functional) ভেতর দিয়ে

উৎসবের অন্তর্নিহিত সত্যটাকে জাগিয়ে তোলা হয়। এই অনুষ্ঠেয় রীতি-নীতিকেই আমরা এইজাতীয় উৎসবানুষ্ঠানের আঙ্গিক (from) বলছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পল্লীর জনসমাজে মেলা ও উৎসবের দুটি সম্পদ লোকমাধ্যম রূপে কাজ করে। একটি হল উৎসবানুষ্ঠানের মৌখিক গেয় সম্পদ এবং অপরটি হল উৎসবের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিকগত ক্রিয়াকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান। প্রাচীন ঐতিহ্যের সংস্কারগত ধারা মেলা ও উৎসবের আঙ্গিকগত ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে আজও পল্লীর নিরক্ষর জন-সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। শ্যাম পারমার তাঁর "Traditional Folk Media in India" গ্রন্থে মেলা ও উৎসবের আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন ঃ

"...Fairs and festivals continue to share the persistance of common elements which they have derived from the past."[৩৮]

বীরভূমের অন্তর্গত প্রাচীন পাইফোড়ে বাণব্রত উৎসব উপলক্ষে শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিনে বিরাট মেলা বসত। বাণব্রত উৎসবে বুড়োশিব এবং খেপা কালীর পূজা হত। এই বাণেশ্বর শিবের উৎসবে পাণ্ডাঠাকুর ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ কর্তৃক যে সব বীভৎস ও রোমহর্ষক অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পালিত হত তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় 'বীরভূম বিববণ'[৩৯] গ্রন্থে। এই বিবরণ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। উৎসবানুষ্ঠানের এইজাতীয় প্রাচীন আঙ্গিকের ভেতর দিয়ে আদিম কৌম সমাজের সংস্কারবোধ ও ধর্মচিন্তার একটা চেহারা প্রকট হয়ে ফুটে বেরোয়। উৎসবের এই আঙ্গিকগত রীতি-নীতি আমাদের সেই আদিম অতীতের মধ্যে নিয়ে যায় বলে একে যোগাযোগের একটা সূত্র হিসেবেও আমরা ধরে নিতে পারি। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ই. এল. হার্টলে এবং আর. ই. হার্টলের লেখা একটা প্রবন্ধে যে কথা উল্লিখিত আছে, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

"Since 'Culture' is an abstraction commonly agreed to refer to the products, knowledge, tradition, skills, and beliefs that are shared by a group of people and passed on from generation to generation, its very existence is predicted on the functioning of communication. Without communication there could be no sharing, either with contemporaries or successors."[৪০]

আমাদের দেশের অনেক উৎসবানুষ্ঠানের রীতি-নীতি ও আচার-বিচারের ভেতর থেকে উপবর্ণীয় সমাজের লোকাচার ও লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যুগপরম্পরায় এইসব পূজা ও উৎসবের ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি আর্যেতর সংস্কৃতি এবং অনগ্রসর ও অরণ্যচারী আদিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কারের দ্বারা গভীরভাবে আবৃত। তাই লোকাচার ও সংস্কারে সমৃদ্ধ হয়ে যখন ধর্মের গাজন, বাঁধনা পরব, সোহরায় উৎসব, করম ব্রতানুষ্ঠান ও ঘেঁটু ঠাকুরের

পূজা প্রভৃতি পালিত হয় তখন সেইসব উৎসবানুষ্ঠানের নানা আঙ্গিক লোকমাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। এই মাধ্যমের ভেতর দিয়েই অনগ্রসর ও আদিবাসী সমাজের ধ্যান-ধারণা ও বিষয়-ভাবনা পল্লীবাংলার নিরক্ষর মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

৪। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে জনতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

সমাযোজনের ক্ষেত্রে লোকমাধ্যম হিসেবে উৎসব ও মেলাগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার দ্বারা লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা যেমন গ্রামীণ সমাজে প্রচারিত হয় তেমনি পল্লী হৃদয়ে আনন্দ-রসেরও সঞ্চার হয়। এই আনন্দরসের প্রধান উৎস হল মেলা ও উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্য। উৎসব ও মেলার প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষ এসে সমবেতভাবে এইসব উৎসবানুষ্ঠানের নানা ক্রিয়াকর্ম যেমন দেখে তেমনি লোকসাহিত্যের শিল্প-সুষমাকে আস্বাদন ক'রে এক অপার আনন্দানুভূতি লাভ করে। শ্রবণ ও দর্শনের এই আনন্দ তাদের দেহ ও মনকে সুনির্মল করে তোলে। শুধু তাই নয় এই আনন্দরসে পল্লীহৃদয় রসাপ্লুত হয়ে ওঠে। গাজনের গানে, ঝাঁপানের বিচিত্র ক্রিয়ানুষ্ঠানে, ধর্মঠাকুরের পূজা ও পদ্ধতি দেখে এবং বাউলের নৃত্য ও গানে পল্লীর সাধারণ মানুষের দেহ ও মন আনন্দে, ভয়ে, ভাবনায় ও আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

মেলা ও উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্য এবং ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি গ্রামীণ জনতার ওপর যৌথভাবে দুই ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। যথা—

(ক) দৈহিক প্রভাব

(খ) মানসিক প্রভাব

(ক) দৈহিক প্রভাব

মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যে সমাযোজন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তার মূলে থাকে সমাযোজনকারী (communicator) অর্থাৎ যারা গায়ক, শিল্পী ও লোককবি। অন্যদিকে থাকে জনতা বা জনমণ্ডলী (communicant বা receiver) অর্থাৎ যারা মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের গেয় সম্পদ, দৃশ্য সম্পদকে দেখে এবং শোনে। এই সমষ্টি-মন হল এক অর্থে রসাস্বাদনকারী অথবা ভাব গ্রহণকারী জনতা। মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত নাচ দেখে কিংবা গান শুনে অথবা কোন পালাভিনয় প্রত্যক্ষ করে সমষ্টি-মন সেই শিল্প সম্পদের ভাব ও রসকে মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে। জনতার মধ্যে কোন প্রতিভাদীপ্ত বা রসিক শিল্পীও থাকতে পারে। লোকসাহিত্য-শিল্পের প্রভাব তার মনে অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। আবার নিরক্ষর জনতার চিত্ত গানে ও নাচের মাধুর্যে মুখর হলে শিল্পীর সঙ্গে তার নৃত্য করতে এবং গান গাইতে ইচ্ছেও

হতে পারে। উৎসবে অনুষ্ঠিত পালাভিনয়ের কোন চরিত্রের সঙ্গে অথবা কথক ঠাকুরের মুখ থেকে শোনা পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত কোন দেব-দেবীর হৃদয়ের সঙ্গে পল্লী-জনতার হৃদয়ও অন্বিষ্ট হয়ে যায়। অন্নপূর্ণার সঙ্গে শিবের কলহ, টুসু ও ভাদু রাণীর দৈনন্দিন জীবনচর্চার কাহিনী ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ছড়া শুনে পল্লীজনতা তার নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাপঞ্জীর সঙ্গে সেই ছড়ার বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে নেয়। শ্রীরামচন্দ্রের পালাগানের মধ্যে রামের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রোতা রামচন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। অথবা রাবণবধের পালাগানে শরবিদ্ধ রাবণের কাতরোক্তি ও মৃত্যু-বাণে বিদ্ধ অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রোতা বা দর্শক কল্পনায় নিজের শরীরের কোন অংশে ব্যথা বেদনার যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারে। মনসার ভাসান বা বেহুলা লখীন্দরের পালাগানে বর্ণিত সতী-বেহুলার দুঃখ-শোক কোন পল্লী-রমণীর মনের মধ্যে পতি-পরায়ণতার গভীর আবেগ ও আদর্শকে সংহত ও মহান করে তোলে। মেলা ও উৎসবের শ্রোতা শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব-পূর্ণ পালাগানের ভেতর থেকে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষা নেয়। শ্রীরামচন্দ্রের কর্তব্যবোধ, পিতৃভক্তি, আদর্শ এবং ন্যায়পরায়ণতা শ্রোতাকে মহৎ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে। আবার রাবণবধের গানে শ্রোতার মন সহৃদয় হয়ে রাবণের জন্যে অশ্রুপাত ক'রে মনে মনে জানায় সমবেদনা। কোন রমণী তার আপন স্বামীকে জগতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে পতি-পরায়ণা বেহুলার কাছ থেকে স্বামীসেবার চরমতম আদর্শের শিক্ষা গ্রহণ করে। আধুনিক যন্ত্রমাধ্যমের ক্ষেত্রেও শহরের শিক্ষিত মানুষ প্রভাবিত হয়ে আনন্দ ও বেদনার নানা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু মেলা ও উৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রচারকারী ও গ্রহণকারীর মুখোমুখি অবস্থান ও সাক্ষাতের ফলে যে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্রিয়াটি যেমনভাবে গ্রহণ-কারীর মনে সজীব ও মূর্তিমান হয়ে ওঠে—বিজ্ঞান-শিল্প-মাধ্যমের ক্ষেত্রে তা কতখানি ফলপ্রসূ হয় সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। মেলা ও উৎসবের কথা ও গানের ভেতর থেকে সুখ-দুঃখ আনন্দ এবং নানাপ্রকারের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করে পল্লীর সাধারণ নরনারী বাস্তবে নিজের সাংসারিক জীবনে সেগুলোকে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হয়। এই অবস্থাটাকে আমরা জনতার দৈহিক প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এইভাবে বাউল গানের উদাসীনতায়, চড়ক গাজন বা নীল গাজনের গানে শিব-দুর্গার ঘরকন্নার কথা, গম্ভীরা গানে শিবের চাষের অভিনয়, টুসু ভাদু গানে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানা ভাব-শিল্প-সম্পদ রসাস্বাদনকারী জনতার চিত্ত পটে প্রতিহত হয়। করুণ রসের প্রাবল্যে নিরক্ষর পল্লী মানুষের হৃদয় কাঁদে, হাস্যরসের আলোড়নে তারা হাসে এবং কোন বীররসের ভাবোদ্দীপনায় আপামর সাধারণ মানুষের অন্তরাত্মা বীরাত্মায় পর্যবসিত হয়। এইভাবে রসাস্বাদনকারীর আবেগানুভূতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে উৎসব-নির্ভর বিভিন্ন

শ্রেণীর লোকসাহিত্যের মাধ্যমে। এইসব ছড়া-গান প্রভৃতি লোকসাহিত্যের শিল্প-সম্পদের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যুতের মত জনতার দেহে সঞ্চারিত হয়। ব্যষ্টির শিল্প-সম্পদ মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে সমষ্টির কাছে তাই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেমন ঃ

"...উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্তিমিত মশালের আলোকে সহস্র সহস্র পল্লীর নিরক্ষর শ্রোতা নগ্ন গাত্রে কটিবাস মাত্র পরিধান ও তৃণাসন মাত্র সম্বল করিয়া গায়েনের মুখ হইতে যে মহুয়ার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে, তাহা যে তাহাদেরও বেদনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে... ।"[৪১]

(খ) মানসিক প্রভাব

মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গান, কথকতার আসর, পালা গান, গীতাভিনয়, নৃত্যানুষ্ঠান, ছড়া গান প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। এইসব অনুষ্ঠান আবহমানকাল ধরে পল্লীজনপদে অনুষ্ঠিত হয়। তাই এইসব অনুষ্ঠানের একটা ধারাবাহিকতা আছে। মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের চলমান রূপের সঙ্গে অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্যের ধারাটাও বহমান। তাই তার ভেতর দিয়ে পল্লীজনতার সঙ্গে একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠে। শ্যাম পারমার[৪২] বলছেন ঃ

"...for rural communication the traditional folk media are therefore of a great importance..."

গ্রামীণ জীবনে মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়। এই মানসিক যোগাযোগে জারিত রসক্রিয়া এক মন থেকে একাধিক মনে বিস্তৃত হয়ে যায়। আর এই যোগাযোগের ভিত্তিতেই পল্লীজনতার মনে বিভিন্ন ভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই ভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে লোকসাহিত্যের মৌখিক প্রচারের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। কারণ এই প্রচার যুগবাহিত। যেমন ঃ

"...Traditional folk media are tools of a special nature. Their special nature is derived from the fact that they have no grammar or literature, yet they are nurtured through oral and functional sources. In a total perspective, traditional folk media provide channels for expressing socio-ritual moral and emotional needs of a society or societies to which they especially belong..."[৪৩]

মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে মৌখিক লোকসাহিত্য প্রচারে আবিষ্ট হয়ে নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মন রসাপ্লুত হয়। মানসিক নানা আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছা এসে তার মানসপটে সঞ্চারিত হয়। কোন প্রশ্নের দ্বারা তার কাছে যদি

জানতে চাওয়া হয় যে তুমি কি বুঝলে? তাহলে রসাস্বাদনকারী (receiver) মনে করতে পারে যে—প্রশ্নকর্তা তার আনন্দানুভূতিকে অপহরণ করতে এসেছে। মৌখিক লোকসাহিত্যের দ্বারা গড়ে ওঠা তার হৃদয়ের আনন্দঘন রসলোক সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কারণ অনুষ্ঠানভিত্তিক লোকসাহিত্যের শিল্প-সম্পদজাত দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ভয়, ত্রাস প্রভৃতি মানসিক বোধকে অনুভব করে সেই মানুষটি একান্তভাবে নিবিষ্ট থাকতে চায়। সাধারণের মনে এইভাবে অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্য লালিত-পালিত হয়ে ওঠে। এই লালন-পালনের মধ্যেই জনতার আনন্দ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়। সেখানে অহেতুকভাবে প্রশ্ন করলে শ্রোতা বা দর্শকের শিল্পসম্মত রসাপ্লুত মানসিক প্রভাবটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। Alan Casty বলছেন ঃ

"...one who understands James Joyce's Ulysses certainly develops a measure of pride. One who understands a Joke is almost surely pleased, at least in part, because he "got it". And it may be that Jokes which must be explained cannot be funny because the necessity to have them explained robs the listner of his pride..."[৪৪]

মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের ভেতর থেকে লোকসাহিত্যের মৌখিক প্রচার এবং বিশেষ কয়েকটি আঞ্চলিক উৎসব ও গীতানুষ্ঠানের লোকাচার ও সংস্কারকে যখন সমষ্টি মন বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে তখন তার মনের মধ্যে নানাপ্রকার ভাব-অনুভাবের সৃষ্টি হয়। গান শুনে যেমন তার গান গাইতে ইচ্ছে করে, বাউলের নাচ দেখে যেমন কোন নিরক্ষর কৃষকের নাচতে ইচ্ছে করে তেমনি ব্রতানুষ্ঠানের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম, গাজন-গম্ভীরার আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি দেখে তারা চমৎকৃত হয়। ঝাঁপান উৎসবের সর্পবিদ্যা-বিশারদের বিষাক্ত সর্প নিয়ে খেলা এবং ঝাঁপানে চড়ে সর্পাবৃত ওঝাদের জনতার মাঝখানে আবির্ভাব-দৃশ্য আপামর সাধারণের মনে আচমকা ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার করে। বাউলের গান শুনে যে মন উদাস হয়ে ওঠে, ঝাঁপানের উৎসবের নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখে সেই মনেই আবার ভয় ও রহস্যের আবির্ভাব হয়। আবার ভাদু ও টুসু বিদায়ের গানে পল্লীজনতার মনে করুণরসের সঞ্চার হয়। এইভাবে জনতার মানসিক বৃত্তিগুলি নানাভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কারণ লোকসাহিত্যের রসসম্পদ ও ভাবমূল্য যুগের দ্বারা পরীক্ষিত এবং দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সত্য। সেইজন্যে নিরক্ষর সমাজের কাছে উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্যের মানসিক আবেদনটা তাৎক্ষণিক হলেও যুগাদিক্রমে লোকমনে তা চিরসজীব হয়ে থাকে। অনুষ্ঠান-নির্ভর এইসব গান বা ছড়া তাই কোন নির্দিষ্টকালের মধ্যে বা বিশেষ মনের কাছে প্রফুল্লতা বা বিষণ্ণতা সৃষ্টি করে ফুরিয়ে যায় না—তা যুগ থেকে অন্য যুগে এবং মন থেকে অন্য মনে পরিব্যাপ্ত হয়ে বেঁচে থাকে। তাই মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে জনতার

যে মানসিক প্রভাব জন্মগ্রহণ করে তা এক যুগের নয়, বহু যুগের এবং এক মনের নয় তা'হল সমষ্টি মনের। শ্যাম পারমার বলছেন ঃ

"...Though the folk performing arts have been traditionally used as vehicles of communication and though for some time past they have been experimented with as media of developmental communication, the information and thinking on this subject needs consolidation..."[৪৫]

মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের ভেতর দিয়েই তাই শিল্পী বা প্রচারকের সঙ্গে রসাস্বাদনকারী জনতার শিল্পসম্মত যোগসাধন (feed back) সম্পন্ন হয়। এই শিল্পসম্মত যোগসাধন হল মানসিক প্রভাবের আর এক সফল পরিণতি। এখন এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

৫। শিল্পসম্মত যোগসাধন (Feed back in art form)

মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পী, গায়ক, কথক এবং লোককবি অর্থাৎ অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্যের প্রচারকগণ জনতার মুখোমুখি অবস্থান করে। এই মুখোমুখি (face to face) ও প্রত্যক্ষ (direct) যোগাযোগের ফলে একে অপরের অনুভূতি ও ভাবক্রিয়াকে অনায়াসে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। মুখোমুখি অবস্থান, পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির ভেতর দিয়েই গড়ে ওঠে শিল্পী ও জনতার শিল্পসম্মত যোগসাধন।

এই যোগসাধন প্রক্রিয়া তখনই সম্ভব হয় যখন শিল্পী উৎসবের আসর থেকে শিল্প-রসের মৌখিক প্রচারের ভেতর দিয়ে জনত্য-মনকে আপন ভাবরসের নিগূঢ় অংশীদার করে নেয়। এইভাবে ব্যষ্টির নির্মাণ-শিল্প অনির্বচনীয় সুষমায় সমষ্টির হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলে। একজন দাতা অপরজন গ্রহীতা। একজন সরব অন্যজন নীরব। একজন গান গায়, ছড়া কাটে ও নাচে অথবা অভিনয় করে। গ্রহীতার হৃদয়ও গান গায়। অন্তরে নীরব নাচ আর অভিনয়ের পালা সাঙ্গ হয়। নিরক্ষর জনতা তার ভাব প্রকাশকে শিল্পময় ক'রে নিঃশব্দ প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে শিল্পীর প্রদত্ত ভাব-সম্পদের উত্তর নীরবেই দান করে। ভাবের আদান-প্রদান বা ভাব সংক্রমণের (Feed back) ক্রিয়াটি বিচিত্রভাবে নিষ্পন্ন হয়। শিল্পীর পাঠানো ভাব ও বিষয় রসাস্বাদনকারী জনতার অন্তস্তলে গিয়ে প্রতিহত হয়। রসাপ্লুত জনতার মন প্রতিহত হয়ে সে আরও বেগবান হয়ে ওঠে। তার স্বতঃস্ফূর্ত অব্যক্ত আবেগ অশ্রুতভাবে নির্গত হয়ে দাতার প্রেরিত ভাব-শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। উভয়ের ভাব-শিল্পের এই যুগ্ম মিলনকে শিল্পসম্মত যোগসাধন বলে।

রামায়ণে হনুমানের প্রভুভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, ভরতের অপার স্বার্থত্যাগের মহিমা ও সীতার দুঃখ কিংবা শিবের কাছে পার্বতীর শাঁখা পরবার জন্যে কাতর মিনতি, অথবা মনসার ভাসানে স্বামীহারা বেহুলার কান্না

প্রভৃতি নানা বিষয় পালাগান বা কথকতার মাধ্যমে পল্লীর নিরক্ষর মানুষের কাছে যখন মৌখিকভাবে প্রচারিত হয় তখন তাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ-অনুভূতির দরজাগুলি পাটে পাটে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারা কাঁদে, হাসে ও ও উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাদের হৃদয়স্থিত চিত্তবৃত্তির ডাল-পালাগুলি কখনও বেদনার রঙে রঞ্জিত হয় আবার কখনও বা আনন্দে পুষ্পিত হয়। সীতা, বেহুলা, ভরত, লক্ষ্মণ ও শিব-পার্বতীর মধ্যে পল্লীর সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনকে মিলিয়ে নেয়। এটা সম্ভব হয় প্রচার তরঙ্গে শিল্পী ও জনতার মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও অবস্থানের ফলে। উভয়ের মধ্যে এক ঐক্যবোধ জেগে ওঠে। যেটাকে বলা যেতে পারে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-মনের এক গভীরতম ভাবের সাযুজ্য। চার্লস এস. স্টেইন বার্গ বলছেন ঃ

"...The interaction that is involved in communication, the return to the communicator of some clue to the effect of the communique on the communicant, is seen in the 'feed back'... it requires that the communicator be also communicant and communicant be also communicator."[৪৬]

প্রখ্যাত সমালোচক স্টেইন বার্গের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা মনে হয় যে মেলা ও উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্যের শিল্প-সম্পদের মৌখিক প্রচারের ধারাটি ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে একাধিক পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করে সমষ্টি জনতার কাছে গিয়ে পেঁছয়। বলা বাহুল্য উৎসব ও মেলার সেই জনতা সম-মনোভাবাপন্ন হয়ে ব্যষ্টির রচনাকে আস্বাদ করে।

মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে লোকসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় এই পদ্ধতিগত রূপটির (structural form) তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এখানে দুটি রেখাচিত্রের (Diagram) অবতারণা করা হয়েছে। রেখাচিত্র দুটির প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ

রেখাচিত্র-১

লোকসাহিত্য ব্যষ্টির রচনা বা দান (Individual-Gist)। এর সৃষ্টির উৎস অজানিত। মৌখিক ধারায় লোকসাহিত্যের প্রচার চিরঅব্যাহত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যষ্টির রচনা সম্পদ উৎসব ও মেলার মাধ্যমে পল্লীমনের দ্বারা আস্বাদিত হতে হতে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় সেই ব্যষ্টির রচনা অবিরত পুনরাবৃত্তির ফলে ও সমষ্টি-মনের প্রভাবে সেই রচনা সমষ্টিগত সৃষ্টিতে পরিণত হয় (Group product)। অর্থাৎ সেই রচনা-শিল্প পুনর্গঠিত বা পুনরায় বিরচিত হয়।

রেখাচিত্র — ১

ব্যষ্টির রচনা অবিরত পুনরাবৃত্তির ফলে সমষ্টির দ্বারা
পুনরায় বিরচিত হয়

COMMUNAL RE-CREATION AFTER CONSTANT REPETITION

লোক
সা
হি
ত্য

ব্যষ্টির রচনা

INDIVIDUAL GIFT

লোকসাহিত্য সৃষ্টির উৎস অজানিত

NO BODY KNOWS WHEN THEY ARE COMPOSED

মেলা
ও
উৎসব
এবং
জনতা

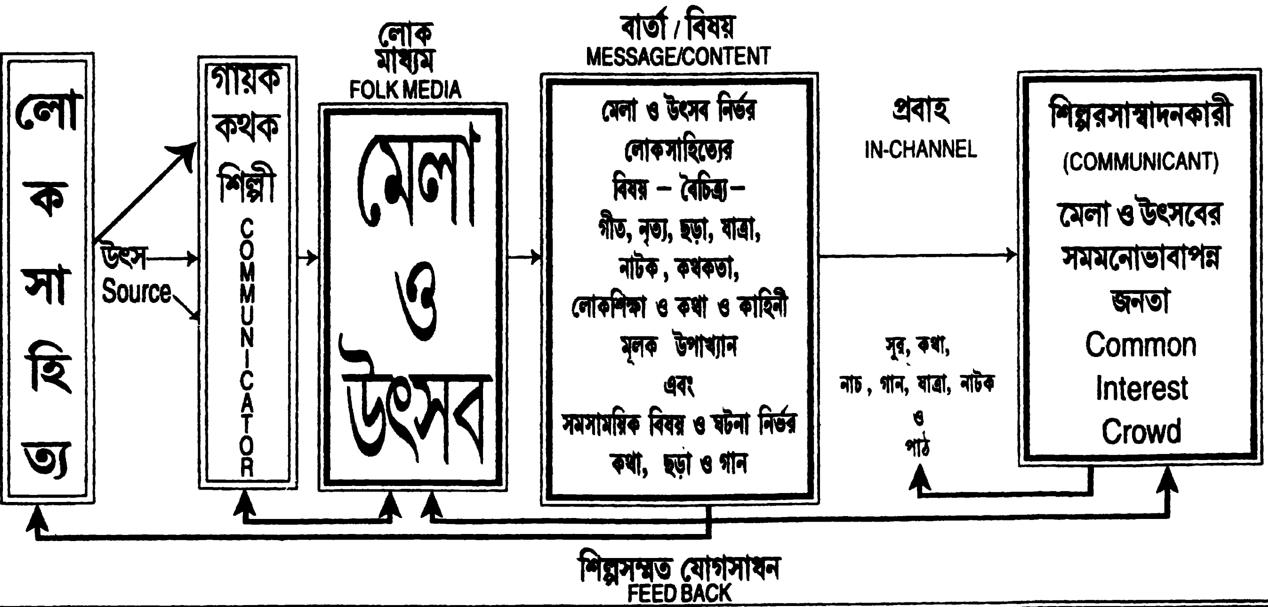
শৃংখলাবদ্ধ
সমমনোভাবাপন্ন জনতা

COMMON INTEREST CROWD

সমষ্টিগত সৃষ্টি

GROUP PRODUCT

লোকসাহিত্য


রেখাচিত্র — ২
ব্যষ্টির রচনা অবিরত পুনরাবৃত্তির ফলে সমষ্টির দ্বারা
পুনরায় বিরচিত হয়
COMMUNAL RE-CREATION AFTER CONSTANT REPETITION
লোকসাহিত্য
উৎস
Source
গায়ক
কথক
শিল্পী
COMMUNICATOR
লোক মাধ্যম
FOLK MEDIA
মেলা ও উৎসব
বার্তা / বিষয়
MESSAGE/CONTENT
মেলা ও উৎসব নির্ভর
লোকসাহিত্যের
বিষয় – বৈচিত্র্য–
গীত, নৃত্য, ছড়া, যাত্রা,
নাটক, কথকতা,
লোকশিক্ষা ও কথা ও কাহিনী
মূলক উপাখ্যান
এবং
সমসাময়িক বিষয় ও ঘটনা নির্ভর
কথা, ছড়া ও গান
প্রবাহ
IN-CHANNEL
সুর, কথা,
নাচ, গান, যাত্রা, নাটক
ও
পাঠ
শিল্পরসাস্বাদনকারী
(COMMUNICANT)
মেলা ও উৎসবের
সমমনোভাবাপন্ন
জনতা
Common
Interest
Crowd
শিল্পসম্মত যোগসাধন
FEED BACK

রেখাচিত্র-২

দ্বিতীয় রেখাচিত্রে এই বিষয় ও পদ্ধতিকে আরও একটু খুঁটিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই রেখাচিত্রটি একাধিক পর্বে বিভক্ত। লোকসাহিত্য সৃষ্টি হবার পর শিল্পী ও লোককবিগণ মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ গান, ছড়া, কথকতা প্রভৃতি নানাবিধ লোকসাহিত্যের বিষয়কে প্রচার করে। মেলা ও উৎসবের রসাস্বাদনকারী জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই লোকসাহিত্যের রস আস্বাদন করে। সেখানে কেউ মনোযোগী আবার কেউ-বা অমনোযোগীও থাকতে পারে। কিন্তু জনতার রসিক অংশ লোককবি ও শিল্পীর প্রত্যক্ষ দান বা প্রচারকে নীরব অভিব্যক্তির সাহায্যে আত্মস্থ করে আবার দাতার কাছে ফিরিয়ে দেয়। এই দান-প্রতিদানের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে শিল্পী ও জনতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে। Alan Casty তাঁর 'Mass Media and Mass Mau' গ্রন্থের এক জায়গায় বলছেন : '…feed back interaction may occur along the communication route.' (Ch-I P. 8 দ্রষ্টব্য)

শিল্পীর দান হল সরব ও মৌখিক। জনতার প্রতিদান হল নীরব এবং মানসিক। এই দুয়ের মিলনে উভয়ের মধ্যে 'শিল্প-সম্মত যোগসাধন গড়ে ওঠে। যাকে আমরা ইতিপূর্বে feed back in art from বলে অভিহিত করেছি। উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে ব্যষ্টির অবদান মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে জনতার সমুদ্র থেকে ফিরে এসে সে আবার তার উৎস মুখে ফিরে যায়। এই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটি দ্বিতীয় রেখাচিত্রে বিধৃত। এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কোন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান বা লিখিত প্রমাণ নেই। এই 'feed-back' পদ্ধতি সম্পূর্ণ অলিখিত (unrecorded)।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রসারের ফলে জনযোগাযোগ ও আধুনিক জন-মাধ্যমের ক্ষেত্র আজ অনেক ব্যাপকতর হয়েছে। বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, আলোকচিত্র প্রভৃতি জনযোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যম প্রচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে চলেছে। চক্ষের পলকে প্রচারকারী কিংবা শিল্পী বা কোন ব্যক্তি তার মনের ভাব ও মুখের ভাষাকে অত্যাধুনিক জনমাধ্যমের দ্বারা অসংখ্য জনতার মাঝখানে প্রচার করতে সক্ষম হয়। মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতির ফলে মুদ্রণ মাধ্যমের (Print media) ক্ষেত্র আগের থেকে অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে। বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাধ্যমের (Aerial ও Visual media) উন্নতির ফলে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রচারের ক্ষেত্র প্রভূত বিস্তার লাভ করেছে। আনন্দ উপকরণ ও নানা শিল্প সম্পদ বৈজ্ঞানিক মাধ্যমের সাহায্যে আজ আমাদের চক্ষু কর্ণের তৃষ্ণা নিবারণ করছে।

আধুনিক জন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমগুলি কিন্তু পল্লী জনপদে নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতিগত মান অনুসারে যথেষ্ট উপযোগী নয় বলেই আমাদের অনুমান। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পদক্ষেপ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে কিন্তু পল্লীর শিক্ষা ও সংস্কারের কোন অগ্রগতি হয়নি। পল্লীর বুক থেকে নিরক্ষরতার কুয়াশা আজও অপসারিত হয়নি। তাই আমাদের মনে হয় পল্লীগ্রামের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাব-ভাষা, অভিজ্ঞতা ও সংস্কারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিল্পসম্মত মাধ্যমগুলি যদি তাল ফেলে চলতে না পারে তাহলে পল্লীর নিরক্ষর সমাজের মানসিক উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞান শিল্প মাধ্যমগুলি অর্থহীন হয়ে পড়বে। উপরন্তু জনযোগাযোগের আসল উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশবাসীর একটি বৃহত্তর অংশ যদি জন-যোগাযোগ এবং আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প মাধ্যমের আওতার বাইরে থেকে যায় তাহলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রচারের দ্বারা শুধুমাত্র উপকৃত হবেন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ। কিন্তু পল্লীর নিরক্ষর সমাজ আধুনিক সভ্যতার যুগেও জ্ঞানালোকহীন গভীর অন্ধকারে নীরবে ও নিভৃতে কালাতিপাত করবে।

পল্লীর সাধারণ মানুষের একটি নিজস্ব রুচি ও সংস্কার আছে। সেই সাধারণ মানুষেরা পল্লীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তার সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনবোধের মধ্যে। পল্লীর গল্প-গানে, কথা ও কাহিনীতে পল্লীজীবনের সুখদুঃখের ছবি মর্মরিত হয়ে ওঠে। তাই পল্লীর সংস্কৃতির ধারা যেমন প্রাণাবেগে উচ্ছ্বসিত তেমনি তা যুগবাহিত। অর্থাৎ পল্লীর জীবনধারা যুগে যুগে বার-ব্রত, মেলা ও উৎসব, ধর্ম-কর্মের মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব আহার ও ঔষধকে অনুসন্ধান করেছে। ছড়া-গান, কথকতা এবং উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ ও শিক্ষায় পুষ্ট হয়ে পল্লী-জীবনধারার স্রোত প্রবাহিত হয়। লোককবি, শিল্পী, পাঁচালীকার গায়ক ও কথক তাঁদের নিজ নিজ শিল্প প্রতিভার দানে ও নৈপুণ্যে লোকপরম্পরায় পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে উন্নততর ও সমৃদ্ধশালী করে তোলে। জীবনবোধ ও পল্লী-সংস্কৃতি চেতনার বিকাশের মাধ্যম হল গ্রামবাংলার মেলা ও উৎসব।

আমাদের মনে হয় যে আমাদের দেশের মেলা ও উৎসব হল পল্লীবাংলার মানুষের কাছে এক জনপ্রিয় মৌখিক লোকমাধ্যম। পল্লী কবি ও শিল্পী পল্লীজনতার মানসিক রুচি ও জীবনবোধ অনুযায়ী শিল্প-সাহিত্য-সম্পদকে নিরক্ষর মানুষের গ্রহণযোগ্য করে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে তা প্রচার করে। পল্লী কবির দ্বারা প্রচারিত শিল্প সম্পদের মধ্যে পল্লীজীবনধারাই প্রতিফলিত হয় বলেই গভীর আবেদনে সমৃদ্ধ এইসব অনুষ্ঠান ও শিল্প-সাহিত্য পল্লীর নিরক্ষর মানুষের কাছে তা সমাদৃত হয়। এইজন্যে অনুষ্ঠান-ভিত্তিক লোকসাহিত্য হল পল্লীবাংলার জনপ্রিয় লোকমাধ্যম। উৎসবের আঙিনা ও মেলার আসরই হল ছড়া-গান, কথকতা ও বিভিন্ন ধরনের

লোকসঙ্গীতের মৌখিক প্রচারকেন্দ্র। এই প্রচারের ভেতর দিয়ে পল্লীর সাধারণ মানুষ তার জীবনধারণ ও ধর্ম পালনের একটি সাধারণ অর্থ খুঁজে পায় বলেই বিজ্ঞানভিত্তিক জনমাধ্যমের থেকেও এই জাতীয় লোকমাধ্যমকেই তারা বেশি পছন্দ করে। বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্প মাধ্যমের উপযোগিতা ও গুরুত্ব তাই তাদের জীবনে সর্বদা সক্রিয় হতে পারে না। সেইজন্য মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে প্রচারিত সাহিত্য-শিল্প-সম্পদ নিরক্ষর সমাজের কাছে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। তাই আনন্দ, জ্ঞান ও মানসিক নানা অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের প্রচারক্রিয়া একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক গণমাধ্যম আজ ব্যাপকতা লাভ করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাথে সাথে মেলা ও উৎসবের মত যুগবাহিত লোকমাধ্যম পল্লীজনপদে নিরক্ষর সমাজের কাছে আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে আছে। শ্যাম পারমার বলছেন:

"...while the mass media have been constantly expanding, the traditional media have been playing an important role in this field due to our peculiar needs."[৪৭]

অনুষ্ঠানভিত্তিক লোকসাহিত্যের মৌখিক প্রচার ও তার মূল্যবোধ যুগ-পরম্পরায় পরীক্ষিত ও সিদ্ধ হয়েছে বলেই তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পল্লী মানুষের হৃদয়ে আজও বেঁচে আছে। আধুনিক গণমাধ্যমের ভেতর দিয়ে যে-সব নিত্য নূতন বিষয় ও ভাবনা এবং উচ্চভাব ও ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প-সাহিত্য প্রচারিত হয় তা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়গণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেও পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর মানুষের কাছে অজানা ও অনাস্বাদিত থেকে যায়। কিন্তু ছড়া-গান, কথা ও কাহিনী এবং নৃত্য-গীতাভিনয়ের মধ্যে পল্লী-মন দর্পণে মুখ দেখার মত নিজের জীবন ও তার পরিচিত সমাজের প্রতিফলনকে দেখতে পায় বলেই মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের প্রতি তারা বেশি ঝুঁকে পড়ে। কারণ এইসব শিল্প-সম্পদের বিষয়-ভাবনার শিকড় তাদের জীবনধারার গভীরে প্রোথিত।

লোকসাহিত্যের রচয়িতাগণ পল্লীজনপদেরই সাধারণ মানুষ এবং পল্লীর মানুষের মত একই সমাজ ও পরিবারভুক্ত। দৈনন্দিন জীবনচর্যায় সাধারণ পল্লীবাসীর সঙ্গে লোককবিদের কোথাও কোন পার্থক্য নেই। সেইজন্য পল্লী-কবির ছড়া ও গান, শিল্পীর নৃত্যসম্পদ ও অভিনয় মহিমা এবং বাউলের নৃত্য-গীতকে পল্লীবাসীরা প্রাণের সম্পদ বলে গ্রহণ করে।

আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবগুলিতে যে সব অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পালিত হয় তা প্রধানতঃ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় ও ক্রিয়াচারে সমৃদ্ধ। টুসু-ভাদু প্রভৃতি আঞ্চলিক উৎসবের প্রাণসম্পদ হল কথা ও গান। কিন্তু গাজন-গম্ভীরা, করম, ঝাঁপান, বাঁধনা ও ধর্মপূজার বিশেষত্ব হল এর চিত্রধর্মিতা। এইসব ক্রিয়াচার ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিও পল্লীমানুষের কাছে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মেলা ও উৎসবের শ্রবণীয় বিষয় হল উৎসবের গেয় সম্পদ

আর আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি ও ক্রিয়াচারগুলি হল মেলা ও উৎসবের দৃষ্টি-নন্দনের সম্পদ। কিন্তু সব থেকে বড়ো কথা হল যে পল্লীর জনতা চোখে দেখা ও কানে শোনার সম্পদকে একই সঙ্গে উৎসবের মঞ্চে উপভোগ করছে। শিল্পী ও কবিকে অর্থাৎ সেই দুই সম্পদের প্রচারকারীকেও জনতা মুখোমুখি দেখতে পায়। শিল্পী ও কবির প্রকাশধর্মী (expressive) শিল্পপ্রতিভা ও কলানৈপুণ্যকে মাধ্যম হিসেবে পেয়ে ব্যষ্টিমনের সঙ্গে জনতা-মন গভীর একাত্মতা অনুভব করছে যা বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ সেখানে প্রচারকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকে। কিন্তু মেলা ও উৎসবের মঞ্চে পল্লী জনতা এবং লোককবি ও শিল্পী মুখোমুখি অবস্থান করে। তাই—

"The chief difference lies in the unknown contract between sender and receiver…"[৪৮]

মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যে-সব ছড়া-গান এবং কথা ও কাহিনী প্রচারিত হয় তার মধ্যে বুদ্ধির থেকে ইমোশনের প্রাধান্য বেশি থাকে। যা অতি সহজেই নিরক্ষর মনকে আকৃষ্ট করে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও নিপুণতায় ছড়া ও গানের অন্তর্নিহিত ভাবের প্রাধান্যটি সঠিক উপায়ে পল্লী-জনতার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। টুসু ও ভাদুর মূর্তিপুজা ও গান এবং পুজা শেষে টুসু ও ভাদুর বিসর্জন যাত্রা অথবা নীল গাজনের গান ও ছড়া, গম্ভীরাতে শিবের চাষের অভিনয়, চড়ক গাজনের কাঁটাঝাঁপ, ঝুলঝাঁপ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি পল্লী-জনতার কাছে প্রত্যক্ষ ও মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে। শিব সেজে যখন কোন শিল্পী নৃত্য ও গান করে অথবা কুলাই ঠাকুরের ব্রততে যখন কোন শিল্পী বাঘ সেজে অভিনয় করে তখন সমগ্র অনুষ্ঠানটি লোকমাধ্যমের একটি বড়ো উপাদান হয়ে ওঠে। টুসু বিদায়ের সঙ্গেও তাই পল্লী-মানুষের মন কেঁদে ওঠে। ভাদু বিসর্জনের শেষে তাদের চোখ মুখ হয় অশ্রুভারাক্রান্ত। এইভাবে পল্লীর মানুষ শিব, টুসু, ভাদু প্রভৃতির সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পল্লীর মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও ভালবাসাকে লাভ করে। মেলা ও উৎসব-নির্ভর এইসব শিল্পসম্পদ এবং ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি মাধ্যম হিসেবে জনতার কাছে তাই অধিক মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ ঃ

"…'direct rapport with audiences' as they antecede the mass media"[৪৯]

পল্লীজনতা তাই মেলা ও উৎসবকেই লোকমাধ্যম হিসেবে বেশি গুরুত্ব দান করে। লোককবি ও শিল্পীর প্রচার নৈপুণ্যের গুণে অনেক অলৌকিক ও নিরাকার বিষয় ও চরিত্র দুর্জ্ঞেয়তার রহস্যজাল ভেদ করে জনসাধারণের কাছে লৌকিক ও সাকার মানুষ হয়ে ওঠে। উৎসবানুষ্ঠানের আসরে, পালাগানে কিংবা নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে এমন অনেক বিষয় ও চরিত্র থাকে যা হয়ত সহজভাবে বিশ্বাস করতে মানুষ পারে না, তবু লোককবি ও শিল্পীর

বর্ণনা বা অভিনয়ের গুণে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে এইসব ঘটনা, বিষয় ও চরিত্রকে কাছে দেখতে পেয়ে পল্লীর নিরক্ষর মন তাকে তাদের ঘরের আঙিনায় পেতে চায়। এইভাবেই টুসু ও ভাদুর মধ্যে পল্লী মানুষের মনস্কামনা প্রতিফলিত হয়। ঘট, পট, বৃক্ষ, মাটির সরা, পুতুল-প্রতিমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সম্পদগুলিও মাধ্যমের কাজ করে। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট বস্তুবাহিত (objectuve) প্রত্যক্ষীকরণের সুযোগ বা অবকাশ নেই। তাই মেলা ও উৎসবে শ্রুত কোন কাহিনীকে পল্লীজনতা অনুসরণ করতে চায় অথবা ছড়া-গান এবং কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত কোন বিষয় ও চরিত্রকে বুঝতে চায়। বাস্তবে সেই বিষয় বা চরিত্রের অস্তিত্ব থাক বা না থাক তবু তার মধ্যে একাত্মতা লাভ করে সেই নিরক্ষর মন নিরন্তর আনন্দ পায়। যথা :

"...members of the entertainment audience must be willing to go along with a story or a spoof or a joke or to agonize and rejoice with a character who never lived or never could live. Instead of expecting simple, clear unambiguous writing they may be pleased with a certain level of artistic ambiguity and a host of latent meanings."[৫০]

পরিশেষে আমাদের একথাই মনে হয় যে মেলা ও উৎসব শুধু পল্লী মানুষের কাছে লোকমাধ্যম হিসেবে কাজ করে তাই নয়, আধুনিক শিক্ষিত মানব সমাজেও মেলা ও উৎসবের প্রেরণা ও প্রভাব সমানভাবে অব্যাহত থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ মেলা ও উৎসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল মিলন এবং লোকসাহিত্যের প্রচার। এই প্রচারের দান হিসেবে লোক-সাহিত্যের একটা সার্বিক মূল্য ও আবেদন থাকে যা সাক্ষর, নিরক্ষর সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই আকর্ষণ করে। নীল গাজনের নাচ, গম্ভীরার গান, টুসু ও ভাদু উৎসবের ছড়া, বিভিন্ন ব্রতধারার আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি, ঝাঁপান উৎসবে সাপের খেলা, চড়কের কাঁটাঝাঁপ, বা শালেভর প্রভৃতি ক্রিয়াচার ধোপদুরস্ত শহরের শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষকেও আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আজ একথা আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে নানা দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবগুলি উপেক্ষিত। কিন্তু যদি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক জনমাধ্যমের দ্বারা মেলা ও উৎসবের শিল্প সম্পদকে আরও বৃহত্তর সমাজের কাজে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা যায়, তাহলে মেলা ও উৎসবের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধারাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আনন্দের কথা আজ দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প-জনমাধ্যমের (Technology based mass media) দ্বারা মেলা ও উৎসবের গেয় ও অনুষ্ঠেয় কাব্য-শিল্প-সম্পদ বৃহত্তর লোকসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভের সুযোগ পাচ্ছে।

আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর জনমাধ্যমের সঙ্গে প্রাচীন লোকমাধ্যমের একটা

পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার আবহাওয়া যদি সৃষ্টি করা যায় তাহলে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক জনমাধ্যমের প্রসারের সাথে সাথে মেলা ও উৎসবের শিল্প-সাহিত্য-সম্পদ পল্লীর সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রসারলাভ করতে পারে। কথাটা আরও একটু স্বচ্ছ করে বলা দরকার। আমরা বলতে চাই যে আধুনিক জনমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের উজ্জীবন ও প্রচার যেমন সম্ভব হবে তেমনি এর অন্তর্নিহিত মিলনাদর্শ এবং শিল্প-সাহিত্য-সম্পদের প্রচারের উদ্দেশ্যটা আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ এইসব শিল্প সম্পদ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

মেলা ও উৎসবের ভেতরে প্রাচীন সমাজের কৃষি ও ভূমিজ আদর্শটা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। টুসু, ভাদু, ইতু এবং বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি আরও অন্যান্য উৎসবের মৌল আদর্শ হল কৃষি ও ভূমিজ শক্তির উন্মেষ ও কল্যাণসাধন। তাই মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে এই আদর্শটাকেই ব্যাপকতর উপায়ে জনমাধ্যমের অন্তর্গত করা যেতে পারে। কারণ সূর্য, কৃষি, শস্য এবং ভূমিলক্ষ্মীর পূজা এবং কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তির আবাহনের মধ্যে একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে সৌরশক্তির প্রচার, কৃষিকর্মের মাহাত্ম্য এবং মাটির প্রজননশক্তির মহিমাকে জনমাধ্যমের ভেতর দিয়ে ব্যাপক আকারে প্রচার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের প্রগতির ভোজসভায় ঐসব প্রাচীন সংস্কার ও ক্রিয়া-কর্ম কি একেবারেই অপাঙ্‌ক্তেয় ?

আমরা মনে করি আধুনিক শিল্পী ও শিক্ষিত কবিগণের সাহায্যে গ্রামীণ মেলা ও উৎসবের অনুকরণে সেইজাতীয় কিছু অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সেখানে পল্লীর লোককবি ও শিল্পীগণকেও আহ্বান করা হোক।

রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম উপায়ে মেলা করার কথা তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে ঘুরে ঘুরে একদল লোক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা করার জন্যে প্রস্তুত হন এবং তারা যদি কীর্তন, কথকতা রচনা করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান তাহলে সেই মেলার দলের সঙ্গে আমাদের দেশের হৃদয়ের যোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় যে লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা ও উৎসবের পুনরুজ্জীবন হলে অনুষ্ঠান-নির্ভর প্রাচীন শিল্প সম্পদের যেমন ব্যাপক প্রচার সম্ভব হবে তেমনি তার নবীকরণ বা সংস্কারও সাধিত হবে। কারণ পল্লীজনপদে সজীব লোকমাধ্যম হিসেবে যুগবাহিত মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুলি আজও অটুট ও অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ লোকসাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের যে এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে সেই সত্যটিকে আজ আমরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারি।

উৎসসূচী

Steinberg, Charles S. : Mass Media And Commuuication.

Bose, Narayan : Process of Communication, p. 5
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকায়ত দর্শন ঃ প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৩, কলিকাতা—"পদ্ধতি প্রসঙ্গে"-২য় পরিচ্ছেদ, পৃ ১১৬ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পৃ ৪৩৬ দ্রষ্টব্য
Ibid ঃ Op. cit. পৃ ১১৬-১২০ দ্রষ্টব্য (২য় পরিচ্ছেদ)
সুধীর করণ ঃ সীমান্ত বাংলার লোকযান—প্রথম সং, ফাল্গুন ঃ কলিকাতা—পৃ ১৬৬-১৬৮ দ্রষ্টব্য

Steinberg, C. S. : Mass Media and Communication গ্রন্থের অন্তর্গত—"The importance and nature of communication" প্রবন্ধের পাদটীকা দ্রষ্টব্য p. 8
আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড), পৃ ২৮
Parmer Shyam : Traditional Folk Media in India—Preface, page viii
Ibid : Op. cit. Chapt I, p. 1
Casty, Alan : Mass Media and Mass Man p. 9
Parmer, Shyam : Traditional Folk Media in India—Preface, page vii-viii
Steinberg, Charles : Mass Media And Communication p. 26
Parmer, Shyam : Traditional Folk Media in India—Preface, p. viii
Casty, Alan : Mass Media And Mass Man—part I, p. 9
Parmer, Shyam : Traditional Folk Media in India Chapt I (Advantages of Folk Media), p. 14-15.
Casty, Alan : Mass Media And Mass Man—part I, p. 9

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহিত্য

পল্লীজীবনের সঙ্গে বাঙালীর যোগ দীর্ঘ দিনের। এই যোগ-সূত্রানুসারে বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করেই একদিন বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন বাঙালী ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষিকার্য ও কৃষিক্ষেত্রকে তখন মানুষ শুধু জীবিকার উপায় হিসেবে দেখেনি, আনন্দের উপকরণ হিসেবেও দেখেছিল। পল্লীজীবন ও প্রকৃতির মাহাত্ম্যকে যেমন ঈশ্বরজ্ঞানে প্রাচীন মানুষ পূজা করত তেমনি পল্লীর মাটিকে তারা মনে করত ধাত্রী। মানব-ধাত্রী যেমন একটি মানব-শিশুকে স্নেহ ও যত্নে লালিত-পালিত করে তোলে, তেমনি তখনকার মানুষ মনে করত স্নিগ্ধ-কোমল পল্লী-প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন এবং বাংলার মেলা ও উৎসব মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও অনুভূতির সাথে সাথে লোকসাহিত্যকেও লালন-পালন করে। তাই সুদূর অতীতকাল থেকে পল্লী-জীবনের কাছে বাঙালী জাতির ঋণ অপরিশোধ্য।

অতীতে বাঙালীর জীবনে পল্লীসমাজের অনেক অবদান ছিল। পল্লীর লোকশিল্প, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সমগ্র দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত। এই যোগাযোগ রক্ষা করত অবশ্যই পল্লীর মেলা ও উৎস-বানুষ্ঠান। গ্রাম বাংলার মধ্যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক সম্বন্ধটা অটুট ছিল। এই সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্ককে প্রাণ-প্রাচুর্যে সজীব করে তোলার জন্যেই মানুষে মানুষে মেলামেশা ছিল অবাধ। এই মেলামেশার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠত ভাবের আদান-প্রদান। সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং শিল্প সৃষ্টির মূলেও ছিল মানুষের এই ভাবের আদান-প্রদান। পল্লীকবি ও শিল্পী তাদের আবেগভরা সৃষ্টিকে অবাধে বিতরণ করে দিত সর্বসাধারণের মধ্যে। চৈত্র-গাজন, দোল-রাসমঞ্চে অথবা বার-ব্রত ও উৎসবে কিংবা বাউল-বৈরাগীর মেলায় পল্লীর শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন সজীব হয়ে উঠত। পল্লীবাংলার উদার উন্মত্ত আকাশের নিচে প্রাণখোলা প্রকৃতির মধ্যখানে মানুষের অবাধ মেলামেশা, বাঁধভাঙা আনন্দ, সামাজিকতা, নিবিড় আত্মীয়তা, মিলন এবং সর্বোপরি মানুষে মানুষে একাত্ম হওয়ার আনন্দ ও আবেগানুভূতি বিকশিত হয়ে উঠত পল্লীর মেলা এবং উৎসবানুষ্ঠানে। মানুষের এই সম্মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকত না। পল্লীর মেলা ও উৎসব কিংবা কোন সভা ও সমাবেশের মধ্যে ঘনীভূত আবেগ-মিশ্রিত মানুষের মিলনটাই বড়ো হয়ে উঠত। সেই মিলনে মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। এইভাবে পল্লী-জনতার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠল। লোক-

সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে জনতার এই ঐক্যবোধ ছিল বিশেষ মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ

"এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়—প্রভু ছিল, দাস ছিল; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল; ধনী ছিল, নির্ধন ছিল—কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজা-পার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে আনন্দের অংশগ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানের মাঝখানে যে রাস্তা, যে সেতু সেটা খোলা ছিল।"[১]

পল্লী জনপদের এই অনাবিল ও 'একত্রীভূত' জীবনযাত্রার সূত্রধরেই গ্রামীণ মানুষের মনে উদয় হল সংহত চিন্তাধারার বিকাশ। আবার সেই বিকশিত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে পল্লীর লোকসাহিত্যে, শিল্পে, গানে ও নৃত্যানুষ্ঠানে। কারণ শিল্প ও সাহিত্য তার উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে জীবনযাত্রা থেকেই। ঠিক যেমন বৃক্ষ তার রস গ্রহণ করে মৃত্তিকা থেকে। তাই জীবনযাত্রা যদি সতেজ, চঞ্চল ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে সেই জীবনধারা থেকে উদ্ভূত শিল্প এবং সাহিত্য প্রাণ-প্রাচুর্যে শক্তিশালী হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পল্লীসমাজ ও জীবনযাত্রার সজীবতা ও আবেগানুভূতির বিস্তর প্রকাশ ঘটেছে পল্লীর লোকসাহিত্যে। পল্লীর লোকেরা মেলা ও উৎসবের দিনে হাল, লাঙল ছেড়ে লোককবির গান ও ছড়া শোনবার জন্যে বৃক্ষতলায়, শিবমন্দিরের চারপাশে, অথবা কোন মেলাপ্রাঙ্গণে ও উৎসব মঞ্চে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়। পল্লীর বাউল, কথক, হরবোলা, লোককবি তাদের নিজ নিজ সৃষ্টিকে সেই পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্যে উন্মুখ ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আগ্রহ ও পল্লীজনতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ভাবনা লোককবির মনে সৃষ্টি করে এক ঘনীভূত আবেগ। মেলা ও উৎসব-নির্ভর পল্লীর লোকসাহিত্য সেই আবেগানুভূতির ধারাবর্ষণ। তাই গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিবোধকে বাঁচিয়ে রাখে গ্রামবাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান। এই মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান হল অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্যের প্রচারভূমি। তাই মেলা ও উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্যের মধ্যে দিয়েই লোককবির হৃদয়ের উত্তাপ জনতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায়। জনতা আপন সমাজ ও জীবনের ঘটনা ও ছবিকে খুঁজে পায় লোককবির ছড়া-গান ও গাথায়। কারণ কবি ও শিল্পী তাদের আপন আপন লোক-সাহিত্যের উপাদান-উপকরণ প্রভৃতি অনেক সময় সংগ্রহ করে পল্লীসমাজের দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে। পল্লীর জীবন-প্রান্তর থেকে সংগ্রহ করা নানা উপাদানের দ্বারাই লোককবি রচনা করে তার হৃদয় মথিত করা ছড়া ও গান। তারপর সেই ব্যষ্টি-মনের রচনা মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে

সমষ্টিমনের সম্পদ হয়ে ওঠে। জীবনধারা যেখানে এক, ব্যষ্টিমন ও সমষ্টি-মনের জীবনচর্চার মধ্যে যখন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, সেখানে লোক-কবি ও শিল্পীর সৃষ্টির স্বাদ তাই অনায়াসেই আস্বাদিত হয় সকলের দ্বারা। এইভাবেই লোককবির রচনা মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে আপামর সাধারণের হৃদয়স্থলকে স্পর্শ করার জন্যে বেগবতী হয়ে ওঠে। এই বেগবতী হওয়াকেই আমরা ইতিপূর্বে আবেগানুভূতির ধারাবর্ষণ বলেছি। আমাদের মনে হয় সুখ-দুঃখে ঘেরা দৈনন্দিন পল্লীর জীবন ও প্রকৃতির স্বাদটুকু নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে উৎসব-নির্ভর পল্লীবাংলার লোকসাহিত্য। কখনও কখনও দেশ ও সমাজের সমসাময়িক কোন বিষয় এবং ঘটনাও প্রতিফলিত হয় লোককবির রচনা-শিল্পে।

গ্রাম্য ছড়া, গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে পল্লীবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের স্পন্দন অনাবিলভাবে অনুভূত হয়। পল্লীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মর্মর বাণী লোককবির সুরে ও গানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। পল্লীবাসীর সমগ্র হৃদয়ের আবেদন-নিবেদন লোককবির রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এইসব রচনা অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার মেলা ও উৎসবে পল্লীজনতার মাঝখানেই গীত ও প্রচারিত হয়। এইভাবে ব্যষ্টির রচনায় সমষ্টির ভাব ও ভাষা আন্দোলিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২] বলছেন ঃ

"...গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে। যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।...

সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়,—তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ব মিলনকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে।..."

রবীন্দ্রনাথ একবার নিরক্ষর মাঝির মুখে অভিমানী যুবতীর ব্যথা ও বেদনার গান শুনতে পেয়েছিলেন। শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে একদিন যখন কবি নৌকায় পাবনা-রাজসিংহের মধ্যে ভ্রমণ করছিলেন সেই সময় দশ-বারোজন লোক ডিঙি বাইতে বাইতে মিলিত উচ্চকণ্ঠে গান গাইছিল—

'যুবতী ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি।'[৩]

কবি বলছেন ঃ

"জগতে যত প্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতী চিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য,—সেই দুর্গ্রহ-শান্তির জন্য কবিরা ছন্দোরচনা এবং প্রিয় প্রসাদ বঞ্চিত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত।..."[৪]

এই গান যখন ডিঙি থেকে ডাঙায় এসে মেলা ও উৎসবে অথবা কোন

পল্লী-জনসমাবেশে প্রচারিত হয় তখন এই গানের ভাব ও ভাষা, সুর ও ছন্দে অভিমানী যুবতীর আরক্তিম বেদনার রূপটি সমষ্টির হৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে। 'যুবতী চিত্তের বিমুখতা'র করুণ ছবিটা অতি সহজেই তাই সমষ্টির হৃদয়াকাশে আঁকা হয়ে যায়। কারণ অহরহ পল্লীর নিরক্ষর মানুষের জীবনেও যে এমন ঘটনা ঘটে। তাই পল্লীজনপদের প্রাত্যহিক জীবনের সুর-লয়-ছন্দ ভাবে ও ভাষায় গাঁথা হয় লোককবির রচনায়।

পল্লীর বিটপী ছায়ায় ঘেরা উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে কিংবা আটচালা বা চণ্ডীমণ্ডপে কথক ঠাকুরের কথকতার আসরে অথবা মেলা ও উৎসবে সমবেত হয় গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষ। ঢাকে কাঠি পড়ে, আয়োজন হয় উৎসবের। মেলা দেখতে ও গাজনের গান শুনতে গ্রামের লোকেরা ভিড় করে। মেলা ও উৎসবে চণ্ডী ও মনসা মঙ্গলের গান, মহাভারতের সরল অনুবাদ বা রামায়ণ পাঠ শুনে নিরক্ষর মানুষের মন আনন্দে দুলে ওঠে। তাই তারা চোখের জলে বুক ভাসায়। এইভাবে লোকসাহিত্যের সঙ্গে লোকজীবনের একটা সাযুজ্য গড়ে ওঠে। এই সাযুজ্য গঠনে সাহায্য করে গ্রামীণ কবি ও শিল্পীর দল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি[৫] বলছেন ঃ

"...এই সকল পূজা-পার্বণই হিন্দুজাতিকে একসূত্রে বন্ধ করিয়াছে, আচার-পালন দ্বারাই হিন্দু জাতিস্মর হইয়াছে।...পুরাণকার পূজাপার্বণে বেদেরই স্মৃতি সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। যাঁহারা বঙ্গের কিম্বা ভারতের ইতিহাস লিখিতেছেন তাঁহারা আমাদের পূজা-পার্বণ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখিতেছেন।"

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে লোককবিরা তাঁদের শিল্প সম্পদকে সর্বসাধারণের কাছে প্রচার ও বোধগম্য করে তোলার জন্যে মেলা ও উৎসবকে একটা উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। মুদ্রণ প্রথার যখন প্রচলন হয়নি তখন অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্য মেলা ও উৎসবে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। গান, ছড়া, কথা ও কাহিনীর ভেতর দিয়ে লোক-শিক্ষাকেও প্রচার করা হত। আধুনিক প্রচার-ব্যবস্থা যখন জোরদার হয়নি তখন উৎসব-নির্ভর লোকসাহিত্য এবং শিল্প-সংস্কৃতির প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান পল্লীজনতার মধ্যে লোকবাহনের কাজ করত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬] দেশকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে মেলাকে তাই প্রধান উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দেশের মন্ত্রণার কাজে যদি বিলিতি ধাঁচের একটা সভা ডাকা হয়, তাহলে সমগ্র ব্যাপারটা কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ সমবেত হওয়ার জন্যে এই জাতীয় কনফারেন্স ডাকার পক্ষপাতী কখনই ছিলেন না। তাই মেলার নামে তিনি দেশকে সমবেত হওয়ার জন্যে ডাক দিয়েছেন। মেলার আহ্বানে আপামর জনসাধারণ প্রাণ খুলে ছুটে আসে। কারণ উন্মুক্ত হৃদয়ে দান ও গ্রহণ করার প্রধান উপলব্ধি হল এই মেলা। রবীন্দ্রনাথ[৭] বলছেন ঃ

"...আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না

পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না।
সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি।
বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি।...

মনে করো প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশীধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রাগান আমোদ আহ্লাদে দেশের লোক দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইত।...সেখানে ভালো কথক কীর্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।...এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়, তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর—মেলা।..."

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথাই আমাদের মনে হয় যে তিনি মেলাকে দান ও গ্রহণ করবার 'প্রধান উপায়' এবং বৃহৎ জগৎকে অনুভব করবার 'প্রধান উপলক্ষ' ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রকৃত 'অবসর' বলে মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর সার্বিক কল্যাণ বোধের কথা চিন্তা করতে গিয়ে এই মেলা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। বিলিতি ধাঁচের প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সের আয়োজন করে দেশকে মন্ত্রণা দিতে এবং সববেত করার প্রচেষ্টাতে রবীন্দ্রনাথ নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। উপরন্তু এই জাতীয় প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎকট দৃষ্টান্তস্বরূপ। কারণ স্বদেশের হৃদয় লাভের জন্যে সর্বাগ্রে স্বদেশবাসীকে একত্র করতে হবে। মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যে মানুষকে সমবেত করতে পারলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার প্রকৃতই সম্ভব হতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে আনন্দ ও সাহিত্যরসের বাতাবরণ। পল্লী-জনপদে নিরক্ষর জনসাধারণ এই মেলা ও উৎসবের আহ্বানে সমবেত হয়। শিল্প, সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সম্পদ সেখানে গীত ও প্রচারিত হয়। নীতিশিক্ষা বা লোকশিক্ষা প্রভৃতি প্রসারের জন্যে আমাদের দেশের মেলা ও উৎসাবানুষ্ঠানকে কাজে লাগানো

যেতে পারে। কারণ মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানে স্বদেশের প্রাণের স্পন্দন যেমন শোনা যায় তেমনি আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যবোধও জেগে ওঠে। তারা মনে করে যে সবাই এক পরিবারভুক্ত। যাত্রা বা কথকতার আসরে, বাউল সমাবেশে ও লোককবির ছড়া ও বাউল গান শুনে বা শিল্পীর নৃত্য সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে নিরক্ষর মানুষও সংস্কৃতবান হয়ে ওঠে। আবার কখনও তারা লোকশিক্ষা বা নীতি-শিক্ষাকে তদ্‌গত চিত্তে গ্রহণ করে। স্বদেশকে জানার ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসব যেমন একটি উপায় বা মাধ্যম তেমনি ভাবের আদান-প্রদানের দিক দিয়ে এইসব উৎসবানুষ্ঠান হল যোগাযোগের একটি সার্থক অবলম্বন। যেমন ঃ

"দেশের হৃদয় লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি সে সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে।..."[৮] কারণ স্বদেশের অন্তরে প্রবেশ করার ট্র্যাডিশনাল দুয়ার হল দেশের মেলা ও উৎসব। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন ঃ

"...এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে, সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে।..."[৯]

দেশের পল্লীসাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান হল একটি দিশী ধারা। লোককবি ও শিল্পী তাই দিশী-মানুষের কাছে তাদের শিল্প-সাহিত্যকে দিশীধারায় প্রচার করেন। এই দিশীধারা হল মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্যের মৌখিক প্রচার। এই মৌখিক প্রচারের মধ্যে লোকসাহিত্য যুগাদিক্রমে বেঁচে থাকে। কারণ ঃ

"লোকসাহিত্যের প্রধান ধর্মই এই যে, ইহা সজীব,—ইহার ধারা ক্রম-পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মৌখিক আবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার জীবনীশক্তি রক্ষা পায়—কোন নির্দিষ্ট আদর্শের বদ্ধকুণ্ডে যদি ইহা গিয়া রুদ্ধ হইয়া পড়ে তবে অচিরেই ইহার প্রাণশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়।"[১০]

লোকসাহিত্যের এই মৌখিক প্রচারের একটা সরব শক্তি আছে। নিরক্ষর মানুষ তাদের নিজ নিজ জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি অনুসারে লোকসাহিত্যের এই মৌখিক প্রচারের ভেতর থেকে ভাব ও রস গ্রহণ করে থাকে। তাই আমাদের মনে হয় লোকসাহিত্য হল জীবনের স্বাভাবিক ও সহজ-সরল প্রকাশ। জীবনের সেই স্বাভাবিক প্রকাশমুখীনতার পথ ধরেই লোকসাহিত্যের গভীর সত্যটা জেগে ওঠে। অনেক মহৎ কাব্য ও সাহিত্য প্রাচীনকালে মৌখিক প্রচারের ওপর

ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে পি. আর. সুব্রামানিয়াম[১১] বলছেন ঃ

"In the long millennia of human life all the memorable speech or literature was composed orally and transmitted orally, without the benefit of writing. When writing was devised some of this oral literature was recorded history of man no race possesses art literature without oral (folk) literature. Folk literature is the precursor of literature…"

প্রাচীনকালে কাব্য ও কবিতা এখনকার মত পড়া বা আবৃত্তি করা হত না ; বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে দলবন্ধ বা এককভাবে গান করা হত। মৌখিক প্রচারের মাধ্যমেই এইসব শিল্প-সাহিত্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছত। সুকুমার সেনের[১২] আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিল্পীরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও শিবের গৃহস্থালীর কথা ও কাহিনী গান গেয়ে লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করত। কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষে লোকেরা মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার গান কিংবা রামায়ণ গান শুনত। বলা বাহুল্য যে এইসব কথা ও গান সাধারণের মাঝখানে মুখে মুখেই প্রচার করা হত। কারণ মৌখিক প্রচারের শক্তি অসীম।

পূর্বে কথকতার আসর, মেলা ও উৎসব এবং সভা-সমাবেশ ছিল শিল্প-সাহিত্যের মৌখিক প্রচারের কেন্দ্র। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে যীশুখৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের নানা উপকথা ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ মহাদেশেও ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে। শ্রীভট্টাচার্য বলছেন ঃ

"…সাহিত্যের মৌখিক রূপের যে প্রাণশক্তি (vitality) আছে, তাহার লিখিত রূপের তাহা নাই।"[১৩]

প্রাচীনকালে রাজানুগৃহীত কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ যে-সব কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টি করতেন তা সবই রাজানুকূল্যে প্রচারিত হয়ে পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হত সন্দেহ নেই, কিন্তু অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত গ্রামের মানুষদের কাছে লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে লোককবিদের রচনা ও গানই অধিক প্রভাব বিস্তার করত। কারণ রাজসভার বদান্যতা এবং কৃপায় সেই রাজ-সভাকবিগণ যেসব কাব্য ও সাহিত্য রচনা করতেন, তাতে রাজার ফরমায়েস এবং ইচ্ছা ও আবেগের প্রাবল্য প্রকাশ পেত। টিউটন যুগের সূতরা যেমন রাজাদের কীর্তি কাহিনী বর্ণনা করতেন, তেমনি আমাদের দেশের সূতরাও মুখে মুখে গান গাইতেন। তবে এঁরা সকলেই রাজসভায় স্থান পেতেন না। রাজসভায় স্থান না পেয়ে তাই তাঁরা পথের জনতার সঙ্গে মিশে যেতেন। হাটে, মাঠে, মেলায় ও উৎসবে মানুষকে তাঁরা গান শুনিয়ে বেড়াতেন। সেইসব গানের মধ্যে রাজস্তুতি, সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও রঙ্গ-তামাসার পরিচয় থাকত। এইভাবে সভা ও সমাবেশে, উৎসব এবং পালা-

পার্বণে এই সকল সূত ও স্তুতি গায়কগণই ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাযোজনের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম যোগাযোগকারী কবি ও শিল্পী। এঁদের সেই গীত-গান ও ছড়াগুলি সম্ভবতঃ লোকমাধ্যমের আদিতম সূত্র। মহাভারতের যুগে সূত, স্তুতি গায়ক ও কবিদের প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি যে ঃ

"সূত, স্তুতি গায়ক বা কবি মাত্রই রাজসভায় স্থান পেতেন না। রাজসভায় স্থান পাওয়া সহজ ছিল না। তার জন্যে অনেক ঠেলাঠেলি করার প্রয়োজন হত। যাঁরা স্থান পেতেন তাঁরা ভাগ্যবান, তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। যাঁরা স্থান পেতেন না, তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশী। তাঁরা কি করতেন? বাইরের লোকসমাজে তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে গ্রামে উৎসব পার্বণে, মেলায় মেলায় তাঁরা কবিগান করে বেড়াতেন। ঐ রাজসভায় কবিদের রচিত গান। নিজেদের রচিত গান হলেও তার মধ্যেও রাজস্তুতি ছাড়া অন্য কিছু থাকার উপায় ছিল না। ভাঁড়ের মতন একটু-আধটু সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার তামাসা রসিকতা করার হয়ত সুযোগ তাঁরা কিছু পেতেন এবং তার মধ্যে সমাজের যৎসামান্য বাস্তব রূপও প্রতিফলিত হত..."[১৪] মহাভারতের যুগে সূত ও মাগধদের একটা পেশাদার স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। রাজ-বদান্যতা বঞ্চিত এইসব ভ্রাম্যমান সূত বা কবিদের রচনাই ছিল লোকশিক্ষা ও আনন্দের সবচাইতে বড়ো লোকমাধ্যম। রাজসভাকবি বা সূতদের রচনাকে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেবার ক্ষমতা এইসব ভ্রাম্যমান কবি গায়কদের ছিল বলে আমাদের অনুমান। পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগরিমা এবং উচ্চভাব ও কল্পনাযুক্ত কাব্য ও সাহিত্য পণ্ডিতগণের বোধগম্য হলেও কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের কাছে কথক ঠাকুরের কথা ও গান, ভ্রাম্যমান লোককবিদের ছড়া-গান আজও যেমন অধিক পরিমাণে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় ঠিক তেমনি সেই মহাভারতের যুগেও পথ-কবিদের রচনায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হত সাধারণ মানুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতীতের রাজানুকুল্যবর্জিত সেইসব ভ্রাম্যমান পথ-কবিদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আজ আর আমাদের কাছে নেই। সেইসব পথ ও প্রান্তরের লোককবিরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। কিন্তু পথের নিরক্ষর জনতা, মেলা ও উৎসবের আনন্দ-মুখরিত মানুষ সেইসব লোককবিদের পোষকতা করেছে। অথচ অজানা-অজ্ঞাত ভ্রাম্যমান অসংখ্য লোককবিদের প্রচার প্রবাহের সেই ঐতিহাসিক ধারাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

বৌদ্ধযুগেও আমরা দেখেছি যে বৌদ্ধধর্মের সহজতত্ত্বের ব্যাখ্যা সাধারণ লোকসমাজে প্রচার করেন দুই অগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় রাজকুমার মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং যে পথ অনুসরণ করলে দুঃখকষ্ট দূর হয়—এই চারটি সহজ সত্যকে গৌতমবুদ্ধ প্রচার করলেন আপামর জনসাধারণের মধ্যে। এই চারটি সত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গৌতমবুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথাও বলেছেন। এর মধ্যে প্রধান হল হিংসা-দ্বেষ থেকে বিরত হওয়া, জীবহত্যা না করা, চৌর্যবৃত্তি পরিহার করা,

নিন্দা থেকে নিরস্ত হওয়া, কর্কশ বা কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করা এবং সর্বোপরি সৎ উপায়ে জীবনযাপন করা প্রভৃতি। গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধর্মের এই বাণীগুলি ভারতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন জনপদে প্রচার করেছিলেন। সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্যে বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী পর্বতগাত্রে, প্রস্তরখণ্ডে ও শিলাস্তরে উৎকীর্ণ করে দেওয়া হত। জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এগুলোই ছিল সেকালের প্রচারযন্ত্র। জগতের আদি ধর্মপ্রচারক হিসেবে বুদ্ধদেবের সঙ্গে শাক্যসিংহের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌতমবুদ্ধের অনুসরণকারী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও ধর্মপ্রচারে এগিয়ে এলেন। এইসব বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ প্রচারক, গায়ক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন। এঁরা ছিলেন সহজমতের প্রচারক। সিদ্ধাচার্যগণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[১৫] বলছেন ঃ

"...উহারাই বাঙ্গালীর গোড়ার কালের ধর্ম প্রচারক, ভাব প্রকাশক, ব্যাখ্যাতা, গায়ক ও গুরু ছিলেন। উহাদের অনেকের মনীষা প্রভাবে বাঙ্গালার সর্বপ্রকারের বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।...বুদ্ধদেব শাক্য সিংহ জগতের আদি ধর্মপ্রচারক, তিনিই ভারতবাসীকে প্রচার-পদ্ধতি শিখাইয়া যান। বাঙ্গালার সিদ্ধাচার্য এই আদি বৌদ্ধ প্রচারকগণের বাঙ্গালী সংস্করণমাত্র।...

সিদ্ধাচার্যগণ সহজমতের প্রচারক, বাঙ্গালাভাষার স্রষ্টা, পদকর্তা, গায়ক, কীর্তনীয়া গুরু প্রেমধর্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন...।"

বুদ্ধদেব এবং শাক্যসিংহ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মমতের প্রচার ব্যবস্থাটা সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারা আরও শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। অর্থাৎ পূর্বের প্রচার পদ্ধতিকে সহজ মতাবলম্বী বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ শ্রুতিমধুর করে তোলেন মনোরম প্রকাশের মাধ্যমে। সাধারণের মধ্যে সহজ মতের এই মনোরম প্রকাশভঙ্গি অচিরে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কারণ সিদ্ধাচার্যগণ সেই সহজ মতকে কীর্তন ও কথকতার সাহায্যে প্রচার করতেন। গান গেয়ে তাঁরা ধর্ম প্রচার করতেন। এই সহজমতের প্রচার কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল সেকথা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি।

"...সহজমত বৌদ্ধমত নহে, জৈনমত নহে, গোরক্ষনাথের নাথীসম্প্রদায়ের অনুরাগী নহে ; উহা শূন্যবাদ বটে, পরন্তু সেইসঙ্গে আনন্দবাদ ও দেহতত্ত্ব জড়ান আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই সহজমতের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ; চণ্ডীদাসের পদাবলী সহজমতের প্রকাশক ; গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রেমের ধর্ম ও রসতত্ত্ব সহজমতের একাংশের আকারান্তর মাত্র ; এমন কি বাঙ্গালার তন্ত্র ধর্মের এক অংশ এই সহজ মতের প্রকরণ বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না... ।"[১৬]

এইসব আলোচনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে এই প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। সাধারণ মানুষকে আনন্দ ও গানের মাধ্যমে লোকশিক্ষা বিতরণ করা হত। বৌদ্ধযুগে ডাকের দলেরা হাটে, মাঠে, জনারণ্যে কথা কয়ে বেড়াত। তারা গান না করে এই কথার মাধ্যমে লোক-

শিক্ষা প্রচার করত। বাংলায় আজও আমরা "ডাকের কথা"র নাম শুনতে পাই। অনেকে মনে করেন যে ডাক হল সিদ্ধাচার্যের নাম। আবার সেই সিদ্ধাচার্যের সম্প্রদায়কেও ডাক নামে অভিহিত করা হত। এইভাবে কথক, গায়ক 'ডাক' বা সিদ্ধাচার্যগণ নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে নীতিকথা, ধর্ম-কথা প্রভৃতি প্রচার করতেন। বৌদ্ধযুগে এই প্রচার যে কতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল সে-কথা আমরা ই. বি. হ্যাভেল[১৭]-এর মন্তব্য থেকে জানতে পারি ঃ

"...The kathaks, or professional story tellers, were probably the most successful propagandists of Buddhism among the uncultured non-Aryan masses ; for it is easy to believe that these delightful old-world tales appealed more strongly to popular imagination than the abstract philosophy of the vedas, especially as the doctrine taught by them relieved the people from the intolerable sacrificial ritual of the Brahmins."

বেদোক্ত ধর্ম-তত্ত্বের কঠিন ব্যাখ্যাসমূহ অপেক্ষা কথক, গায়ক এবং পেশাদারী গল্প-বলিয়েরা অনু-আর্য মানুষের কল্পনা শক্তিকে উজ্জীবিত করে তুলত তাদের সহজ সরল সাবলীল কথা, গান ও গল্পের মাধ্যমে। ধর্ম-তত্ত্বের দুরূহ এবং দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা তাই সেই সাক্ষরহীন, অসংস্কৃত জনসাধারণের কাছে আশানুরূপ আবেদন সৃষ্টি করতে পারত না, যতখানি আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত কথকের সেইসব মৌখিক কথা, গল্প ও গান। তাই অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে কথা, গল্প ও গানগুলি ছিল যুগবাহিত জনপ্রিয় লোকমাধ্যম। এইসব কথা, গল্প ও গানের মধ্যে দেশাচার, ব্যবহারিক জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা এবং দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরা-কাহিনীর বিষয়গুলি অঙ্গীভূত থাকত। প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যতায়, প্রচারের সুর-লালিত্যে সেইসব জনপ্রিয় বিষয়গুলি অচিরে জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হত। লোকশিক্ষার উপায় হিসেবে তাই এইসব কথা ও কাহিনী, গল্প ও গান সেই অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন ঃ

"একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা মালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুসনুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে

পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম, যে লোকহিত পরমকার্য...”[১৮]

এইভাবে ইতিহাস, ধর্ম পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতের নানা বিষয়কে নিয়ে কবি বা কথক ঠাকুর পল্লীর নিরক্ষর মানুষের কাছে সরস উপায়ে মুখে মুখে প্রচার করতেন। কথক, ব্যাখ্যাতার মৌখিক প্রচার শক্তির গুণে সেই সব বিষয় অচিরে সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে এ-দেশে লোকশিক্ষা বিস্তারের উপায়ের কোনই অভাব ছিল না। “এখনকার অবস্থা এরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন ?...

সেই কূট তত্ত্বময়, নির্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্বোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না ?...”[১৯]

বৌদ্ধ পরবর্তী যুগেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন পল্লীর আসর ও উৎসবে কবিকঙ্কণ, ঘনরাম থেকে ভারতচন্দ্র ও দাশরথী রায় পর্যন্ত দেশীয় কাব্যগুলি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচারিত হত। মনসার ভাসান বা চণ্ডীমঙ্গলের গান মুখে মুখে প্রচার লাভ করেছিল লোককবিদের দ্বারা। এইসব কাব্য-কথা ও কাহিনীকে নিয়ে লোককবি ছড়া কাটতেন বা গান বেঁধে নিরক্ষর মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। আবার কখনও বা উৎসব প্রাঙ্গণে ধর্মমঙ্গল, শিবায়ণ, রামরসায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যসমূহ লোকসমাজে গীত ও প্রচারিত হত। পাঁচালীওয়ালারা মুখে মুখে পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিদের কাব্য প্রভৃতি উৎসব-আসর থেকে প্রচার করতেন। এই পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, কথকঠাকুর, যাত্রাশিল্পী ও গায়েনের দলেরাই ছিল এইসব মহৎ শিল্প-সাহিত্যের প্রচারকারী কবি ও শিল্পী। যেমন ঃ

“...শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা গ্রামে গ্রামে হইত। মহাজনীপদ সকলের প্রচার হইত কীর্তনীয়ার কণ্ঠে এবং কালিয়দমনের যাত্রায় ;—রামপ্রসাদের মালসীর এত প্রচলন পাচালীওয়ালাদের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল।...”[২০]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পাঁচালী, কবির গান, কীর্তন প্রভৃতি সাহিত্য-শিল্প-সম্পদের সাহায্যে লোক-শিক্ষা প্রচারিত হত। পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষ প্রচারের সহজ-সরল আঙ্গিকগত কলাকৌশলেই আকৃষ্ট হত। এইসব প্রচারের বৈশিষ্ট্য ছিল বিষয়কে সরস করে তা সকলের বোধগম্য করে তোলা। লোকসাহিত্য প্রচারেও এই

আঙ্গিকগত কলাকৌশল-ই লোককবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়। বিষয়বস্তুর ভাবগৌরবটি সরলীকৃত হয়ে সাধারণ মানুষের মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করে। অতীতে এগুলিই ছিল লোকশিক্ষার এক মহৎ গৌরব। "...ব্যাস, কথক, ব্যাখ্যাতা, পুরাণপাঠক, যাত্রা, কীর্তন, পাঁচালী, কবির গান প্রভৃতির সাহায্যে পূর্বে যে Mass Education হইত, তাহা এখনকার বিশ্বপণ্ডিতগণের কল্পনায় স্বপ্নেও উদিত হয় না। এই Mass Education-এর প্রভাবে মহাজনীপদ, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদের মালসী, কবিকঙ্কণ হইতে দাশু রায়ের পাঁচালী সমাজের আপামর সাধারণের মুখে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইত। এই Mass Education-এর প্রভাবে জাতির চরিত্র এক অপূর্ব বিশিষ্টতা উপেত হইয়াছিল। বেদান্ত-তত্ত্ব, সাধনতন্ত্রের সিদ্ধান্ত চাষা-ভুষার মুখেও, গোঠে মাঠে বাটে রাখালের কণ্ঠধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিত। কলু ঘানির উপর শুইয়া ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রামপ্রসাদের গান—'মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ ঢাকা বলদের মত' গায়িতে গায়িতে দুই নয়নের ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিত। আমরা দেখিয়াছি, ডোম এক ঝাঁকা তাল কাটিয়া লইয়া বাজারে বেচিতে যাইতেছিল, সেই তাল বেচিয়া পয়সা আনিয়া, তবে তাহার পুত্র-কন্যায় অন্ন যোগাইবে; পথে শুনিল, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে, মাথুরের পালা গান হইতেছে। সে ঝাঁকা নামাইয়া গান শুনিতে লাগিল। যখন গোবিন্দ বাঁকা হইয়া দুই নয়নের জলধারায় বুক ভাসাইয়া গান ধরিল—"ঐ সে মাধবী, আমার মাধব লুকাইয়েছিল—" তখন নিরক্ষর ডোম আর থাকিতে পারিল না, তাহার সর্বস্ব কাটাতালের ঝাঁকাখানা পেলা দিয়া ফেলিল এবং ভাবে বিভোর হইয়া আসরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ইহা চূড়ান্ত Mass Education-এর ফল—আনন্দময় পরিণাম। এই Mass Education বা প্রচারকার্য আমরা বৌদ্ধদিগের নিকট শিক্ষা করিরাছি। বৌদ্ধধর্মই জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচারের ধর্ম।..."[২১]

রবীন্দ্রনাথের "গ্রাম্য সাহিত্য"[২২] শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেও আমরা জানতে পারি যে গ্রাম্য ছড়াতে শিব-দুর্গা ও রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ছাড়াও রাম-সীতা এবং রাবণ প্রসঙ্গও এসেছে। শিব-দুর্গার ছড়ার ভেতর থেকে যেমন নারী ও পুরুষের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি রাধা-কৃষ্ণের কথায় দেখি নায়ক ও নায়িকার রূপ বর্ণনা ও বৈভবের পরিচয় পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। রাধা-কৃষ্ণ যেন বাঙালীর সৌন্দর্য ও রূপ সাধনার প্রতীক আর হরগৌরী যেন বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের আটপৌরে হৃদয়বৃত্তির প্রতীক। দেশীয় ছড়ায় রাম-সীতার ও হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবন, রামায়ণ কথায় কর্তব্যবোধ, ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয় বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় নানাভাবে বর্ণিত। এগুলি গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলেছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রামের মানুষ একাগ্র চিত্তে এই বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করেছে। রবীন্দ্রনাথ[২৩] এই প্রসঙ্গে বলছেন :

"...দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের

যতপ্রকার উচ্চঅঙ্গের হৃদয় বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই।…"

আমাদের মনে হয় মৌখিক প্রচারের গভীরে এক অমিত প্রাণশক্তি বিরাজমান। লোকসাহিত্যের মৌখিক প্রচারটিও তাই উপেক্ষণীয় নয়। প্রচারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা আমাদের মনে পড়ে। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে জনমতকে জোরদার করার জন্যে সেদিন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গভঙ্গ জাতীয় আন্দোলনের স্মরণীয় দিনটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে একটি অভিনব প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গবিভাগের দিনটিকে অরন্ধন দিবস হিসেবে পালনের ডাক দিয়ে বাঙালীর ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে বঙ্গবিভাগের দিনক্ষণকে যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের দরুণ বাঙালীমনের প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষকে প্রচারের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর লোকসাহিত্য প্রচারের জনপ্রিয় বিষয় ও আঙ্গিককে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠ ও অনুষ্ঠান পালনের ভেতর দিয়ে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে জাতির বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। এই ক্ষোভকে প্রচার করার জন্যেই রামেন্দ্রসুন্দর একটি অনুষ্ঠানকে মাধ্যম (media) হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিলিতি দ্রব্য বর্জন এবং বঙ্গমাতাকে হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত করার আহ্বান এই ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠল। আশুতোষ ভট্টাচার্য[২৪] এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"সকল ব্রতেরই যাহা উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প করিয়া কিছু কামনা করা তাহাই জাতীয় চিত্তের ভিতর দিয়া জাতীয় কামনায় রূপান্তরিত হইয়াছে।…" সেদিন বাঙালী জাতির ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশপ্রেমের প্রচার অভিযান ব্যাপক রূপ নিয়েছিল।

আমাদের দেশ পূর্বে ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। সমগ্র ভারতবর্ষের পল্লীবাসীরাই ছিল একদিন প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশের জনসাধারণ। সেই পল্লীবাসীদের ধর্ম-কর্ম, শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হত দেশের মানসিকতা। আমাদের পল্লীবাংলার মূলেও সেই একই কথা। পল্লীবাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই সমগ্র দেশের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হত। পল্লীর ছড়া, গাথা, গান, প্রবাদ, ব্রতধারা, ধাঁধা, কথা ও কাহিনী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকসাহিত্যের মধ্যে আমাদের স্বদেশ ও সমাজের প্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলি প্রতিবিম্বিত হয় বলেই লোকসাহিত্যের এই 'লোক' শব্দটির আইডিয়াটি যেমন গভীর তেমনই ব্যাপক। তাই 'লোক' শব্দটির তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে পণ্ডিত ও সমালোচকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন যে, 'লোক' কথাটির সঙ্গে লাতিন শব্দ 'lucus' এবং লিথুনিয়ান 'laucus' শব্দের তুলনা করা যেতে পারে। লিথুনিয়ান 'laucus'

শব্দটার অর্থ হল কর্ষণ ক্ষেত্র অথবা কর্ষণযোগ্য জমি। আর লাতিন 'lucus' কথাটার অর্থ হল কর্ষণের জন্যে জঙ্গল সাফ করার স্থান। এই কথার সূত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আরও বলছেন ঃ

"সংস্কৃতে লোক শব্দের আদি ও অকৃত্রিম অর্থের সঙ্গে যে চাষের জমির সম্পর্ক ছিলো না এমন কথাও খুব জোর করে বলা যায় না। কেননা মনিয়ার উইলিয়ামস্-ই বলছেন শুরুতে লোক শব্দের আগে একটা 'উ' থাকতো— উলোক। এই উলোক=উরুলোক। এবং তার মানেই হলো জমি, মাঠ ইত্যাদি।..."[২৫]

ইংরেজী 'Folk' অর্থেও 'লোক' কথাটা প্রচলিত। এখানে 'লোক' কথাটার অর্থ হল 'people' বা জনসাধারণ। এই জনসাধারণ বিশেষ শ্রেণীরও হতে পারে (people of a specified class)। অথবা সেই জনসাধারণ বলতে বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী সম্বন্ধীয়কেও বোঝাতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে এই জনসাধারণ হল পল্লীর সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। যারা শ্রমজীবি ও কৃষিজীবি। চাষের জমিতে, কামারশালায় ও তাঁতশালাতে যারা তাদের শ্রমদান করে। যাদের জীবনের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র ও বিচিত্র কর্মশালা গভীরভাবে অন্বিষ্ট। কৃষিকর্ম ও বিভিন্ন শ্রমকর্মে যাদের জীবন অতিবাহিত। কৃষিক্ষেত্র বা ভূমিলক্ষ্মী, তাঁতশালা, কামারশালা, নদ-নদী প্রভৃতি কর্মযজ্ঞের নানা উপাদান-উপকরণ ছিল পল্লী মানুষের প্রাণ ও কর্মশক্তির উৎস। পল্লী মানুষের এই সমবেত কর্মশক্তি গ্রাম-সমাজকে সজীব ও প্রাণচঞ্চল করে রাখত। পল্লীর সাধারণ মানুষ শ্রমকে কর্মোৎপাদনের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করত। শ্রম ও কর্মোৎপাদনকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনে সৃষ্টি হত গভীর আনন্দ ও আবেগ। এই আনন্দ বা আবেগ থেকেই সৃষ্টি হত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীত। যেগুলো ছিল পল্লীর শ্রমজীবিদের গোষ্ঠীসঙ্গীত। আশুতোষ ভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন যে এই জাতীয় সঙ্গীতগুলো হল কর্ম বা শ্রমসঙ্গীত (worksong)। এই সঙ্গীত কোনো না কোনো দৈহিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বাংলার লোকসঙ্গীতের একটা প্রধান বিভাগের নাম তাই কর্মসঙ্গীত রূপে স্বীকৃত। জীবনের উপাদান দিয়ে গড়া এই লোকসঙ্গীতগুলি শ্রম-জীবিদের শ্রমকে লাঘব করে দেয়। জীবিকার জন্যে তারা শ্রমদান করে। আবার শ্রম বা কর্মোৎপাদনের ভেতর থেকে তারা আনন্দকে খুঁজে পায়। কারণ গান শ্রমজীবিদের ক্লান্তি ও একঘেঁয়েমীকে দূর ক'রে মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে। কাজের সঙ্গে তাই তারা আনন্দ ও গানকে মিশিয়ে দেয়। এই গান ও আনন্দ তাদের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে 'ধ্বনিত' হয়। শ্রমক্লান্ত জীবনের অবসর বিনোদনের পথে এই স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতগুলির অবদান নিতান্ত কম নয়। সঙ্গীতের তাল, লয়, মূর্ছনা শ্রমজীবিদের কর্ম-প্রবাহের মধ্যে এসে একটা আবেগের সঞ্চার করে। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা টুকরো টুকরো ছড়া, গান প্রভৃতি লোকসাহিত্য মুখে মুখে রচনা করে। পল্লীর সাধারণ মানুষের শ্রমজীবনের অন্তরালে লোকসাহিত্যের নানা

শিল্প সম্পদ প্রস্তুত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ[২৬] বলছেন ঃ

"সেইজন্য জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে, সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠন কার্যও চলিতেছে, তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকে ঐক্য সূত্রে গাঁথিয়া নিত্য কালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে।..."

আনন্দ ও গান হল শ্রম ও কর্মোৎপাদন পদ্ধতির একটা অঙ্গ। প্রাচীন কালের মানুষ গানকে শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে না দেখে উৎপাদন পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবেও দেখেছিল। উপনিষদের যুগেও গান ছিল খাদ্য-উৎপাদন কর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একথা আমরা জানি যে বাক্ বা ভাষাকে বাদ দিয়ে গান হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে[২৭] আছে 'বাক্-ই-গী'। শ্রম বা কাজের সঙ্গে বাক্ বা ভাষার সংযোগেই পরবর্তী কালে শ্রমসঙ্গীত বা কাজের গান-এর উদ্ভব। শ্রম বা কাজ তখন দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ওপর নির্ভর না করে মুখের ভাষার ওপর নির্ভর করছে। সেই ভাষায় সুর বা নৃত্য একটি সম্পদ হয়ে পড়েছে। এর নামই গান বা লোকসঙ্গীত যা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। এই লোকসঙ্গীত সকলকে একতানে ঐক্যবদ্ধ করে তুলছে। এইভাবে শ্রমের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যের যোগসূত্র স্থাপিত হল। উৎসবানুষ্ঠানেও তাই দেখি একা একা উৎসব হয় না। আদিম মানুষেরা কোন কিছু শুরু করার আগে নাচ ও গান করত সমবেত ভাবে। উৎসবের মধ্যে মানুষ সমবেত হয়ে মনের কামনাটাকে সফল করে তোলার জন্যে মুখের ভাষার সাহায্যে সুর করে গান গেয়েছে কিংবা নাচের আয়োজন করেছে। এই ভাষা, নাচ, গান-ই হল লোকসাহিত্য। শ্রমের মধ্যে যেমন মানুষ নিজেকে নিয়োগ করেছে উৎপাদন বৃদ্ধিতে, উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি কামনা সফল হবার ছবিকে দেখতে দেখতে সমগ্র দলটা মেতে উঠেছে। আমাদের ব্রতোৎসবের মূলেও এই মনস্কামনার স্বরূপটা সুর ও ভাষায়, কথা ও ছড়ায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রমোৎপাদনের মধ্যেও মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতা যেমন দেখা যায় তেমনি মেলা ও উৎসবের মধ্যেও মানুষের ঐক্যবদ্ধতা ও সমষ্টিগত প্রয়াসটাই চোখে পড়ে। উৎসবের সঙ্গে নাচ, গান ও আনন্দের সম্পর্কটা গড়া হয়। শ্রম বা কর্মোৎপাদনকে যেমন গান সাহায্য করছে, তেমনি মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানকে নির্ভর করে মানুষের কল্পনাশক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার নাচ ও গানের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে সেই গান ও নাচ উৎসবানুষ্ঠানকে সাহায্য করছে এবং উৎসবের মূলগত চেতনাকে প্রকাশ করছে। এইভাবে লোকসাহিত্যের একটা বিশেষ অংশের সঙ্গে মেলা ও উৎসবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শ্রম ও কর্মোৎপাদনের মূলেও সেই গান

যা তার কাজের সঙ্গে সংযুক্ত। উৎসবানুষ্ঠানের ভেতরেও সেই গান যা সেই উৎসব এবং তার ক্রিয়ানুষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২৮] এই জাতীয় লোকগীতি ও কাহিনীকে গ্রাম্যসাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের[২৯] মতে গ্রাম্যসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্য মাত্রই লোক-সাহিত্য। এই লোকসাহিত্যের মধ্যেই মুখরিত হয় পল্লীর সাধারণ মানুষের জীবন। আমাদের পল্লীগ্রামের প্রচলিত লোকসাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্যকে নিয়ে অতীতে উচ্চকুলের কবিগণ মহৎ ভাবসম্পন্ন একাধিক কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন। এইসব মহৎ ভাবসম্পন্ন কাব্য-গাথার সঙ্গে পল্লীর ছড়া ও গানের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩০] বলছেন ঃ

"নিচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা-ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।···কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্যছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সম্পূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।"

এই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রাম্য ছড়া সেদিন অবশ্য রাজসভায় বন্দিত হয়নি, কিন্তু গ্রামের আপামর জনসাধারণের দ্বারা বন্দিত হয়েছে।

"···সে যুগে সম্পন্ন হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপের নাটমন্দিরে মঙ্গলগান কিংবা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ-কথকতার আসর বসিত, তখন সমাজের নিম্নস্তরের লোক, যাহাদের সেই আসরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তাহাদের সাহিত্য সৃষ্টি ও তাহার রসাস্বাদন নিরুদ্ধ হইয়া ছিল না ; কারণ, তাহা কদাচ এমন নিরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা নিজেদের সাহিত্য নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইয়া তাহা হইতে নিজেদের ভাবেই রসাস্বাদন করিয়াছে।···"[৩১]

টুসু তাই মৃন্ময়ী নয়—মানবী। টুসু গানের ভেতর দিয়ে পল্লীজীবনের প্রেম ভালবাসার অনুভূতিগুলি রাঙা হয়ে উঠেছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিরহকে লোককবি সাধারণ নরনারীর প্রেমপ্রীতির ভাবনায় রঞ্জিত করে তুলেছে ঃ একটি টুসু গানে সেই ভাবনা মর্মরিত।

"এ পাড়াতে ও পাড়াতে
টাঙ্গালাম ফুলের মালা।
সে মালা শুকায়ে গেলো
এলো না চিকন কালা—"

করম উৎসবের ঝুমুর গানে রামায়ণের বিষয়কেও আপন ভাবনার-রসে জারিত করে লোককবি সমষ্টির কাছে তুলে ধরেছে ঃ

"কেশালিয়া ধুনি ধুনি কান্দে
কোশল্যা রাণী,
বলি হাইরে হাইরে হায়।
ভারত নিরপতি কে ভাই
হারালি অযোধ্যাপুরী,
রাম ও চালালাই বনবাসে
বলি হাইরে হাইরে হায়॥"[৩২]

সিংহভূম জেলার সেরাইকেলা অঞ্চলের ভাদুগানে রামায়ণের বিষয়ঃ

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া
বাল্মীকির তপবনে।
লবকুশ ধরেন ঘোড়া, সীতা বলেন
দাও ছাড়ে॥
ছাড়ব না ছাড়ব না ঘোড়া,
ছাড়ব না বিনা রণে।
আসুন দেখি শ্রীরামচন্দ্র
রণ করুক আমার সনে।..."[৩৩]

টুসু ও ভাদুর বিদায় দৃশ্য বাঙালী গৃহের বিজয়াদশমীর মত লোক-কবির গানে ও ছড়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমনঃ

"এতদিন রাখিলাম মাকে
গুঁজি কপাট দিয়ে গ।
আর রাখিতে নাল্লম মাকে
মকর আল্য লিতে গ॥..."[৩৪]

সাঁওতালী বাংলা ঝুমুর গানের মধ্যে বিরহিনী শ্রীরাধিকার করুণ বিলাপ শোনা যায়—

"আমার মন তোমার মন
একই মন ছিল
আরও তুমি পালি (পাইলে)
দোসরের মন।
দেশ হৈতে বিদেশ গেলি ল
কই পালি (পাইলে) দুলালির ঘর॥"[৩৫]

এইভাবে আমরা দেখি যে গম্ভীরা গানে শিব প্রসঙ্গ এসেছে। নীলগাজনের গানে শিব-দুর্গার ঘরকন্নার কথাও আছে। আলকাপ গানে রাধা-কৃষ্ণের বিষয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি আবার বোলান গানে শোনা যায় নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ। তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে মধ্যযুগীয় কবিকুলের কাব্যের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রাম্য ছড়ার কোন মর্মগত প্রভেদ ছিল না। আশুতোষ ভট্টাচার্য স্বীকার

করেছেন যে লোকসাহিত্যকে অবলম্বন করেই মধ্যযুগীয় কাব্যের বারমাসীর বর্ণনার প্রকাশ ঘটেছিল। সীতার বারমাসী, রাধার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। তবে একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বিশেষত এই জাতীয় গান ও ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমাজ ও যুগ সচেতনতা। লোককবি নিজের পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা কখনও উপেক্ষা করেনি। তাই আমরা দেখতে পাই যে টুসু, ভাদু, গাজন-গম্ভীরা প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে সমসাময়িক নানাবিধ সমস্যা, লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা কখনও ব্যঙ্গের আকারে আবার কখনও হাস্যরসাত্মক উপায়ে কিংবা করুণ-কান্নায় নির্ঝরের মত ঝরে পড়েছে। যেমন টুসু গানে আছে নীতিশিক্ষা বা লোকশিক্ষার পরিচয়ঃ

"বারে বারে বারণ করি
গলিতে জল ফেলনা
কুল গেলে কলঙ্ক হবে
দেশের বাহির হইও না।[৩৬]

আবার সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়-ভাবনা টুসু গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছেঃ

"জাগলো সাড়া ভারতের মনে
(টুসুর) জয় হবে সবাই জানে।
টুসুর বাণী উঠছে ধ্বনি
শুনগো তোরা স্ব কানে।
বাংলা ভাষায় রাজ্য গঠন
তাঁহারি বিজয় গানে।...[৩৭]

আবার ভাসুর সম্পর্কে গ্রাম্যবধূর তেজী মনোভাব টুসু গানে অভিব্যক্তঃ

"বিষ্ণুপুরে দেখে এলুম শালগাছে
বেল ধরেছে
চললো, বেল পাড়তে যাব
যখন বাগাল বাঁশী ফোঁকে তখন অমরা হেঁসেলে
কি ক'রে বেরোপ হ্যাংলা ভাসুর দুয়ারে।"[৩৮]

অথবা টুসু গানে রামায়ণের এবং ভাগবতের কাহিনীঃ

"বনে চলি বনে চলি
বনে চলা দায় হইল
ফুটিল লবকুশের কাঁটা
কোন বনে হারাইল।
ভিক্ষে দাও মা, দাও মা সীতা..."[৩৯]
ইত্যাদি—

মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহিত্যের আলোচনা সূত্রে উৎসব-নির্ভর নানা অনুষ্ঠানের ছড়া ও গানের কথা উদাহরণ যোগে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উৎসবানুষ্ঠানের এই বিশেষ শ্রেণীর লোকসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক পরিচয় দানের পূর্বে মেলা ও উৎসবের দর্পণে যুগে যুগে প্রতি-ফলিত হয়েছে বাংলার বাউল গান। সেই বাউল গানের আরও কিছু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করে বাউল গান লোকসাহিত্য কিনা সে জিজ্ঞাসা এখানে রাখা হল।

বাউল গান : লোকসাহিত্য : জিজ্ঞাসা

ইতিপূর্বে বাউল ও বৈষ্ণবদের মেলা ও উৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে মেলা থেকে আহরিত একাধিক বাউল গানের উল্লেখ করা হয়েছে। বাউল মেলার কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে এসে গেছে বাউলের ধর্ম ও সাধনার কথা। কারণ গভীর তত্ত্বমূলক বাউল গানের উল্লেখ করার সময় বাউল সাধনার কথাকে তাই বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। মেলা ও উৎসবা-নুষ্ঠানের লোকসাহিত্যের উল্লেখ ও পরিচয় দিতে গিয়ে মেলা থেকে সংগৃহীত বাউল গানকে অপাংক্তেয় করে রাখা গেল না। যদিও এ কথা স্বীকার্য যে বাউল গান লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে—বাউল গান পল্লীর লোকজীবনকে আবহমানকালধরে আনন্দ দান করে এসেছে। গ্রামবাংলার নিরক্ষর নরনারী আজও অবিচলিত চিত্তে বাউল গান শুনে এক অভেদ আনন্দ অনুভব করে। বাউল গানের ধর্ম-সাধনার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তারা শুধু বাউল গানের সুর ও নৃত্য ধারায় অভিষিক্ত হয়। সাধন-তত্ত্বের দুয়ার খুলে নিরক্ষর মন বাউল গান বিচার করতে পারে না, কিন্তু বাউল গান শুনে তারা শিহরিত হয়। চমকিতও হয়। প্রাণাবেগে আপ্লুত হয়ে বাউলের সুরে সেইসব পল্লীহৃদয় নৃত্য করে ওঠে। তাই বাউল গান লোকসাহিত্য হয়ে উঠতে না পারলেও পল্লীর লোক-আত্মাকে জয় করে নিয়েছে।

বাউল যখন চকিতে গেয়ে ওঠে—

"…সমুদ্দেরেতে জল নাই
পাহাড়ে মারে ঢেউ
যার বাবার কোলে মাগ্ নাই
তার বেটার কোলে বউ…"

বাউলের এই উল্টা সাধনা পল্লীর সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না বটে কিন্তু এই গানের ভাবসম্পদে যে আশ্চর্যজনক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে নিরক্ষর মানুষ না বুঝেও তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। কোন উৎসাহী বিদগ্ধ মানুষ যদি সেইসব নিরক্ষর মানুষকে এই গানটির ব্যাখ্যা ক'রে বাউলের ধর্ম ও সাধনার কথা বোঝাতে যায়—তাহলে তার আনন্দ-রসটি মাঠে

মারা যাবে। সে তত্ত্ব-দর্শন চায় না, কিন্তু গান শুনতে চায়।—They do not want to shatter their unbound joy and happiness.

আর একটি বাউল গানে আছে—

'…ঘরে চোরে করল চুরি
চাবি রইল আঁটা
সেই চোরকে যে ধরতে পারে
সেই তো বাপের বেটা…'

এখানেও সেই মিরাক্‌ল্‌ সৃষ্টির প্রয়াস। বাউল গানের এই কথায় পল্লীর মানুষ ভাবনার সাগরে ডুবে যায়।

ক্ষণমুহূর্তের আবেগ ও উত্তেজনায় (at the spur of the moment) পল্লীর সাধারণ মানুষ নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এক অপরিসীম ও অনির্বচনীয় আনন্দে নিরক্ষর জনতা বিমুগ্ধ হয়ে যায়। বাউল গানের মধ্যে যে জাদু আছে, সেই জাদুশক্তির মাধ্যমে মেলার আসরে অগণিত জনতা আকৃষ্ট হয়। পল্লীর বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মানুষ তন্ময় চিত্তে বাউল গান শুনে এক অপার আনন্দ লাভ করে।

অনেক বিদগ্ধ সমালোচক বাংলার বাউল গানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করে আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক দর্শন রূপেই গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন যে বাউল গানের মধ্যে সাধারণ লোকসমাজের সামগ্রিক চৈতন্যের কোন প্রতিফলন নেই। আশুতোষ ভট্টাচার্য বাউল গানকে অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীত বলে মনে করেন। তাঁর মতে বাউল গানগুলি বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধীয় গান। এগুলি সহজিয়া তত্ত্বের গান। একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় কর্তৃক এই ধর্মসঙ্গীতগুলির সৃষ্টি। তাই বাউল গানে শুধুমাত্র সাধকের ব্যক্তিমানসের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সাহিত্যের প্রধানভিত্তি হল বাস্তব জীবন বোধ। বাউল গানে তা অনুপস্থিত। তাই বাউল সঙ্গীত লোকসাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। এই জাতীয় দুর্বোধ্য, হেঁয়ালীপূর্ণ, তত্ত্ববিষয়ক গূঢ়ার্থ-বাচক গান কখনই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। কারণ সাহিত্যের সর্বজনীন মানবিক আবেদন বাউল গানে নেই। আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্মবোধে সমৃদ্ধ বাউল গানের অর্থ সাধারণের বোধগম্য হয় না। কারণ অধ্যাত্মবোধে আবিষ্ট হয়ে সাধকগণ বাউল গান রচনা করেন। তাই সেই তত্ত্বমূলক বাউল গানের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হয় সেই কঠিন আধ্যাত্মিকবোধ ও সাধনাকে আয়ত্তে আনার। এই কাজ সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত দুরূহ। কারণ আধ্যাত্মিক সাধনাকে আয়ত্তে না এনে এই কাজ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব।

এই অভিমত ও সুচিন্তিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তবু এ কথা কি বলা যায় না যে বাউল গান বাংলার মেলা ও লোকজীবনের সঙ্গে যুগাদিক্রমে এক

গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। মেলা ও পল্লীর জীবনধারার স্রোত থেকে প্রবাহিত হয়ে বাউল গানগুলি বৃহত্তর লোকসমাজের বিস্তৃত জলধির মধ্যে এসে আপামর জনসাধারণকে অভিষিক্ত করে। বাউল গানের তত্ত্ব, দর্শন, ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে না বুঝেও সাক্ষর, নিরক্ষর মানুষ এক সুগভীর আনন্দানুভূতি লাভ করে। তাই সাধকের সাধনা-সিদ্ধ বাউল গান আবহমানকাল ধরে জনমুখী হয়ে আজও বেঁচে আছে। বাউল গানের প্রাণ-স্পর্শী ভাষা, আবেগভরা নৃত্য ও সুরের ঝর্নায় গানগুলি নিঃসন্দেহে লোক-সঙ্গীত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাউল গান যদি লোকসঙ্গীত হয় তাহলে আংশিকভাবে লোকসাহিত্য হতে তার বাধা কোথায় ? আনন্দ-মধুর আবেদনে রস-সমৃদ্ধ এই বাউল গান মেলার আসর থেকে উৎপন্ন হয়ে অচিরে জন-সাধারণের সমগ্র হৃদয় জয় করে নেয়। তাই মেলা ও উৎসবে বাউল-শিল্পী ও জনতা সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। বাউল গানের ভাষা ও ভাবের দরজা যেখানে বন্ধ, সেখানে বাউল গানের নৃত্য, ছন্দ ও সুর-লহরীর প্রশস্ত দর-দালানের দরজা সাধারণ মানুষের কাছে প্রসারিত ও উন্মুক্ত। বাউল গানের অধ্যাত্ম-চেতনা ও ধর্মবোধের সদা সতর্ক প্রহরীকে তাই অসম্মান না করে জনতার হৃদয় বাউল গানের সুর ও নৃত্যে লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।

সেইজন্য পল্লীমানুষের কাছে বাউল গানের আবেদন অপরিসীম। এই আবেদন যুগবাহিত ও কালের দ্বারা পরীক্ষিত। আমাদের মনে হয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে মেলা ও উৎসবের চিরন্তন সম্পদ বাউল গানগুলি পল্লী-মায়ের স্নিগ্ধ শীতল কোলে লালিত পালিত হয়ে লোকজীবনের সঙ্গে অভিন্ন হৃদয়ে আজও বেঁচে আছে। বাউল গান তাই লোকসাহিত্য রূপে অভিহিত হল কিনা সেই বিতর্কে না গিয়ে সাক্ষাৎ মেলা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি বিশিষ্ট বাউল গান এখানে নিবেদন করলাম। ভাবে ও ভাষায় এই বাউল গানগুলি লোকসাহিত্য কিনা সে আলোচনার প্রকৃত অবকাশ এখানে আছে।

গীতসংখ্যা ১

"দেইখ্যা আইগা চিত্তরঞ্জন
আজব কারখানা—
সেথা যাবি রে তুই সঙ্গোপনে,
যেন আনজনা কেউ জানে না ॥
সেথায় ব্যাপার অতি চমৎকার,
চারদিকে তার বেড়া তবু আছে
ঊনআশি কোটি দ্বার—
প্রধান নয়টি দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে,
অতি চতুর দশজনা ॥
... ...
... ...

সেথায় দিবানিশি আগুন জ্বলে,
আর অষ্টধাতু সদাগলে,
ভাইরে লোহা পিতল গলে যেন—
কামনা আর বাসনা ।।
গলিয়ে মন ছাঁচে ফেলে,
বাষ্প ইঞ্জিন নেয় যে তুলে,
তখন ললাটে দেন আলো জেবলে,—
দিয়ে ছোটে পবনা—
দেইখ্যা আইগা চিত্তরঞ্জন
আজব কারখানা ।।[৪০]

এই গানটি দেহতত্ত্বমূলক। চিত্তরঞ্জনের কল-কারখানাকে অবলম্বন করে শিল্পী গানের মধ্য দিয়ে দেহতত্ত্বের ভাবকে প্রচার করেছে জনসাধাণের কাছে। গানটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে গায়ক চিত্তরঞ্জনের রেলের এঞ্জিনের কারখানাকে মাধ্যম করে জয়দেবের মেলায় এসে এই গানটি গেয়েছে।

আর একটি বাউল গানের বিষয় হল রাধা-কৃষ্ণের প্রেম—

গীতসংখ্যা ২

"মনের কথা বলব কারে সই
(আমার) মনের কথা বলতে গেলে,
লোকের কাছে পাগল হই ।।

আর কালার বাঁশী শুনে কানে,
কত ব্যথা পাই গো প্রাণে—
আমার সুখ থাকে না ত্রিভুবনে,
আমি মন আগুনে দগ্ধ হই ।।[৪১]

কখনও আবার উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়েও মেলার আসরে বাউল গান শোনা যায়। জয়দেব কেন্দুবিল্বর মেলায় এই জাতীয় একটি বাউল গান শুনেছিলাম। এই গানের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্নভাবে প্রেমের কথা। গানটির উপাদান ও উপকরণ বাঙালীর সাধারণ জীবনের খাদ্যতালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। গানটির মধ্যে বাউল ধর্মের কোন গভীর তত্ত্ব বা দর্শন নেই। উপরন্তু গানটি পূর্ব থেকে বাঁধাও ছিল না। মেলার আসরে দাঁড়িয়ে শিল্পী ও তার প্রতিপক্ষ মুখে মুখে রচনা করে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রভাবিত করেছিল। সাধারণ লোকে এই গানটির প্রচ্ছন্ন অর্থটা বুঝুক বা না বুঝুক তাদের হৃদয়ে একটি আবেদন সৃষ্টি হয়েছিল এই গানের উত্তর

ও প্রত্যুত্তরে। জনসাধারণের ভেতর থেকে কোন কোন রসিক শ্রোতাও মুখে মুখে গানের দু-একটি কলি রচনা করেছিল।

গীতসংখ্যা ৩

ও পাড়ার কোন গতর খাওকি
আমার তুল্লি বুড় ঝিঙেটি,
ওরে পোস্ত দিয়ে রাঁধব বলে
দেখে শুনে রেখেছিলাম নাগরটি ॥
তুল্লি বুড় ঝিঙেটি।
ঝাড়ের ভিতর রেখেছিলাম
ধন্য তোদের চোখ দুটি
আবার না বলে যে তুল্লি ঝিঙে
ভাল মন্দ ভাবলি কি ?

উত্তর-

কাঁচা ঝিঙে রস নাই বলে
(হরি) বুড়ো ঝিঙে তুলেছি
(মন) বুড়ো দেখে তুলেছি

(ও-মন) পোস্তর মর্ম
যারা বুঝেছে
(হরি) বুড়ো দেখে তারা তুলেছে
লাভে মন হারায়েছে
(ওর) খোসা ছাড়া চুষেছি
কাঁচা ঝিঙে রস নাই বলে—
বুড়ো ঝিঙে তুলেছি ॥

রসিক শিল্পী-যুগলের মধ্যে এইভাবে গানের সুরে ও নৃত্যযোগে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে। কথা ও সুরের গমকে জনসাধারণ বিমোহিত হয়। ঝিঙে তোলার কারণ দর্শাতে গিয়ে শিল্পী বলে ওঠে ঃ

প্রতিবেশী বলেছিল
ছুঁড়ী, ঝিঙের জন্যে পাগল হল
কতক্ষণে রাঁধব অম্বল
মনে মনে জপেছি।
পোস্তবাটা বিলাতির সাথে
কিছু সরষেবাটা দেব তাতে
আমি শেষ কালেতে দেব চিনি
ও-সে ক্ষেপার কাছে শুনেছি

কত সাধে ঝিঙে ঠাকুর
অম্বল রেঁধেছি ।[৪২]

এই ঝিঙের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে জয়দেবের মেলায় আর একজন বাউলের মুখে একটি গান শুনেছিলাম ঃ

গীতসংখ্যা ৪

আমার ঝিঙাফুলে
নিল জাতি কুল
আমি না বুঝিয়ে কালার সনে
পাতায়েছি কুল
ঝিঙা ফুল···
প্রথম মিলন কালে
আকাশের চাঁদ হাতে দিলে
এখন ঘরের থেকে বাহির করে
পথের মাঝে ভুল
ঝিঙা ফুল···

বর্ণ ছিল চাঁপার কলি
ভেবে অঙ্গ হল কালি
এখন বসিলে উঠিতে নারি
হাতে ধরে তুল
ঝিঙা ফুল···
আমার একে ভাঙাতরী
তাই চেপেছেন বংশীধারী
এখন মাঝখানেতে যেয়ে তরী
ডুবালে দু কূল
ঝিঙা ফুল···[৪৩]

কৃষ্ণপ্রেমমূলক এই বাউল গানের মধ্যে সহজ-সরল ভাবটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণপ্রেমরূপী এই ঝিঙা ফুল আবার আর এক বাউল গানে 'কৃষ্ণ সর্পে' পরিণত। জয়দেবের মেলাতে অন্য বাউল তাই গেয়েছিল ঃ

গীতসংখ্যা ৫

কি সাপে কামড়াল রে সাপুড়িয়ে
জ্বলিয়া পুড়িয়া মলাম বিষে
তোমার বিষগুণে বিষ উঠেছে বিষ
ও বিষ জুড়াইব কি সে।

কালো বরণ সাপটি রে তার
মাথায় মাণিক জবলে
হাসনা হানা ফুলের গন্ধে
সাপ ছিল সেই ঝোপের আলে।
আমি আগে পাইনে দিশে—
বিজয় বলে সাপের খেলা
এড়ানো না যায়
বনের বাঘে খায়না তারে
মনের বাঘে খায়
এমন দংশিছে অনেক হৃদয়
বিষ চলে রক্ত নালে মিশে
ও বিষ জুড়াইব কি সে…[৪৪]

জয়দেবের মেলায় শোনা অন্য আরও একটি বাউলের গানে কৃষ্ণ প্রেমের রূপ প্রতিফলিত ঃ

গীতসংখ্যা ৬

আমি নন্দ ঘোষের বেটার সনে
কখন আমি হেসেছি
ভাইকে বলে মার খাওয়ালি
ওলো ঠাকুর-ঝি
গিয়েছিলাম নিধু বনে
শ্যামা মায়ের দরশনে
আমি কুসুম ফুলের মালা গেঁথে
শ্যামা মাকে পুজেছি।
বলগা গিয়ে ভায়ের কাছে
ভাই যেন তার দেখে আসে
আমার মা যদি মোর সহায় থাকে
তোরা বলে করবি কি।[৪৫]

বাউলদের প্রেম প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে সহজ সত্য অথবা পরম সত্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শাশ্বত আনন্দ গ্রহণকারী এবং আনন্দভোগিনী রূপে (eternal enjoyer and enjoyed)। যাঁরা হলেন কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। কৃষ্ণ সমস্ত পুরুষে পর্যবসিত এবং শ্রীরাধা সমস্ত নারীতে রূপান্তরিত। তাই আমাদের মনে হয় যে পুরুষ ও রমণীর যুগল প্রেমের মধ্য দিয়েই রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমানন্দকে আস্বাদ করা হয়েছে। যাকে বলা হয় আরোপিত প্রেম।

যেমন ঃ "... ... ...

যুগযুগান্ত অনন্ত কাল
হৃদয় বৃন্দাবনে
তোমাতে আমাতে সেই লীলানাথ
চলেছে সঙ্গোপনে..."[৪৬]

কিন্তু এই প্রেমকে উপলব্ধি করতে হলে রসিক হতে হবে। তাই জয়দেব-কেন্দুবিল্বের মেলায় এক বাউল গেয়েছে ঃ

গীতসংখ্যা ৭

রসিক নইলে প্রেমের মর্ম
জানবে কেমনে
আর ত্রিপুরারি প্রেম ভিখারী
বাস করেছে শ্মশানে।
বিল্বমঙ্গল প্রেম করে
গিয়েছিল চিন্তার ঘরে
ও যে অন্ধকারে মৃত ধরে
পার হয়ে ছিল ভর তুফানে...[৪৭]
... ...

আর একটি বাউল গানে দেখি বাউল শিল্পীর এক অভূতপূর্ব বেদনার প্রতিফলন। বাউল ধর্মের প্রতি উপেক্ষাজনিত কারণে বাউলের মন আজ ভারাক্রান্ত। জয়দেবের মেলায় এসে তাই বাউল গেয়েছে ঃ

গীতসংখ্যা ৮

বাউলের ধর্ম উঠে গেল এবার হতে
মানুষ ভুলে গেছে সুরেতে—
জগত মেতে গেল সুরে—
ক্ষেপা ক্ষেপী উঠে গেল এবার হতে।
রঙে রঙে মাতাচ্ছে তারা
শহর ও গাঁয়েতে।
রঙে চঙে বাউল যারা
সুরেতে মাতাচ্ছে তারা,
এবার শহর গাঁয়ে মাতিয়ে দিল—
(হায়) মন মেতে।...

আমরা গান গেয়ে আনন্দ পাই,
কত সাবেকী বাউল শোনে—
মানুষ ভুলে গেছে সুরেতে।[৪৮]

এখানে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বাউল শিল্পী কাদের প্রতি এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছে। মুখে সকলেই বাউলের নাম করলেও এর গূঢ় রহস্য কেউই জানতে চায় না। আজ যারা আধুনিকমনোভাবাপন্ন হয়ে সুরের চাকচিক্যে বাউল গানকে আধুনিক রুচিসম্মত করে পরিবেশন করছে, সাধারণ মানুষ শুধু সেই সুরের মোহেই আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সহজ সত্য এবং বাউলের ধর্মকে উপলব্ধি করতে চাইছে না।

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানয়ে কেবা..."[৪৯]

গৃহধর্মকে বাউলেরা বড়ো বলে মনে করে। কিন্তু এই কলিযুগে গৃহধর্ম যেন অবহেলিত। তাই জয়দেবের মেলাতে বাউলের মুখে শুনি—

গীতসংখ্যা ৯

দেখলাম ধন্য রে এই কলি কাল
কিসে গৃহধর্ম থাকবে বল্
অসময়ে অতিথি আসিলে দ্বারে
তারে যে খেতে না দেয় অন্ন জল।

ও সেই গোলক ছেড়ে গোলক পতি
পদ্মাবতীর রান্না ভাতে
খেয়েছিল নীলকমল
কি সে গৃহের ধর্ম থাকবে বল্[৫০]

চারিদিকে অনিয়ম, অধর্ম এবং মানবসেবার পরাঙ্মুখতা। প্রেম-ভালবাসা ও ভোগ সুখের প্রাচুর্যতাকে লক্ষ্য করে বাউল শিল্পীর হৃদয় এক বিচ্ছেদ বেদনার সুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তাই সে মেলায় এসে লোক সমাবেশে তার মনের দুঃখ জানায়। কারণ এই পৃথিবীর মানুষ সামান্য সুখের জন্যেই মরিয়া হয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়। জয়দেবের মেলায় এসে বাউল শিল্পী তাই গানের মধ্যে এক গভীর নীতিশিক্ষা প্রচার করছে ঃ

গীতসংখ্যা ১০

কেন মর চির দুঃখে
সামান্যের সুখে

ক্ষণেক মাত্র সেজে রাজা
অলীক মজা জনম সাজা
হলিরে তুই যমের ভেজা
গেলিরে ওই ঝুঁকে।
সামান্যেরি সুখে।
জলে দিয়ে জীবন ধন
করিছ কামের সাধন
এখন হল না তোর সচেতন
গেলিরে ওই ঝোঁকে।
কাজ কি তোর এ রাজপাটে
যাসনা যমুনার ঘাটে
রাখবি ভাব খেটে খুটে
চোখে মুখে বুকে
সামান্যেরি সুখে।
পারতো একবারই মর
বারে বারে কেন মর
তিলে তিলে কেন মরো—
দুর্যোধনের বিচার ধর
চল কপাল ঠুকে
সামান্যেরি সুখে।[৫১]

বিভিন্ন মেলা ও উৎসবের প্রসঙ্গ ও পরিচয় তুলে ধরার সময় আমরা সেই-সব উৎসবানুষ্ঠানের ছড়া ও গানের কথাও কিছু উল্লেখ করেছি। মেলা ও উৎসব-নির্ভর সেই ছড়া ও গানগুলি হল ঐ সব উৎসবানুষ্ঠানের লোক-সাহিত্য। এইসব ছড়া ও গানের সঙ্গে মেলা ও উৎসবের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বর্ষার আগমনে যেমন কদম ফুল ফুটে ওঠে তেমনই মেলা ও উৎসবের আগমনে অনুষ্ঠানভিত্তিক সেইসব ছড়া ও গানগুলি বারিধারার মত পল্লী-বাংলার আনন্দে মুখরিত মানুষের উৎসব-আঙিনাকে অভিষিক্ত করে তোলে। লোককবিরা উৎসবের প্রাক্কালে গান বাঁধে। ছড়া রচনা করে। মেলা ও উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠান-নির্ভর সেইসব লোকসাহিত্য গীত ও প্রচারিত হয়। মেলা ও উৎসবের সঙ্গে এই শ্রেণীর লোকসাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কটি তাই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ বিভিন্ন মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে যেসকল কথা, কাহিনী ও কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকেও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করা যায় কিনা সে কথাও ভেবে দেখার অবকাশ আছে। টুসু, ভাদু, করম প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসবের নেপথ্যে লোক-কাহিনীগুলি পল্লী জনমানসে আজও বেঁচে আছে। মেলা ও উৎসবের স্পর্শে সেইসব কথা ও কাহিনীগুলি যেন রাজকন্যার মত নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে।

সেইসব লোককাহিনীকে নিয়ে পল্লীকবিরা গান বাঁধে। বহু বিচিত্র ছড়া ও চমকপ্রদ গানগুলি পল্লীর লোকচিত্তকে রূপে ও রসে আপ্লুত করে তোলে। এইসব গাথা ও কাহিনী এবং ছড়া ও গানের অন্তরালে পল্লীর নর-নারীর কতো আনন্দ ও বেদনা মর্মরিত হয়। তাই সেই উৎসব-নির্ভর গান ও ছড়াগুলি অমৃত-যন্ত্রণায়পূর্ণ চলমান পল্লীজীবনের যেন এক একটি বিষামৃত পূর্ণ কুম্ভ।

বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানভিত্তিক আরও কিছু লোকসাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও পরিচয় এখানে তাই তুলে ধরা হয়েছে। ইতিপূর্বে উৎসব ও মেলার পরিচয় দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্যের কিছু পরিচয় দেওয়া হলেও এখানে ধারাবাহিকভাবে সেইসব উৎসবানুষ্ঠানের আরও কিছু ছড়া ও গানের উল্লেখ করা হল।

১।। গম্ভীরা ও গাজনের গান

গম্ভীরা ও গাজনোৎসব উপলক্ষে গম্ভীরা ও গাজনের গান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে নীলপূজা বা নীলের গাজন আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত। গম্ভীরা গানে শিবের বিষয় ছাড়াও স্থান পায় সমসাময়িক ও নানা লৌকিক প্রসঙ্গ। গম্ভীরা গানে শিবের চাষের প্রসঙ্গটা যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেকথা আগেই বলা হয়েছে। মালদহ জেলায় অনুষ্ঠিত গাজনোৎসবের একটা ছড়া ঃ—

“বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস ॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচ্‌নীপাড়া।
কুচ্‌নীপাড়া হইতে দিয়ে এল সাড়া
কার্পাস তুলিয়া দিল গঙ্গার ঠাঁই
গঙ্গা বুনিল সূতা মহাদেব বুনিল তাঁত।...”[৫২]

অথবা

“ও রে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ
খুব ভালই জান...”[৫৩]

ধর্মের গাজন উপলক্ষেও কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন আচারঅনুষ্ঠান পালিত হয়। এ ব্যাপারেও সেই অনুষ্ঠানে ধর্ম ঠাকুরকে কৃষকরূপে কল্পনা করে তাঁর কৃষিকার্য সম্পর্কিত ছড়া ও গান পাঠ বা গান করা হয়। এইসব উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যে আদিম কৃষিজীবি সমাজের ভাবনা প্রতিফলিত। সেই প্রতিফলনকে বহন করে নিয়ে আসে এই জাতীয় উৎসবানুষ্ঠান। ছড়া ও গানে বেঁচে থাকে সেই আদিম কৃষিজীবি সমাজের ধ্যান-ধারণা। তাই উৎসব-অনুষ্ঠান যদি হারিয়ে যায় তাহলে এই ছড়া ও গানকেও খুঁজে পাব না। কারণ গাজন-গম্ভীরা-নীল

প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে এগুলি সাধারণের মাঝখানে প্রচারিত হয়। শাস্ত্র ও পুরাণের শিব গাজন-গম্ভীরার গানে লৌকিক শিবঠাকুরে পর্যবসিত। গাজন-গম্ভীরা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লোককবি শিবকে পল্লীগ্রামের পটভূমিকায় আপন প্রতিবেশীরূপে কল্পনা করে নিয়ে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। শিবের কাছে দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা তুলে ধরাও হয়েছে। ভোটের সমস্যা নিয়ে শিবের কাছে আবার নালিশও জানানো হয়—

"এবার আবার শুনছি শিব
বাবুরা সব ভোট চাইবে
ভোটের লায়ে চইঢ়্যা এরা লাটসাহেবের সভায় যাবে।
হামাদের কাছে ভোট লিয়া
ভাত-ময়না সব সাজবে টিয়া
দ্যাশের কাজে ফাঁকি দিয়া
টাকার তোড়া মারবে সবে।"[৫৪]

একবার মালদহের ইংরেজ বাজারে বাঁদরের উৎপাত হয়। লোকে বাঁদরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেই বছর গম্ভীরানুষ্ঠানে শিবের কাছে অভিযোগ পেশ করা হল বাঁদরের উৎপাত সম্পর্কে ঃ

"এ ভোলানাথ কি হবে উপায়
ঘরে ঢুইক্যা হাঁড়ির ভাত খায়
ছাতের উপর বেড়ায় শালা
নিশিদিন দুপুরে, ভাইরে,
লেইছ্যা পুইছ্যা খাচ্ছে শালা
কেয়ার করেনা কাউরে

বুদ্ধিশক্তি ধরে শালা, মানুষের ঠিক মত
অনুকরণে ঠিক প্রবৃত্ত,
যেন ব্রহ্মার পোষ্যপুত্র রে
এ ভোলানাথ কি হবে উপায়।"[৫৫]

এইভাবে গাছে গাছে আম না হলে, দেশে শিলাবৃষ্টি হলে অথবা দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিলে লোককবি শিবের কাছে সবকিছু অকপটে প্রকাশ করে গানের মাধ্যমে। তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় যে গম্ভীরানুষ্ঠানকে মাধ্যম করে লোককবি জনসমক্ষে সমাজের কথা, দেশের সমসাময়িক ঘটনার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করে। উৎসব এখানে একটা বড়ো মাধ্যমের (media) কাজ করে চলেছে। যার দ্বারা এই জাতীয় লোকসঙ্গীত সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে আসছে সুদূর অতীতকাল থেকে। দেশের সমসাময়িক ঘটনা কিংবা কোন সমস্যা সম্পর্কে সকলকে সচেতন ও অবহিত করে তোলা হচ্ছে এই

(ও) তাতে নারদ করে আনাগোনা,
কৈলাসে বিয়ের ঘটনা
বাজে কাঁসি বাঁশি, মোহন বাঁশরি।

এরপর আসে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গ—

শিব চইলাছে বিয়া করতে
বাজেরে ঢোল ডগর কাঁড়া
(ও) তার সঙ্গে চলে দৈত্যসেনা
আরো আছে দেবসেনা।
গলায় আছে সাপের মালা
দেখলে ডরায় লোক।
এমন জামাই দেখিয়া সবে কানাকানি করে,
(ও) সে শ্মশানে মশানে ঘোরে
আইছে একটি দামড়ায় চইড়ে
হাইটা আইলে যাইত বুড়া মইরে
(তখন) নারদ মুনি রেগে কয়
এ যে দেবের দেব মৃত্যুঞ্জয়
শমনকে করে পরাজয়।

শিবের বিবাহের পালা শেষ হলে, শুরু হয় শিব-দুর্গার গার্হস্থ্য জীবনের কথা। গার্হস্থ্য জীবনে একদিন শাঁখা পরার বায়না ধরেন দুর্গা। দুর্গা শিবকে ডেকে বলেন ঃ

"... ... ...
শঙ্খ পরিতে বড় সাধ যায় মনে,
(তখন) কহিলা শূলপানি,
খাদ্য আমার ভাঙের নাড়ু
বাহন আমার বুড়া গরু
টাকা পয়সা কোথায় বল পাই ?
শঙ্খ যদি পরতে চাও
বাপের বাড়ি চইলা যাও,
শঙ্খ দেওয়া আমার সাধ্য নয়···
... ...
ক্রুদ্ধ হইলেন মা ভবানী
এক লম্ফে চাড়িলা সিংহের পর
দেবী চইললা গিরিপুরে
(তখন) নারদ মুনি যুক্তি করে
(বলে) মামা শঙ্খ রাখ তোমার ঘরে,
শাঁখারী সাজিয়া শীঘ্র দেহ দরশন।

... ...”৬০

এইভাবে শিব তখন শাঁখারীর বেশ ধারণ করে পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে দেন। সব কলহের অবসান ঘটে। আমাদের মনে হয় নীল পুজার উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে লোককবিরা শিব-দুর্গা বিষয়ক গান রচনা করে পল্লীর সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাত্রার এক অনাবিল ছবিকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

২। ভাদু উৎসবের ছড়া ও গান

ভাদু বাংলার এক জনপ্রিয় আঞ্চলিক গীতোৎসব। ভাদু অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করে এসেছি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল গান ও ছড়া গীত হয়, এখানে আমরা তার কিছু নমুনা দেব। মানভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের মেয়েরা ভাদুগান গেয়ে এই অনুষ্ঠান পালন করে। ভাদুর মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখ ও জ্বালা যন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। তাই লোকসঙ্গীত হিসেবে ভাদুগানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভাদুগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবীয় রস। তাই এই আঞ্চলিক সঙ্গীত সর্বজন সম্পদ হয়ে ওঠে এবং সকলের কাছে তা অতি সহজেই সমাদৃত হয়। ভাদুগান গ্রামজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। পল্লীবাসীর পারিবারিক জীবনই ভাদুগানের প্রধান উপজীব্য বিষয়। যদিও এই গানের ভাবে ও ভাষায় এবং সুরের মধ্যে গ্রাম্যতা দোষ আছে তবু ভাদুগানের অন্তরালে রয়েছে করুণ হৃদয়ের মূর্ছনা। ভাদু উৎসবের পেছনে যে কাহিনী আছে ইতিপূর্বে ভাদু উৎসবানুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে সেই কাহিনীটা আমরা বিবৃত করেছি। ভাদুকে নিয়ে দু-দলের মধ্যে গানের সুরে বাদ-প্রতিবাদ চলে ভাদু অনুষ্ঠানে। যেমন ঃ

> “ও পড়াতে দেখে এলাম চিপ্‌সে ভাদু গড়েছে।
> নড়ে না চড়ে না ভাদু সান্নিপাতে ধরেছে।
> আমার ভাদুর স্বর্গশোভা লো, তোদের পাতাল ভুবনে।
> সত্য মিথ্যা দেখনা চেয়ে, চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে॥”[৬১]

অবিবাহিতা মেয়েরা ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে ভাদ্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রাত্রে ভাদু গান করে। তাদের সামনে একটা মৃৎ প্রতিমা গড়া থাকে। এই মৃৎ প্রতিমা যেন এক পল্লীবালা। আগমনী থেকে শুরু করে বিসর্জন পর্যন্ত সেই পল্লীবালার গানগুলো বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেও গাওয়া হয়। পল্লীবালার বিবাহ, বিবাহের পরে পতিগৃহে যাত্রা, পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আগমন এবং অবশেষে ভাদু-বিদায়।

ভাদু প্রবাসজীবন থেকে পিতৃগৃহে এসেছে। তাই ভাদুর কুশল জিজ্ঞাসা করে গান গাওয়া হচ্ছে—

"ওগো, ভাদুমণি, শুন বলি তুমি,
কেমন করে এলে পথে কোন কষ্ট হ'ল কি।
এস বোস আসনে আগে কুশল বল শুনি,
তার পরেতে মুখ হাত ধুয়ে
তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে—
সাজাগুজা করবে চল এখনি...।"[৬২]

ভাদুর বিবাহ প্রসঙ্গ আরও চিত্তাকর্ষক—

"সাধের ভাদুর বিয়ে।
পাড়া গিয়ে ডেকে আন ন'জন মেয়ে,
সাধের ভাদুর বিয়ে।
চিক পেড়্যে বোম্বাই শাড়ী-লো এঁটে পরলো কোমরে,
পথে যেতে রোদের আভায় যেন লো ঝলমল করে।"[৬৩]

একটি আঞ্চলিক উৎসবকে কেন্দ্র করে এমনি করে পল্লী মানুষের ঘরোয়া জীবনের দৈনন্দিন ছবিগুলি গানে ও সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের মৃৎ প্রতিমা গানে ও ছড়ায় জীবন্ত প্রতিমায় পর্যবসিত হয়। ভাদু উৎসবের মাধ্যমেই পল্লীরমণীদের পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখ প্রকাশিত হয় গানে ও সুরের মূর্ছনায়। লোককবি সমাজ ও পরিবারের সুখ-দুঃখ ও জীবনযন্ত্রণার অনুভূতিকে প্রকাশ করার একটা মাধ্যম খোঁজে। সেই মাধ্যমের দ্বারাই কবি প্রকাশ করে তার মনের ভাবনা-চিন্তাকে। উৎসবের ভেতর দিয়ে সেই ভাবনা-সমৃদ্ধ গানগুলি গীত ও প্রচারিত হয়। ভাদু উৎসবের নেপথ্যে নীলমণি সিংহের যে কাহিনী প্রচলিত আছে তার মূল্য এখানে নিতান্ত নগণ্য। এখানে পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও সামাজিক জীবনটাই বড়ো। ভাদ্রের ভরাবর্ষায় ভাদুকে কেন্দ্র করে গ্রামের মেয়েদের জীবনের হাসি-কান্না এবং সুখ-দুঃখের কলরব তাই ভাদু-লোকসঙ্গীতের মধ্যে মুখর হয়ে ওঠে। ভাদু বিসর্জনের করুণ গান উমা-বিজয়ার বেদনাকে আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ভাদ্র মাসের শেষ দিন মেয়েরা তাদের পূজা করা ভাদু মূর্তিগুলি বহন করে নিয়ে যায় নিকটবর্তী নদী অথবা পুষ্করিণীতে। তারা গান গায়—

"প্রাণে ধৈর্য ধ'রে
প্রাণের ভাদু বিদায় দিই কেমন করে।।
সারা বছর কেঁদে কেঁদে গো, পেয়েছি বছর পরে।
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিষম বিপদ সাগরে...।।"[৬৪]

মাঠে আউশ ধান ফুরিয়ে আসে ভাদ্র সংক্রান্তির সাথে সাথে। আর সেই সময়ে ভাদুরাণীও উৎসবের শেষে বিদায় নেয়। ভাদু বন্দনার জন্যে আবার প্রতীক্ষা। আবার একটা বছর। প্রতীক্ষা মাঠের আউশ ধানের জন্যেও। তাই নারীর সমস্ত হৃদয় জুড়ে ভাদু-বিচ্ছেদের বেদনা বিভিন্ন গানে ও ছড়ায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

৩। টুসু উৎসবের ছড়া ও গান

টুসু উৎসবকে উপলক্ষ করে টুসু লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় মানভূম, মেদিনীপুর বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া অঞ্চলে। তাই লোকসাহিত্য হিসেবে টুসু গান ভাদুগানের মতই জনপ্রিয়। টুসু সঙ্গীতের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় পল্লীর সাধারণ মানুষের জীবন ও সমাজ। মানভূমে টুসু উৎসবের নেপথ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। যে কাহিনীতে কুর্মী সমাজের অন্তর্ভুক্ত রুক্মিণীর সঙ্গে কুর্মীসমাজের এক যুবকের পুনর্মিলনের কথা বলা হয়েছে। ভাদুরাণীর মত টুসুও গৃহস্থের পরিবারভুক্ত এক পল্লীবালা। সেই টুসুকে কেন্দ্র করে গ্রামের মেয়েরা উৎসবে মেতে ওঠে। অঘ্রাণের শেষ দিন থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত। অঘ্রাণ-পৌষ মাসে যখন ধান পেকে ওঠে, তখন মেদিনীপুর অঞ্চলে মাহাতো, মুণ্ডা, কোরা, লোধা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা দৈনন্দিন জীবনেব সব দুঃখ কষ্ট ভুলে এই সময় আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন মানভূমের ভাদু মূর্তির অনুকরণেই টুসু মূর্তির প্রচলন হয়েছে। এই টুসুর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লোককবি বলছেন ঃ

"আদাড়ে বাদাড়ে পদ্ম
পদ্ম বই আর ফুটে নাই
হামদের টুসুর গায়ে পদ্ম গো
ভমর বৈ আর বৈসে নাই"[৬৫]

টুসুকে নিয়ে মেয়েরা গঙ্গাস্নানেও যায়। স্নানের পর হয় টুসুর প্রতিষ্ঠা। সে কথাও টুসুর গানে পাই—

"টুসালু গো রাই, আমরা গাঙ্গ সিনানে যাই
গাঙ্গের জলে রাধি-বাড়ি
মকরের জল খাই।
চাইর মাস বরিষা, পাথারে না যাই
আদাচিটা গুড়ের পিঠা,
তাই দিয়ে খাও টুসালো, ছবরী ধানের পিঠা।
ছবরী না ডবরি, আর তিল ছাঁই
বাটি কইরে বাড়াই দিব
খাও টুসালো মাই ॥"[৬৬]

টুসু উৎসবে মন্ত্রের পরিবর্তে গান গাওয়ার রীতিটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মেয়েরা গানে গানে টুসুকে বরণ করে অভিবাদন জানায় এবং মন্ত্রের পরিবর্তে এই গানের মাধ্যমে টুসুকে পূজা করে। তারপর সবশেষে ভাদুর মত টুসুকেও বিসর্জন দেয়। ধলভূম ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে টুসু উৎসবে টুসুর মূর্তি গড়ে পূজা ও উৎসবের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়।

টুসুকে খাওয়ানোর কথা একটি গানে পাই—

"আদা চিটা গুড়ের মিঠা
তাদিয়ে দিয়ে খা টুসালুর মাই গো
ছ-বড়ি লাড়ুর পিঠা
ছ-বড়ি লাড়ু, দুধের লাড়ু আর গ'টা চার
কাটা ভরতি ঘি গুড় দিব খা, টুসালুর মাই গো
খা টুসালুর মা..."[৬৭]

টুসু উৎসবানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে 'মৃৎ-প্রতিমা টুসু'কে ঘিরে সাধারণ গৃহস্থ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যা ও জ্বালা-যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটে এইসব ছড়া ও গানে। তাই ভাদুর মত গানের মধ্য দিয়ে টুসুরাণী মূর্ত হয়ে ওঠে মানবীরূপে। টুসু গানের ভেতর দিয়ে গৃহস্থ বধূর রূপ-সৌন্দর্য, গার্হস্থ্য চিত্র এমন কি নিঃসঙ্গ নারী মনের করুণ ও মর্মস্পর্শী রূপটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে যা উচ্চ কল্পনাশক্তির দাবী করে ঃ

"একলা ঘরে টুসুর মন কেমন করে
যেন শোল মাছে উফাল মারে।"[৬৮]

'মন কেমন করা'র সঙ্গে শোল মাছের 'উফাল মারে'—উপমার প্রয়োগটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পতিগৃহে পল্লীবধূর জ্বালা-যন্ত্রণার ছবিটাও টুসু গানে মর্মরিত। অনেক সময় দেখা যায় পতিগৃহে বধূর ওপর শাশুড়ীর নির্মম অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন অসহায়া বধূ পিতৃগৃহে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে। তার মনে সততই মাতৃস্নেহের কথাই মনে পড়ে। বধূ জীবনের এই দিকটি বড়ই করুণ ও যন্ত্রণাদায়ক ঃ

"ই চালে পুঁই, উ চালে পুঁই
পুঁইয়ের খাব মেচুরি,
আর যাব না শ্বশুরবাড়ী ধইরে মারে শাশুড়ী"[৬৯]

অথবা—

"পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে,
আমার মন কাঁদে শ্বশুর ঘরে
পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে।"[৭০]

এখানে 'পোস্ত'-এর সঙ্গে গোল-আলুর উপমাটা লক্ষ্য করার মত। 'পোস্ত'-এর সঙ্গে গোল-আলুকে যেন বেশি মানায়। পতিগৃহে নিগৃহীতা বধূ তার মায়ের কোলেই ফিরে যেতে চায়। কারণ পতিগৃহে বধূ হয়ত নিজেকে মানাতে বা খাপ খাওয়াতে পারছে না। তাই মায়ের ঘরেই তাকে বেশি মানায়।

টুসু গান এক শ্রেণীর আঞ্চলিক সঙ্গীত সন্দেহ নেই। এই গান শিক্ষা-সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এই গান এক মুখ থেকে অন্য মুখে দ্রুত প্রচারিত হয়।

এমন কি টুসু উৎসবের মাধ্যমে এই গান একাধিক কণ্ঠে অনায়াসে ধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে। সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের ব্যথা-বেদনা একক কবির সৃষ্টি হলেও, সেই সৃষ্টি সমষ্টির হৃদয়ে দর্পণের মত প্রতিফলিত হয়। পল্লী-সমাজ ও সাধারণ জীবনের সঙ্গে টুসু ও ভাদু গানের একটি গভীর সংযোগ আছে। কারণ পল্লীচিত্রই এইসব গানের প্রধান উপাদান ও উপকরণ। ভাবে ও ভাষায় এবং সুরের মধ্যে গ্রাম্যতা দোষ আছে সন্দেহ নেই এবং সূক্ষ্ম কবিত্ব-বোধও এখানে অনুপস্থিত। বৈচিত্র্যহীনতা গানগুলির মধ্যে প্রকাশ পেলেও এই গানের প্রকাশভঙ্গি সহজ ও স্বাভাবিক। অকপট স্বীকারোক্তি, অকৃত্রিমতা, শিশুসুলভ সারল্য এবং স্বচ্ছন্দ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য ভাব ও ভাষা প্রয়োগ টুসু ও ভাদু গানে এনেছে শিল্পের এক চমৎকারিত্ব।

টুসু গানে শ্রেণী বৈষাম্যের ছবিও পাওয়া যায়। গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষ শোষিত হয় আর এক শ্রেণীর দ্বারা। সেই শ্রেণীরা হল ধনী, বিত্তশালী এবং জমির মালিক। সেই মালিক-শ্রেণী বা বাবু-প্রথার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভের পরিচয় টুসু গানের মধ্যেও পাওয়া যায়—

"ছোট বাবুর আঁচিল পাঁচিল
সেজবাবুর কাঁথভাঙা
বড়বাবুর ফুলের বাগান গো
হাওয়া খেতে গাছতলা।"[৭১]

মাঠে ফসল হোক বা না হোক খাজনাটি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতেই হবে। সর্বস্বান্ত হয়েও এই খাজনা দিতেই হয়। এই হল গরীব কৃষকের জীবন-কাহিনী। টুসুর গানে এই বেদনা মুখরিত—

"পৌষমাস পড়ল টুসু
রাজায় মাগে খাজনা
গায়ের গহনা বিক টুসু
বুঝাও রাজার খাজনা।"[৭২]

খাজনা আদায়কারীর অত্যাচারের কথা আর একটা গানে পাই—

"নদীর ধারে ছোলা বুনলাম
ছোলা হল এক গলা,
তশীলদারের সাদা ঘোড়া
প্রাচীর ভেঙে খায় ছোলা।"[৭৩]

পল্লীসমাজে দরিদ্র মানুষেরা বিশেষ করে পল্লী রমণীরা অভাবের তাড়নায় সংসারের কাজ থেকে সরে এসে ক্ষেতে ও কামিনের কাজ করে। ভোরবেলা তারা তাদের ঘর-সংসারকে পেছনে ফেলে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে কাজের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। শুধু একটুখানি ভরসা যে সন্ধ্যাবেলায় বড়বাবুর গাড়ি

তাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে। এই চিত্রটা কত করুণ। লোককবি বাস্তবসম্মত উপায়ে টুসু গানে তাকে ফুটিয়ে তুলেছে নিখুঁতভাবে ঃ

"আমার টুসু হাল জুড়েছে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু,
বেছে বেছে কামিন করেছে
দাঁত কাল কাঁকাল সরু।
কামিন করলি ভাল করলি
খাটাবি তুই রগড়ে
সন্ধ্যাবেলা লিয়ে যাবেরে
বড়বাবুর গাড়ী-এ"[৭৪]

কখনও আবার টুসুর গানে রঙ্গব্যঙ্গের পরিচয়ও থাকে। যেমন ঃ

"বাবুর পুকুরে লাইতে গেলাম
পনামাছে পিক্ মারে
আর মারনা ভাবের পনা
আমার সাথে লোক আছে—"[৭৫]

অথবা—

"শাল পাতা তুলতে গেলি
পলাশ পাতের গাদি গো
বাতাস-ছোকরায় লুটে লিল
গলার মাদলি গো।
দে রে দে রে গলার মাদলি রে
ঘরকে গেলে খাতি দিব
বালির ভাজা চিড়া রে—"[৭৬]

এখানে 'বাতাস'কে 'ছোক্‌রা'র সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে। চটুল লঘু বাতাসের দুষ্টুমিকে এখানে লোককবি একটা দুরন্ত ছোকরার দুষ্টুমির সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুরন্ত বাতাসের কাছে নায়িকা তার উড়ে যাওয়া গলার মাদুলি ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। কি অকৃত্রিম ও অনবদ্য সাহিত্যগুণ প্রকাশিত এই টুসু গানে।

টুসু উৎসবের শেষে টুসুর বিদায়ের পালা। এই বিদায় প্রসঙ্গ যেমন করুণ তেমনি মর্মস্পর্শী। টুসু বিসর্জনের পূর্বরাত্রে মেয়েরা টুসু জাগরণ গান গায়। শাঁখা, সিন্দুর, আলতা পরিয়ে টুসুকে বিদায় জানানো হয়। টুসুর বিদায় দৃশ্য কোন গৃহস্থ বধূর মৃত্যুর মতই করুণ ও মর্মান্তিক ঃ

"শাগ তুইলাম লতা পতা
বাড়ীর শিমউল তলে গো
কি শাপে ঢংশিল টুসু—
না জানি মন্তর গো,

শ্বশুর ভাশুর কাঁদে
দুয়ারে বসিয়ে গো
কোলের পুরুষ কাঁদে
ধুলাতে লটাইয়ে
শ্বশুরে ভাশুরে বলে
চন্দন কাঠে পোড়াব
আপন পুরুষে বলে
অগম দরিয়ায় ভাসাব।"[৭৭]

গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের ছবিগুলি যেন মনের অতল তলে জমা হয়ে থাকে। গানের কবি গ্রামীণ সমাজের ও প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহী সেই ছবিগুলিকেই টুসু গানে ফুটিয়ে তোলে। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যথা-বেদনার সফল প্রতিফলনে টুসু উৎসবানুষ্ঠান তাই জীবনের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হয়। সেই জন্যে টুসু বা ভাদু শুধু মৃৎ প্রতিমা নয়, সাধারণ মানব জীবনের এক প্রতিমূর্তি। বস্তুত টুসু বা ভাদু কোন দেবী নয়, তারা পল্লীর সাধারণ সমাজের মানব-কন্যা। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-গ্লানি ও আনন্দানুভূতির প্রকাশের স্থল হল টুসু ও ভাদু উৎসব। লোককবির গানে ও ছড়ায় পল্লীজীবনের সেই মর্মর ধ্বনি আজও শোনা যায়। তাই এইসব গানের মূল শিকড় পল্লীজীবনের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

ব্রতানুষ্ঠানের ছড়া ও গান

বাংলার ব্রতানুষ্ঠান বাঙালীর নারীসমাজে প্রচলিত থাকলেও ব্রতের কথা, গান ও ছড়ার মধ্যে পার্থিব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনা বড়ো হয়ে উঠেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ব্রতকথা ধর্মীয় উদ্দেশ্যমূলক হলেও এইসব কথা ও গান মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ। ইতিপূর্বে আমরা বাংলার ব্রত উৎসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানের ছড়া ও গানের উল্লেখ করা হল—যেগুলি লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। ব্রত উৎসবের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত কোন কোন ছড়া ও গান লোকসাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ পুনরায় এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

১। বসুধারা ব্রতের ছড়া ও গান

উত্তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে বৃষ্টির কামনায় মেয়েরা বসুধারা ব্রতের গান করে। বৃষ্টির জন্য অধীর প্রতীক্ষা ব্রতের ছড়ায় প্রতিফলিত হয়।

"ভাঁজো লো কল কলানী, মাটির লো সরা
ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পঞ্চ ফুলের মালা—

এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘী
বছরান্তে একবার ভাঁজো নাচবো না তো কি ?[৭৮]

২। তোষলা ব্রতের ছড়া

তোষলা ব্রতের ছড়ার মধ্যেও ব্রতীর কামনা ঃ

"গাঙের ভিতর লাড়ুকলা ডবডবাতে খাই,
তুষলী গো রাঙ্গি, তুষলী গো ভাই,
তোমার ব্রতে কিবা পাই ?
ছ বুড়ি ছ গণ্ডা গুলি খাই,
তোমাকে নিয়ে জলে যাই,
তুষ-তুষলী গেল ভেসে বাপ-মার ধন এল হেসে
তুষ-তুষলী গেল ভেসে আমার সোয়ামির ধন এল হেসে"[৭৯]

৩। ভাদুলী ব্রতের ছড়া

বর্ষার পরে বিদেশ থেকে জল ও স্থল পথে আপন জনের নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তনের কামনায় এই ব্রতানুষ্ঠান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ভাদুলী ব্রত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্ষা-প্রকৃতি দেশকে জল প্লাবিত করে বিদায় নেয়, তারপর আসে মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্নিগ্ধ শরৎকাল। ভাদুলী ব্রতানুষ্ঠান যেন শরৎ আবাহনের এক উৎসব। এখানেও মানুষের মনের কামনা নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে ছড়ায় ও গানে স্পন্দিত। বর্ষার জলে টইটুম্বুর ভাদ্রমাসের ভরা নদী। মেয়েরা জল তুলে আনার গানে তাই মুখরিত হয় ঃ

"এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ
এ নদী সে নদী একখানে সুখ
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ……

ভাদুলীর কাছে এই হল নারীমনের সহজাত কামনা। এ ছাড়া এই ছড়ার মধ্যে আছে বাপ ও ভাইয়ের বাণিজ্য থেকে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্যে ভাদুলীর কাছে এক সকরুণ আবেদন ও অশ্রুভেজা প্রার্থনা ঃ

কাগারে ! বগারে। কার কপালে খাও ?
আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে কোথায় দেখলে নাও ?
ভেলা ! ভেলা ! সমুদ্রে থেকো
আমার বাপ ভাইকে মনে রেখো…

পূর্বে মানুষেরা জলপথে বাণিজ্য করতে গিয়ে নানা বিপদের সম্মুখীন হত। অথচ জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষকে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও

বাণিজ্যের পথে যেতে হত। এই বিপদের মধ্যে প্রধান ছিল জল-ভয় এবং হিংস্র জীবজন্তুর ভয়। তাই ব্রতীরা হিংস্র জীবজন্তুর উদ্দেশ্যে বলে ঃ

বনের বাঘ ! বনের মোষ
তোমরা নিও না আমার বাপ ভায়ের দোষ
বাপ তাই গেছেন কোন্ ব্রজে ?
সোয়ামী শ্বশুর গেছেন কোন্ ব্রজে ?

রমণীদের এই ছড়ার মধ্যে সমাজ ও সমষ্টির কল্যাণ চিন্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য যদি বিঘ্নিত হয়, প্রত্যাবর্তন যদি কোন কারণে বিলম্বিত হয়, তাহলে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ নানা ভাবে বিপর্যস্ত হবে। ব্রতীরা তাই এই জাতীয় ব্রতানুষ্ঠান পালন করে। তারা ছড়া কাটে ও গান গায় ঃ

এ গলুয়ে ও গলুয়ে চন্দন দিলাম
বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম।
এ গলুয়ে ও গলুয়ে সিন্দুর দিলাম,
বাপ ভায়ের দর্শন পেলাম…[৮০]

৪। মাঘ-মণ্ডল ব্রতের গান

মাঘ-মণ্ডল ব্রতানুষ্ঠান পৌষ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে মাঘ সংক্রান্তিতে শেষ হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য মাঘ-মণ্ডল ব্রতের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন যে—কুমারী মেয়েরা নিজেরাই এই ব্রতের গান গেয়ে থাকে। কথায় আছে 'মাঘের শীত বাঘের গায়ে।' তাই সূর্যের অভ্যুদয়কে কামনা করে ব্রতিনীরা মাঘ-মণ্ডল ব্রতানুষ্ঠান করে। এখানেও সেই কামনা। শীতের কুয়াশা ভাঙা সূর্য এবং বসন্তের আগমন বার্তাকে ত্বরান্বিত করার এক প্রয়াস দেখা যায় মাঘ-মণ্ডল ব্রতের গানে। শীতের প্রকৃতিকে পরাভূত করে সূর্যের আবির্ভাব-কামনা এবং কল্পনায় বসন্তের অভ্যুদয়কে ভেবে ব্রতীরা গান করে। মনে হয় এ যেন প্রকৃতির উপর মনস্কামনার আধিপত্য বিস্তারের এক দুর্নিবার প্রচেষ্টা।

ব্রতকামীর কামনায় প্রবল শীতের কুয়াশার প্রতিরোধ দুর্গকে ভেঙে সূর্যকে ডেকে আনার এক অদম্য ইচ্ছেটা ব্রতের ছড়ায় রূপ পেয়েছে। বেত্রলতা হাতে নিয়ে মেয়েরা ছড়া কাটে ঃ

"কুয়া ভাঙ্গুম কুয়া ভাঙ্গুম বেতলার আগে
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে।
ওরে রে বরই গাছ, ঝুল্লন দে।
দে দে বরই য়ে, ঝুল্লন দে !…
… … … …

তারপর—

উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
… … … …

সূর্যের কথাটি আর একজন ব্রতী বলে দেয় ঃ

না উঠিতে পারি আমি ইয়লের (শিশির) লাগিয়া।

মাঘ-মণ্ডল ব্রতের কথা বিস্তারিতভাবে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের ছড়ার মধ্যে যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে, তা আমাদের শুনিয়েছেন। মাঘ-মণ্ডল ব্রতের ছড়ার কাহিনীতে আছে সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রকলার বিবাহ। এই বিবাহে সতীনরূপী গৌরীর বেদনাময় কান্না। সন্ধ্যাকে এখানে গৌরীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্যের বিবাহ, বাসরঘর, সূর্যের বাড়ি, বিয়ে বাড়ির দৃশ্য, সূর্যের মা, সূর্যের পুত্র প্রভৃতি চরিত্র ও ঘটনা সুবিন্যস্তভাবে এই ছড়ার মধ্যে মনোরম কাহিনীর আকারে প্রকাশিত হয়েছে। শীত ঋতু এবং সূর্যের অভ্যুদয়কে উপলক্ষ করে এই মাঘ-মণ্ডল ব্রত নিঃসন্দেহে একটি অভিনব অনুষ্ঠান। ছড়ায় ও গানে সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রকলার বিবাহ দিয়ে বসন্ত ঋতুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে সূর্যকে বরণ করা হয়েছে। শেষে সূর্যকে জামাতারূপে কল্পনা করে সূর্যের ওপর মানবিক গুণাগুণ আরোপ এবং তাকে ঘরের মানুষ করে তোলার চেষ্টা এই ছড়ার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্রতীরা বলছে ঃ

উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের মা-র বাড়ি।
সূর্যের মা লো কি কর দুয়ারে বসিয়া
তোমার সূর্য আসিতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া

অন্য আর এক ব্রতিনী সূর্যের মা-র নকল অভিনয় করে বলছে—

আসবেন সূর্য বসবেন খাটে
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে।
গা হেলাবেন সোনার খাটে,
পা মেলাবেন রূপার পাটে,
ভাত খাইবেন সোনার খালে,
বেন্নন খাইবেন রূপার বাটিতে,
আঁচাইবেন ডাবর ভরা,
পান খাইবেন বিড়া বিড়া
সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া
খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা,
চুন খাইবেন খুটুরী ভরা
পিক ফেলাইবেন লাদা লাদা...”[৮১]

আকাশের সূর্য, চন্দ্র, সন্ধ্যা, গৌরী প্রভৃতি এই ছড়ার চরিত্রগুলি মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ। আকাশ থেকে নেমে এসে তারা মানুষের ঘরকন্নায় ও গৃহপ্রাঙ্গণে মানুষের মত সুখে ও দুঃখে হেসেছে, কেঁদেছে ও ভালবেসেছে।

৫। সেঁজুতি ব্রতের ছড়া ও গান

আশুতোষ ভট্টাচার্য[৮২] সেঁজুতি ব্রতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে নারী জীবনের পার্থিব সুখ দুঃখের কথাই এই ব্রতের মধ্যে বড়ো হয়েছে। সেঁজুতি বা সেঁজুলি ব্রতের ছড়ার মধ্যেও আমরা দেখি যে ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই সেঁজুলি ব্রতানুষ্ঠানে বাংলার মেয়েরা ছড়া বলে—

"দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥
বাপের বাড়ীর দোলাখানি,
শ্বশুরবাড়ী যায়।
আসতে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায় ॥[৮৩]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন যে সেঁজুলি ব্রতের ছড়ায় কামনার 'সুর' আছে, কিন্তু স্বর নেই। এর মধ্যে মনের আবেগের তীব্র অনুরণন অনুপস্থিত। যেমন—

"সাজ পুজল সেঁজুতি
ষোল ঘরে ষোল ব্রতী
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর"[৮৪]

সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় একটা দোলনা আঁকা হয়। কুমারীরা সেই আলপনার দোলনার উপর প্রদীপ স্থাপন করে হাতে ধান-দূর্বা নিয়ে গান করে ঃ

"দোলায় আসি দোলায় যাই
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥
বাপের বাড়ীর দোলাখানি।
শ্বশুর বাড়ী যায়।
আসতে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায় ॥[৮৫]

সেঁজুতি ব্রতের ছড়ার মধ্যে প্রাচীন বঙ্গসমাজে সতীনের বিড়ম্বনার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান সমাজে এই বিড়ম্বনা বাঙালীর সংসারে সচরাচর আর চোখে পড়ে না। কিন্তু পুরনো দিনের সেই বিড়ম্বনা ও বেদনাময় স্মৃতি সেঁজুতি ব্রতের ছড়ার মধ্যে আজও বেঁচে আছে—

"অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি ॥
সাত সতীনের সাত কোটা।
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটা ॥
অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীন-কে পুড়িয়ে মারি ॥[৮৬]

অতীতে সতীনের বিড়ম্বনা অনেক ক্ষেত্রে গৃহে ও সমাজে নিয়ে আসত এক গভীর অকল্যাণের ছায়া। ব্রতীরা তাদের ছড়ার সাহায্যে এই অকল্যাণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে কল্পনায় সতীনকে অপসারিত করার বাসনা প্রকাশ করেছে। তাই এইসব ব্রতানুষ্ঠান ও ছড়া সামাজিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে এক অশ্রুসজল প্রতিবাদ। অতীতে এইসব ব্রতানুষ্ঠান জন-জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লোকমাধ্যমের কাজ করত। মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণ-অকল্যাণবোধ প্রভৃতি নানা কামনা-বাসনাকে ব্রতীরা এইসব ছড়ার সাহায্যে সাধারণের মাঝখানে প্রচার করার চেষ্টা করত। যদিও গৃহে বা গৃহ-আঙিনায় ব্রতকামীরা এইসব অনুষ্ঠান পালন করত কিন্তু ঘরে ঘরে ব্রতকামীদের দ্বারা পালিত ব্রতানুষ্ঠানের সাথে সাথে তাদের উদ্দেশ্যগুলি প্রচারলাভ করত ব্রতের গানে ও ছড়ার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রবর্তিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ও অনুষ্ঠান' স্মরণীয়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালীর ক্ষোভকে প্রতিফলিত করার প্রয়াসেই এই ব্রতানুষ্ঠানের প্রবর্তন। আবার মানভূমে বাংলা ভাষা দমনের প্রতিবাদেও এক সময়ে রচিত হয়েছিল টুসু গান। টুসু অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই গান গাওয়া হত। মানুষেরা তাদের মনের কামনাকে প্রতিফলিত করার জন্যে একটি অনুষ্ঠান বা উৎসবকে কাজে লাগাত। বাংলা ভাষা দমনের ব্যাপক আন্দোলনের সঙ্গে টুসু উৎসবকে যুক্ত করে ভাষা দমনের বিরুদ্ধে প্রচাবের হাতিয়ার করা হয়েছিল টুসু গানকে ঃ

"কোমর বেঁধে লেগেছে সবে,
বাঙলা ভাষার দলনে
গান্ধী নীতি সদা উক্তি ভাষাভিত্তিক গঠনে"[৮৭]

অথবা—

"আমার মনের মাধুরী
সেই বাঙলা ভাষা করবে কে চুরী ?"[৮৮]

সমাজ সচেতন লোককবি সমসাময়িক ঘটনাকে উপেক্ষা না করে এগিয়ে এল মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে। টুসু উৎসব ও তার গান সেদিন সমগ্র বাঙালী সমাজে ভাষা দমনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারের কাজ করেছিল।

৬। কুলাই ঠাকুরের ব্রতের গান

পল্লীগ্রামে রাখালেরা কুলাই ঠাকুরের ব্রত নামে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান পালন করে। পৌষ সংক্রান্তির এক পক্ষ পূর্ব থেকে রাখালের দল একজনকে বাঘ সাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যার সময় গান গেয়ে কুলাই ঠাকুরের পূজার জন্য মাগনে যায়। ইতিপূর্বে আমরা কার্তিক ব্রতানুষ্ঠানেও দেখেছি যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পল্লী রমণীগণ স্বহস্তে ব্যাঘ্র শিকার করত। কুলাই ব্রতের অনুরূপ কার্তিক ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়াচার পালিত হত। কার্তিক ব্রতে সারারাত জেগে ব্রতীরা গান গায়, তারপর ভোর হবার আগেই তারা তীর ধনু নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে ব্যাঘ্র শিকারের অভিনয় করে। কুলাই ঠাকুরের ব্রতের অনুষ্ঠানটি ছড়া, গান ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ। এখানে একজন বাঘ সেজে অভিনয় করে। অঙ্গভঙ্গি, আচার-আচরণ, হাঁটা-চলা সবই করে সে বাঘের মত। তাকে সদা-সতর্ক হয়ে থাকতে হবে এবং 'হালুম-হুলুম' গর্জনও করতে হবে। গবাদি ও গৃহপালিত পশুগুলি সুরক্ষার জন্য এই কুলাই ঠাকুরের ব্রত কৃষক-সমাজে প্রচলিত। এই ব্রতের মধ্যে একদিকে লৌকিক ধর্মাচরণ অন্যদিকে বাঘের অভিনয়-ক্রিয়া ও গান গাওয়া যুগ্মভাবে বর্তমান। ব্রতের দিন বাঘের মূর্তিকে পূজা করা হয়। তারপর একজনকে বাঘ সাজিয়ে নাচ-গান ও মাগনের পালা শুরু হয়ঃ

(সমবেত)

ঠাকুর কুলাই ভোঁ
হ্যাটা চলরে।। ধ্রু।।
হ্যাটা চল পাঁচিল পার
(ব্যাঘ্র-অভিনেতার
লম্ফ প্রদান পূর্বক ক্রিয়া-)
ঝপৎ গির্যি রে।। ধ্রু।।
ঝপৎ গির্যি সজাগ হয়।
(সমবেত)
সুন্দের বনে রে ধ্রু।
(ব্যাঘ্র-অভিনেতা)
সুন্দের বনে রে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হাম্বুর করে রব
য়্যাক্ বাঘ রে।। ধ্রু।।
(সমবেত)
ঠাকুর কুলাই ভোঁ…"[৮৯]

এই ছড়ার ভাষা ও শব্দচয়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কুলাই ব্রতের মত পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত বাঘাই ব্রত এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লৌকিক দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে ছড়া বলে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি পূজার নৈবেদ্যর জন্যে ভোজ্যবস্তু সংগ্রহ করার প্রথা আছে এই ব্রতে। ব্রতানুষ্ঠানের এই জাতীয় ছড়াকে মাগনের ছড়া বলা হয়। কুলাই ঠাকুরের ব্রত উপলক্ষেও পল্লীর কৃষক বালকেরা ঘুরে ঘুরে বাঘের গান গেয়ে পূজার নৈবেদ্য সংগ্রহ করে।

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত বাঘাই ব্রতের ছড়াটা এইরূপ ঃ

"এই বাড়ীতে আইলাম আগে।
দুষমন বাদীরে খাইলো বাঘে ॥
বড় ঘর বড় ঘর।
বড় ঘরের উলুছানি।
লক্ষ্মী আইলাইন চারিখানি।
আইলাইন লক্ষ্মী দিলাইন বর।
চাউল কড়িটি বাইর কর ॥..."[৯০] ইত্যাদি

শ্রীমতী জেন হ্যারিসনের[৯১] আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে— অতীতে আদিম মানুষ যখন কোন দেবতাকে পূজা ও বন্দনা করে আলো, বাতাস, বৃষ্টি চাইত, তখন তারা কোন দেবালয়ে অচল মূর্তির সামনে গিয়ে তাদের মনস্কামনা নিবেদন না করে সমষ্টি-কে আহ্বান করে তার সঙ্গে পবন-নৃত্য, বৃষ্টি-নৃত্য অথবা আলো-নৃত্যে তারা সবাই সামিল হতে চাইত। যখন সে শিকারে প্রবৃত্ত হয়ে একটা বন্য ভাল্লুককে ধরতে চাইত তখনও সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা না করে নকল অভিনয়ের দ্বারা সে ঈপ্সিত বন্য জন্তুটাকে কৌশলে পরাজিত করবার জন্যে ভাল্লুক-নৃত্যের মাধ্যমে শিকারের অভিনয় করত। শ্রীমতী জেন হ্যারিসনের এই মন্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কার্তিক ব্রতের গানে। যেখানে রমণীরা তীরধনু নিয়ে শস্যক্ষেত্রে ব্যাঘ্র শিকারের অভিনয় করে ঃ

"সাজিল কামিনী কুল কানে দুলে কন্ন ফুল
মারে তীর হুম্‌কা বাঘের গায় রে..."[৯২]

৭। ঘেঁটু ঠাকুরের ছড়া ও গান

ঘেঁটু চর্ম রোগের দেবতা। ঘেঁটু ব্রতের ছড়াগুলি মাগনের ছড়া। গানের দল গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল এবং ভোজ্য দ্রব্য ভিক্ষা করে। সেই দলে নর্তকীর বেশে পুরুষও অনেক সময় থাকে। গোটা চৈত্রমাস ঘেঁটুকে নিয়ে মাগনের দল গ্রাম পরিক্রমা করে। তারা ছড়া কাটে ঃ

"শুন শুন সর্বজন ঘেঁটুর জন্ম বিবরণ।
পিশাচকুলে জন্মিলেন শাস্ত্রের লিখন ॥

আবার হরিনাম কর্ণেতে করবে না শ্রবণ।
তাই দুই কানেতে দুই ঘণ্টা করেছে বন্ধন ॥"[৯৩]

ঘেঁটুকে উপলক্ষ করে আর একটি মাগনের ছড়ায় আছে ঃ

"এসেছে ঘেঁটুরাজ বাবুদের সদর বাড়ী
গিন্নিমা সকলে ঘেঁটুর নামে দান দিলে
থাকবে কুশলে, ছেলে-পিলে
আদি কন্যা নাতি-পুতী।
কোরনা ভাবনা, হবেনা চুলকনা
মিটিবে যাতনা ঘেঁটুর নাম স্মরণ করি।
যে দিবে মুঠো মুঠো,
তার হাত হবে ঠুঁটো
যে দিবে পাথর পাথর
তার হবে ধুপশো গতর
যে দিবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটি
যে দিবে থালা থালা
তার হবে অনন্ত বালা
ভক্তি করে দাওগো হতেছে অনেক দেরী,
ঘেঁটু পুজা দিলে পরে
থাকবে সুখে ছেলে-পুলে
হবে না চুলকোনা খোসের যাতনা ভারী ॥[৯৪]

এই ছড়ার মধ্যে ঘেঁটু ঠাকুরের বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। বিবাহের ছড়ার এই বর্ণনা নিখুঁত ও বাস্তব ঃ

"দেখবে যদি নগরবাসী এস সত্বরে
ঘেঁটুরাজা বিয়ে ক'রে, বৌ নিয়ে আসছে ঘরে।
উপহাস কোরোনাক কেউ কাপড়ের পাড়টি
গঙ্গার ঢেউ—
ঘোমটা দিয়ে বসে আছে নয় নূতনের বৌ।
মরি কাপড়ের বাহারে…
… … …
বউয়ের পায়ে আছে মল, কানে কনে ভরা কুণ্ডল
ঝুমকো মাকড়ি, পেটি বালা, কোমরে নিম ফল"[৯৫]

এরপর জোড়ে ঘেঁটুর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার চিত্রটা আরও মনোরম ঃ

"জোড়ে এল ঘেঁটু রাজা শ্বশুরবাড়ী
দেখে আহ্লাদে উন্মত্ত হল ঘেঁটুর শাশুড়ী—

কল্লির জামাই ঘেঁটু রাজা, তাকে জল খেতে দেয়
. কড়াই ভাজা—
নতুর গুড়ে তিলে খাজা, মালপো ফুরুলি।
ভাঁড়ার ঘরের গিন্নি যিনি পান সেজেছে মনমোহিনী-
ছোট এলাচ আর ডাল চিনি দিয়ে পানেতে
জোড়ে এল ঘেঁটু রাজা শ্বশুর বাড়ীতে।
মাছ ধরেছে চুনো পুঁটি, ঝোল রেঁধেছে পরিপাটি—
মুড়ের ডালে লাউ দিয়েছে ঘেঁটুর শাশুড়ী
জোড়ে এল ঘেঁটু রাজা...”[৯৬]

এইসব মাগনের ছড়ার মধ্যেও একটা কামনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেই কামনা হল ঘেঁটুর মত আদর্শ বর হবার কামনা। যে বরের সুন্দর একটা কনে-ও জুটেছে। উপরন্তু এমন শ্বশুরবাড়ীর যত্ন ও আতিথ্য অনেকের কাছেই আকাঙ্ক্ষিত। পল্লীর সাধারণ ঘরের ছেলেরা তাই এমন পতি হতে চায়। তাদের কামনা সুন্দরী বধূ এবং তার সঙ্গে এমন শ্বশুরবাড়ী। এই মনস্কামনাটাই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে ঘেঁটু ঠাকুরের মাগনের ছড়ায়। ব্রত ও ব্রতের লৌকিক দেবদেবী এখানে বড়ো কথা নয়, চর্মরোগের প্রতিবিধান হবে কি হবে না তাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু মনস্কামনার সেই স্বরূপটি ব্রতের ছড়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এইসব ছড়ায় মানবিক আবেদন এবং চেনা-জানা জগতের ছবিটা-ই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। ঘেঁটু ঠাকুরের এই ছড়াতেও রয়েছে চেনা-জানা জগতের বর্ণনা। খাদ্য তালিকার দিকে তাকালে বোঝা যায় এইসব খাদ্যের একদিন চল ছিল পল্লী বাংলার গৃহে। খাওয়া-দাওয়ার পরে ছোট এলাচ আর ডাল চিনি দিয়ে শাশুড়ী কর্তৃক পান সাজার বর্ণনাটাও বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘেঁটু ঠাকুরকে উপলক্ষ করে এইসব মাগনের ছড়া ও গানে পল্লীর সমাজ ও জীবন প্রতিফলিত। ঘেঁটু ঠাকুরের এই ব্রতধারা হয়ত প্রাচীনকালের। কিন্তু এইসব ছড়ার রচয়িতারা কখনও কখনও সমসাময়িক জীবন থেকেও তাদের ছড়া ও গানের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে। সাধারণ একটি লৌকিক ব্রত কত সহজ উপায়ে ছড়া ও গানের মাধ্যমে পল্লী মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে এক শ্রেণীর লোকসাহিত্যকে সেদিন প্রচার করেছে। তাই এই জাতীয় লোকসাহিত্য গ্রাম বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ব্রতের ছড়ার অন্তর্গত মানবিক কামনা সহজ-সরল ও অনাবিল ভাষায় প্রকাশিত। এই মানবীয় গুণসমৃদ্ধ ছড়াগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্রতের ছড়াগুলির ভাষার প্রধান গুণ হল সরলতা যা অতি সহজেই সাধারণের সম্পদ হয়ে অনায়াসে পল্লীর হৃদয়ে স্থান পেতে পারে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই এই ছড়া পাঠ বা আবৃত্তি করে তবুও এই ছড়া পল্লীবাংলার প্রাণের সম্পদ হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ মাগনের ছড়াগুলি পুরুষেরা

বা কৃষক বালকেরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবৃত্তি করে। এই ছড়াগুলি পল্লীবাংলার গৃহস্থ-জীবন ও সমাজের সঙ্গে তাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পল্লী-জীবনের উপাদান-উপকরণই হল ব্রতের ছড়া ও গানের প্রধান সম্পদ। ভাবে, ভাষায় ও সুরে গ্রাম্যতা দোষ বা স্থূলতা থাকলেও এদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। অনুষ্ঠান-নির্ভর অন্যান্য গান ও ছড়ার মত ব্রতের ছড়ার মধ্যেও একটি মৌখিক প্রাণশক্তি বিরাজমান। এই মৌখিক প্রাণশক্তির দ্বারাই ছড়াগুলি মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। তাই ব্রতানুষ্ঠান হল এইসব ছড়ার বিশেষ প্রচার মাধ্যম। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে ব্রতের ছড়া এক অভিনব মৌখিক সাহিত্য। মৌখিক সাহিত্যের ভাষা তথা শব্দগুলি পরিবর্তিত হতে বাধ্য। ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান পুরাতন ও যুগপরম্পরাগত হলেও এদের ভাষার মধ্যে সমসাময়িক জীবনের ছায়াপাতও ঘটে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে ছড়ার ভাষায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রতের ছড়া ও গান অনেক ক্ষেত্রে উৎসব-নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকে। সেইজন্যে উৎসব ও অনুষ্ঠান যদি হারিয়ে যায়, তাহলে কালক্রমে ছড়াগুলি কোনক্রমে বেঁচে থাকলেও তাদের সূত্র ও মাধ্যমকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ অনুষ্ঠানহীনভাবে ছড়ার প্রচার হতে পারে না। তাই আমাদের মনে হয় যে উৎসব-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ছড়া, গান অনেক ক্ষেত্রে যেন খিলানের মত। খিলান শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না—তার জন্যে প্রয়োজন একটি ভিত্তিস্তম্ভ। মেলা ও উৎসব এবং ব্রতানুষ্ঠান হল সেই ভিত্তিস্তম্ভ, যাকে ভর করে অর্থাৎ মাধ্যম করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ছড়া-গান প্রভৃতি লোকসাহিত্য বেঁচে থাকে ও প্রচার লাভ করে।

দীনেশচন্দ্র সেন বাঙালীর কয়েকটি নিজস্ব ব্রতকথাকে বহু প্রাচীন বলে অভিহিত করেছেন। যে যুগে পৌরাণিক চরিত্রগুলি এদেশের কল্পনাকে মুগ্ধ করেনি সেই যুগে কৃষ্ণ, শিব, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা এবং রাম, লক্ষ্মণ, প্রহ্লাদ ও ধ্রুব অপেক্ষা, ভাদালি, কুলাই প্রভৃতি গ্রাম্য আর্যেতর দেব-দেবী আমাদের দেশের মেয়েদের দ্বারা ভোগ ও পূজো পেতেন। দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন ঃ

"…সে যুগে বাঙ্গালী মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে পাঠাইয়া অবিরত গ্রাম্য দেবতাগণের নিকট তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করিত এবং বলি 'মানসিক' করিত,—পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী এবং বৌদ্ধ শক্তির পরিণতির সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রমাণ ভাষা। ভাষা রূপান্তরিত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও রহিয়া গিয়াছে; যথা প্রাচীন "থুয়া" এবং "ভাদালি" ব্রত কথায়—"থুয়া পুজি থুয়ালী। অঘন মাসে ভুঞালী॥ অকালে ভাতন্তী। অকালে পুতন্তী। ঢেঁকি পড়ন্ত। গাই বিয়ন্ত…"[৯৭]

বাংলাদেশের কতগুলি বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানের নামে কিছু অভিনব ছড়ার

ও উৎসবে গীত হয়। মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গীত বিশেষ শ্রেণীর লোকসাহিত্যের উপাদান-উপকরণ একান্তভাবেই দেশীয় বা স্থানীয়। সেইসব লোকসাহিত্যের মধ্যে মহৎ সাহিত্যের আবেদন না থাকতে পারে কিন্তু স্বদেশের মেলা ও উৎসবের আঙিনায় সাধারণ জনসমাবেশের মধ্যে প্রচারিত হয়ে সেই লোকসাহিত্য অতি সহজেই পল্লীর নিজস্ব সম্পদ হয়ে ওঠে। তাই সেইসব ছড়া, গান, সংকীর্ণরূপে আঞ্চলিক হলেও পল্লীর সমস্ত হৃদয়কে অচিরে জয় করে নেয়।

মেলা ও উৎসবের সাধারণ লোককবিগণের মৌখিক সৃষ্টি ও রচনার প্রতি (Oral Creation and Composition) পল্লীজনতার অনুরাগ ও গভীর আসক্তি আবহমানকাল ধরে বেঁচে আছে। তাই গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুলি শুধু আমোদ-প্রমোদের বিষয় নয়, এগুলি পল্লীবাংলার নিজস্ব সম্পদ। লোকসাহিত্য প্রচারে তাই উৎসব ও মেলার কাজটি অলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হয়ে চলেছে দীর্ঘকাল থেকে (unrecorded way)। সমাজবিবর্তন, আধুনিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি, বিজ্ঞান-মহিমার জয়যাত্রা সত্ত্বেও পল্লীর আপামর নরনারী আজও পথ চেয়ে বসে থাকে আবার কবে মেলা বসবে। কবে উৎসব আসবে। টুসু, ভাদু, গাজন-গম্ভীরার গান ও অনুষ্ঠানে ও বাউল গানে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠবে। কারণ এগুলি যে বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রাণের সম্পদ। যা জীর্ণ, বিবর্ণ ও প্রাচীন হলেও চির নবীন।